জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯

১৭-২৩ জুলাই

মাছ চাষে গড়বো দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯

১৭-২৩ জুলাই

মাছ চাষে গড়বো দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মৎস্য সেক্টরের সমৃদ্ধি সুনীল অর্থনীতির অগ্রগতি

"মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"
— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

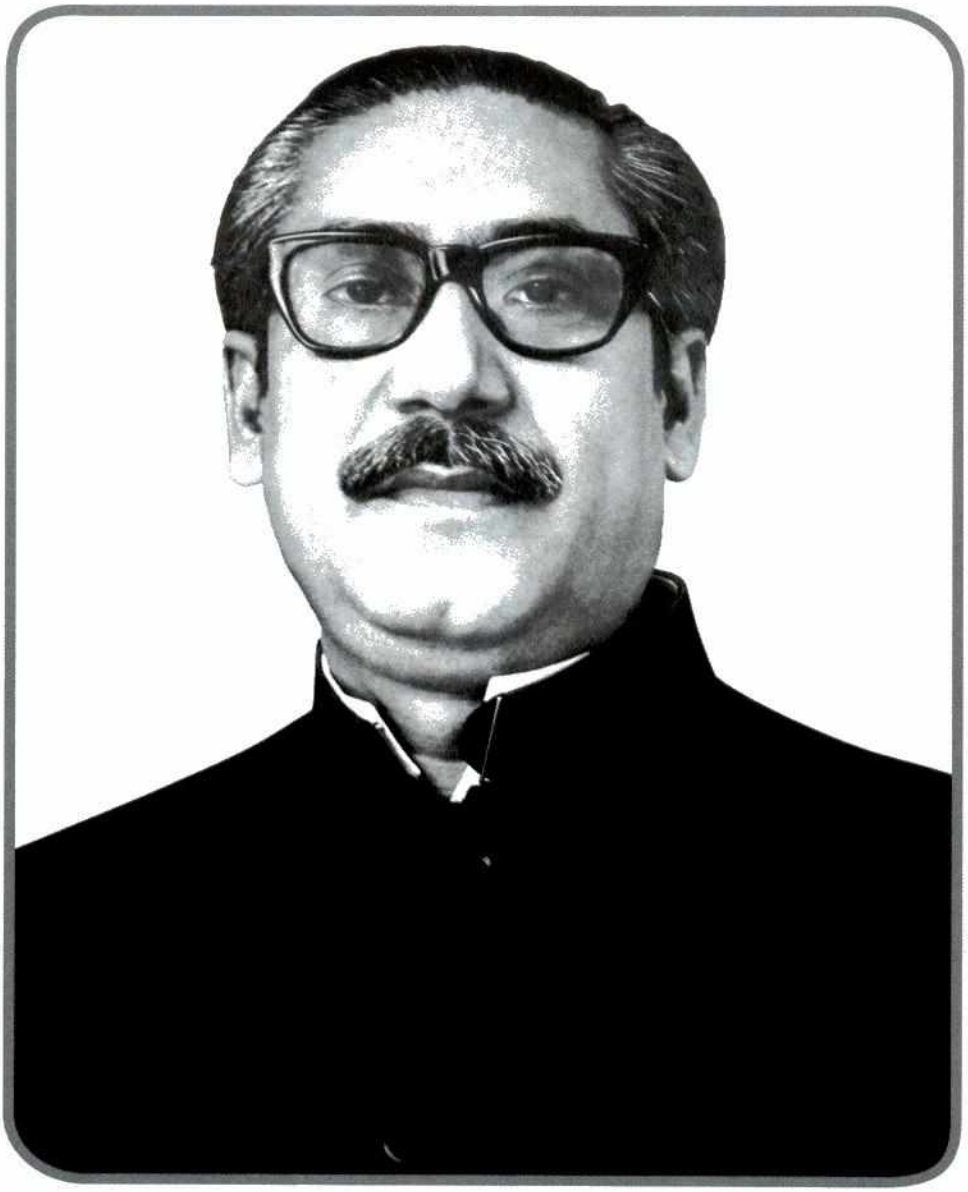

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯' উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, মৎস্য সম্প্রসারণকর্মী এবং মৎস্য বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের স্লোগান 'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় খাত। মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকার ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত প্রযুক্তির মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রজননক্ষম ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের লাগসই প্রশিক্ষণসহ ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। একই সাথে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্লু-ইকোনমির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন - এ প্রত্যাশা করি।

অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এ সম্পদ ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মৎস্যখাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও ১৭-২৩ই জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ বছরের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান 'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মৎস্যখাত বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভুক্ত খাত। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা এ খাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দেশ আজ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'The State of World Fisheries and Aquaculture 2018' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপির ৩.৬১ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের পাশপাশি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গবেষণা ও জরিপ জাহাজ, আর. ভি. মীন সন্ধানী কর্তৃক জরিপ কাজ পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ৪৩০টি সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নির্ধারণ করে সহনশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করে জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং জেলেদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে VTMS মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

আমি আশা করি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিপুল সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

বাণী

জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশাল সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুনীল জলরাশি ও মিঠাপানির সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে অনাদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ওপর নির্ভর করে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন মাথাপিছু ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট মাছের উৎপাদন ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়, উন্মুক্ত জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ও সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাছের মজুদ এবং মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সর্বোচ্চ আহরণমাত্রা নির্ধারণে বর্তমান সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় আরভি মীন সন্ধানী এবং আন্তর্জাতিক জরিপ জাহাজ Dr. Fridtjof Nansen এর মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ সংরক্ষণের জন্য সমুদ্রে ৬৫ দিন সকল ধরনের নৌযান কর্তৃক মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে এবারই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছায় ১২টি উপকূলীয় জেলার ৪২টি উপজেলার ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৮৭ জন জেলেকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের জন্য জেলেদেরকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, বিল নার্সারি স্থাপন, আবাসস্থল উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও সম্প্রসারণ এবং চাষি পর্যায়ে লাগসই মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের গতিধারাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৭-২৩ জুলাই, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন করতে যাচ্ছে।

এবারের মৎস্য সপ্তাহের স্লোগান "মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। আসুন আমরা এ স্লোগানটি দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেই। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের দেশ মৎস্যসম্পদে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি

সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

বাণী

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২৫.৩০ শতাংশ আসে মৎস্যখাত হতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, মৎস্য উপখাতের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে এবং তা ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে অতিআহরণ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রসহ জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও মৎস্যখাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে বর্তমান জনবান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের ফলে মাছের উৎপাদন ও আহরণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মৎস্যবান্ধব ও যুগোপযোগী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মূল্যায়নে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বিশ্বে তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এছাড়া, ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যে বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম।

মৎস্যসম্পদের ধারাবাহিক উন্নয়নে সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্যকে ধরে রাখতে এখাত সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মানসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এবারের স্লোগান **'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'** কে সামনে রেখে দেশের প্রতিটি জলাশয়ে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

বাণী

খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় জিডিপিতে মৎস্যখাতের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং দেশের মোট কৃষিজ উৎপাদনের ২৫.৩০ শতাংশ আসে মৎস্যখাত থেকে। বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৩,১৭১ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৫০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। মৎস্যখাত এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশাল সমুদ্র এলাকায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সমুদ্রে সকল ধরনের মাছ ও চিংড়ি আহরণ বন্ধ থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ৯টি লং লাইনার ও ৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মোট ১৬টি ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানে সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের নানামুখী উদ্যোগ ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিগত দশ বছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের উৎপাদন ১২ শতাংশ বেড়ে ৫.১৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের ১ শতাংশ। মৎস্যখাতের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর তথ্যানুযায়ী, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম। আমাদের দৈনিক মাথাপিছু ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম। এ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে ৬৪ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের মধ্যে ২০ প্রজাতির মাছের জীনপুল সংরক্ষণ ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ফলে দেশে দেশীয় মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের আপামর জনসাধারণ, মৎস্যচাষি, বেকার যুবক, বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তাদেরকে মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত করে এ সম্পদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৭ জুলাই হতে ২৩ জুলাই দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯** উদযাপিত হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য মৎস্যসম্পদের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করা এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন, নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও আগ্রহী করে গড়ে তোলা। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ এর স্লোগান **'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'** তাই যথার্থ হয়েছে।

পরিশেষে, সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জুলাই ২০১৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টর সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সহায়ক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের ৩.৫৭ শতাংশ এবং জাতীয় কৃষিজ উৎপাদনের ২৫.৩০ শতাংশ মৎস্য সেক্টরের অবদান।

বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঙ্ক্ষিত প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণ এবং চাষি ভাইদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ আজ মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক ৪২.২০ লক্ষ মে.টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশে মাছের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন। আমাদের দৈনন্দিন মাথাপিছু ৬০ গ্রাম চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.৫৮ গ্রামে। মৎস্যখাতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সে হিসেবে এখাতে বিগত ১০ বছরে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করতে মৎস্যপণ্যের রপ্তানি প্রসারেও মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে চলেছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৩,১৭১ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪২৫০ কোটি টাকা আয় হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান বাস্তবায়ন, খামারে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস প্রবর্তন ও ভ্যালু চেইনে জিএইচপি, হ্যাসাপ ও ট্রেসেবিলিটি ইত্যাদি মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং রপ্তানিতব্য পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য তিনিট অ্যাক্রিডিটেটেড ল্যাবরেটরি পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদা পূরণে সক্ষম বলে বিগত ২০১৮ সালের EU-FVO অডিট রিপোর্টে প্রশংসিত হয়েছে; যা আমাদের মৎস্যপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পাশাপাশি, প্রধান হিমায়িত রপ্তানিপণ্য ব্ল্যাক টাইগার শ্রীম্প (বাগদা চিংড়ি - আমি বলি 'এ্যাকোয়া টাইগার') -এর ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে উচ্চমূল্য প্রাপ্তির নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শ্লোগানকে সামনে রেখে **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯** উদযাপন উপলক্ষে এবারও মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। মূল্যবান এ সংকলনটি যাদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিবাদন। আমি আশা করি, সংকলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ দেশের মাছ ও চিংড়ি চাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক, সম্প্রসারণ কর্মী, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক এবং মৎস্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পেশাগত ও ব্যবহারিক কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন, তাই তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সংকলনে স্থান অপ্রতুলতার কারণে অনেক প্রাবন্ধিকের মানসম্পন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো - জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ

আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক	মহাপরিচালক	প্রধান উপদেষ্টা
ছালেহ আহমদ	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিআরএল)	উপদেষ্টা
মোঃ মনোয়ার হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিআরএল)	উপদেষ্টা
ড. মুহঃ নিয়াজউদ্দিন	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সভাপতি
ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	উপ-প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
সুজিত কুমার চাটার্জী	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী	উপ-প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
বি এম মোস্তফা কামাল	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মনিষ কুমার মণ্ডল	উপ-প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ মাহবুব উল হক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ আজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী	ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার	সদস্য
মাহবুবুল আলম	গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৯

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মঈন রুমি, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা
৮,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
শিকদার এন্টারপ্রাইজ, ২৯০/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
ই-মেইল: mozir822@gmail.com
অলংকরণ: গোলাম মাওলা ও মন্তোষ কুমার পাল

Citation: DoF.2019. National Fish Week 2019 Compendium (*in Bangla*). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 160p.

সূচিপত্র

মৎস্যখাতের প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীলতা ২১
আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম ৩৩
দিলদার আহমদ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ঃ গবেষণায় বিগত ১০ বছরের অর্জন ৩৮
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

সমুদ্র স্বাস্থ্যসূচক ঃ নিরাপদ সাগর ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৫
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা ৪৮
মোঃ আমিনুল ইসলাম, শবনম মোস্তারী ও সালমা আক্তার

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অর্জিত সাফল্য ৫২
মাসুদ আরা মমি ও মোঃ মাহবুব উল হক

মাইকোটক্সিন বিষক্রিয়া ঃ একটি নীরব ঘাতক ৫৭
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে মনোসেক্স (স্ত্রী) থাই সরপুঁটি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ৬২
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার ও মোহাম্মদ রফিকুর রহমান

ইলিশ মাছের মজুদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি এবং সহনশীল ইলিশ আহরণে গবেষণার ফলাফল ৬৫
মোঃ আনিছুর রহমান, মোঃ মেহেদী হাসান প্রামানিক ও মোঃ মনজুরুল হাসান

বায়োফ্লক প্রযুক্তি ঃ মৎস্যচাষে সম্ভাবনার নবদিগন্ত ৬৭
ড. মোঃ আমজাদ হোসেন ও ড. রাজু আহমেদ

জলজ পরিবেশ ও মৎস্যচাষে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঃ খাদ্য নিরাপদতায় ঝুঁকি ও করণীয় ৭১
সুজিত কুমার চাটার্জ্জী ও মোঃ বরকতুল আলম

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন ঃ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ও গবেষণায় অর্জিত মাইলফলক ৭৪
মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন ও সাইদুর রহমান চৌধুরী

মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ঃ মৎস্যচাষে নতুন বিপ্লব ৭৯
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী ও মোঃ আসাদুজ্জামান

জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় OIE কর্তৃক প্রকাশিত 'Aquatic Code' এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ ৮৪
ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, নুসরাত জাহান পুনম ও মোছাঃ খাদিজা বেগম

বাংলাদেশের অ্যাকোয়াকালচারে সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজাতিসমূহ ঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ৮৮
ড. কাজি ইকবাল আজম, শহিদুল ইসলাম ভূঞা ও মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির

শীলা কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা ৯৩
মাসুদা খানম, সমীর কুমার সরকার ও বিমল জ্যোতি চাকমা

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি ও খামারের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা ৯৯
অমিতোষ সেন

পঁয়ষট্টি দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম ঃ যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ১০২
ড. মো: আবুল হাছানাত ও সুমন বড়ুয়া

মাছের ভ্যাকসিন ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১০৭
ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক ও ইশরাত জাহান আঁকা

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কৌশল ঃ প্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর ১১১
সৈয়দ মোঃ আলমগীর

নিঝুম দ্বীপ সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা (মেরিন রিজার্ভ) ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা ১১৫
মোঃ আব্দুল ওহাব, আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক ও মোঃ শাহাদ মাহবুব চৌধুরী

সুনীল অর্থনীতি ঃ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ ১১৮
হাসান আহম্মেদ চৌধুরী, নাসির উদ্দিন মোঃ হুমায়ূন ও মনিষ কুমার মন্ডল

সী-উইড ঃ সুনীল অর্থনীতিতে সম্ভাবনার নতুন দ্বার ১২১
মোহাম্মদ রেদোয়ানুর রহমান, মনিষ কুমার মন্ডল ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আবছার খান

বন্য রাণী মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামে অভিযোজন ১২৪
প্রফেসর ড. মোহাঃ তরিকুল আলম

মৎস্যখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা এর অপরিহার্য ভূমিকা ১২৬
এস. এম. মনিরুজ্জামান ও এ. কে. এম. আমিনুল্লাহ ভূঞা

অপুষ্টি প্রতিরোধে বসতবাড়িতে মাছ ও শাক-সবজি চাষ ১২৯
অশোক কুমার সরকার, ড. মোঃ মাহবুবুল আলম মিঞা ও ডা. শেখ শাহেদ রহমান

আধা-নিবিড় বাগদা ও গলদা প্রদর্শনী ঘেরের ফলাফল পর্যালোচনা: SAFETI প্রকল্প ১৩২
ড. মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন

রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড ঃ বিনোদন ও শিক্ষায় এক অনন্য উদ্যোগ ১৩৫
মোঃ সফিকুর রহমান চৌধুরী ও ড. মুহঃ নিয়াজউদ্দিন

পুষ্টি-সংবেদনশীল মৎস্যচাষ ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ার্ল্ডফিসের উদ্যোগ ১৩৭
মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া ও ডা. শামিয়া খানম চৌধুরী

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৯ ১৪০

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ১৪২

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৪৯

মৎস্যখাতের প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীলতা

Accelerated Growth in Fisheries Sector and Sustainability

আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সুস্থ-সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের দৈনন্দিন মাথাপিছু ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম (বিবিএস, ২০১৬)। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)। বিগত দশকে মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ও স্থিতিশীল। বিগত ৫ বছরে মৎস্যখাতে গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২৮ শতাংশ, যেখানে কৃষিখাতে (কৃষি ও বনজ, শস্য ও সবজি এবং প্রাণিসম্পদ) উক্ত সময়ে অর্জিত গড় প্রবৃদ্ধি ২.৪৫ শতাংশ। দেশের রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্যখাত হতে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক মানুষ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।

দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। **ভিশন-২০২১** বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান

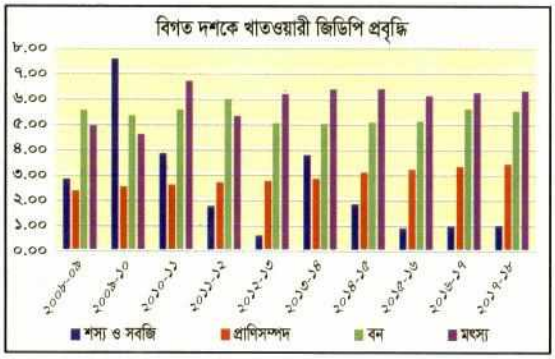

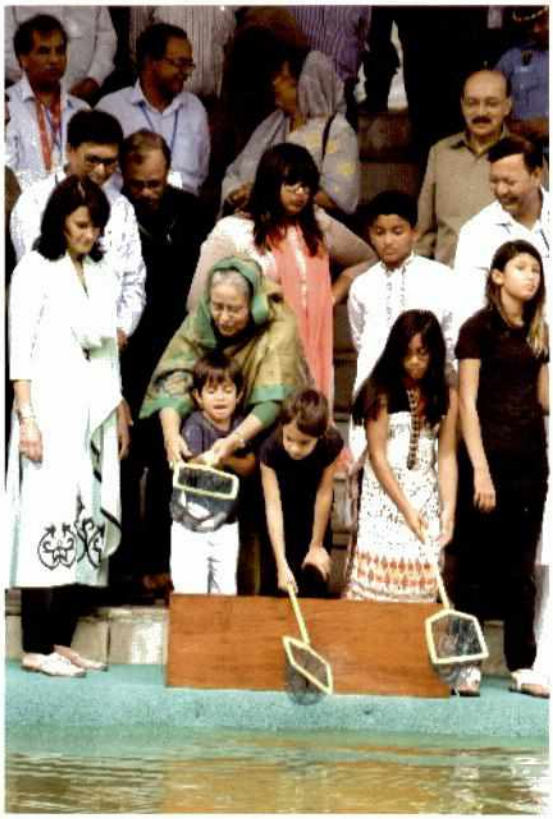

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, রূপকল্প ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার। সরকারের উন্নয়ন দর্শন **আমার গ্রাম আমার শহর**- এর সার্থক রূপায়নে মাছ ও চিংড়ি চাষ নিবিড়করণ, মডেল মৎস্যগ্রাম প্রতিষ্ঠা, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সী-উইড চাষ সম্প্রসারণ এবং সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় আনয়নপূর্বক ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিগত দশকে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ

জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সরকার চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য সময়োপযোগী ও টেকসই কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। মৎস্যখাতের এ সফলতা ধরে রাখার লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- জাটকা সংরক্ষণ, প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন;
- অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ;
- পরিবেশ ও সমাজবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;এবং
- স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিসহ অন্যান্য কার্যক্রম।

সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও এসডিজি-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১২-১৩ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্য নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

	খাত	বেইজলাইন উৎপাদন (২০১৩-১৪) (মে.টন)	প্রক্ষেপণ (২০২০-২১) (% বৃদ্ধি)	অগ্রগতি ২০১৭-১৮ পর্যন্ত (% বৃদ্ধি)
১.	অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ হতে উৎপাদন	১৯.৫৭	৪৫	২২.৮৯
২.	অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে মৎস্য আহরণ	৯.৯৬	২০	২২.১৯
৩.	ইলিশ উৎপাদন	৩.৮৫	২০	৩৪.২৯
৪.	সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন	৫.৯৫	১৮	১০.০৮

৫. দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৫৩ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণ। এর বিপরীতে বিবিএস ২০১৬-এর তথ্য মতে, দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে;

৬. হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য হতে রপ্তানি আয় ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীতকরণ। উল্লেখ্য ২০১৮-১৯ সালে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৫০৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার;

৭. বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৮. মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ; এবং

৯. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এসডিজি ম্যাপিং-এর আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় SDG 14 (Life below water) শীর্ষক অভীষ্ট এর ১৪.২, ১৪.৪, ১৪.৫, ১৪.৬, ১৪.৭ ও ১৪.বি লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে Lead Ministry এবং SDG 2 (End hunger) এর ২.১, ২.৩ ও ২.৫ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে Co-Lead Ministry হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা ব্যতীত এসডিজি'র উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি বেশ কিছু অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ করে কাজ করে যাচ্ছে; যার মধ্যে অন্যতম হলো:

১. সামুদ্রিক মৎস্য নীতি প্রণয়নসহ মৎস্য সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধি হালনাগাদকরণ;

২. সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির মজুদ নিরূপণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৩. ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় ২০টি মেরিন সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন;

৪. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ফিসিং ট্রলার ও ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন;

৫. পরিবেশবান্ধব ফিসিং ভেসেল পরিচালনায় উৎসাহিতকরণ/সহায়তা প্রদান;

৬. সকল ফিসিং ভেসেলে VTMS (Vessel Tracking and Monitoring System) সংযোজন;

৭. কমপক্ষে ৫ লক্ষ জেলে/মৎস্যজীবী পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;

৮. ২০৩০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Reserve/Marine Protected Area - MPA) ঘোষণার জন্য সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ;

৯. উপকূলীয় এলাকার জেলে/মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে মডেল ভিলেজ স্থাপন;

১০. সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (সিবিএফএম) শক্তিশালীকরণ এবং এর মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

১১. সরকারি জলাশয় ব্যবহারের জন্য জেলেদের আইডি কার্ডের ব্যবহার; এবং

১২. সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ।

মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি: সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৭-১৮ সালে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন; যা গত ২০১৬-১৭ সালের মাছের উৎপাদন (৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন)-এর চেয়ে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার মে.টন বেশি। ২০১৭-১৮ সালে মাছের এ উৎপাদন (৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন), ২০০৮-০৯ সালের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫৮ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন। সুতরাং ৩৫ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে পাঁচ গুণের বেশি। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে।

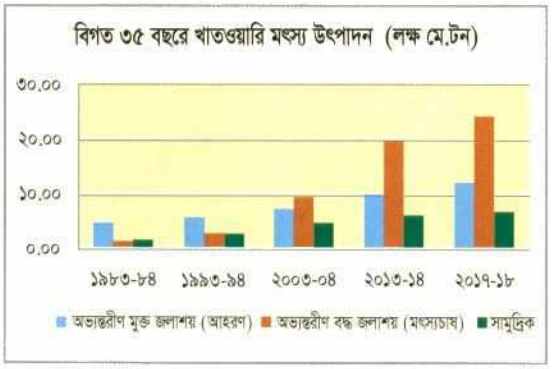

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, যথা -নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়-পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের, পেন কালচার ও খাঁচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮ শত ১৩ বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল ৭১০ কিমি। বিগত ৩৫ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬২.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৭-১৮ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.৪৫ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

২. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ: মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের

আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে দেশের ৩.৯২ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় মৎস্য উৎপাদন ৪.৮৫১ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫.০০ মে.টনে উন্নীত হবে আশা করা যায়। বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি 'ব্রুডব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)'-এর মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত সর্বোচ্চ জেনেটিক গুণসম্পন্ন প্রায় ৩৯ হাজার সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্প মাছের পোনা দেশের ৯টি সরকারি হ্যাচারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। এসব পোনা লালন-পালন করে পরবর্তীতে

বেসরকারি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হবে। উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় জলজসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদাপূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক

অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও বরেন্দ্র এলাকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫,৪৮৮ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড়সমৃদ্ধ যশোর এলাকার মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে **বৃহত্তর যশোর এলাকায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন** শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার ও ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাছচাষ ও অন্যান্য কার্যক্রম যেমন-মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, নার্সারি স্থাপন, বিপন্নপ্রায় দেশীয় মাছের পোনা মজুদ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য **পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক** একটি প্রকল্প জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য এলাকার জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাছচাষ ছাড়াও উন্নয়নকৃত এসব জলাশয়ের পানি সেচ, গৃহস্থালী ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৫৯৭০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহে প্রশিক্ষিত সুফলভোগী কর্তৃক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; যা পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। এ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ৩,৫৬০ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৩,৯৬৭টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব খাতের আওতায় মোট ২৬৬ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং স্থাপিত বিল নার্সারির সংখ্যা ৩৬৭টি। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় ২,০৫০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি মৎস্য অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট এসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪৫ শতাংশ

পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা- ভাঙ্গন, জাতপুঁটি, তিতপুঁটি, চান্দা, চেলা, কাকিলা, বাতাসি, গুচি, একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির লক্ষ্যণীয় পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত দশ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩,৯০৪ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮১২ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৬,৫০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

৬. মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ: রুই-কাতলা জাতীয় মাছের একটি অনন্য প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

করছে। অনন্য এ প্রজননক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকার জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হালদা নদীর অভয়াশ্রম রক্ষায় নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নয় বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩,৭৫৭ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধমানের

হালদা নদী হতে রুই জাতীয় মাছের রেণু আহরণ ক্রমধারা (কেজি)

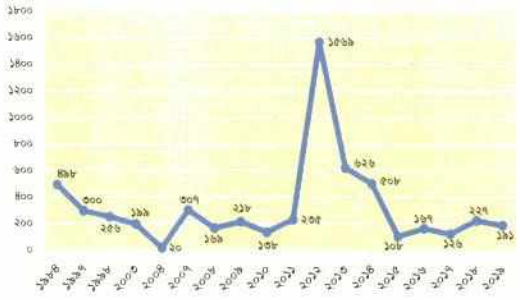

রেণু উৎপাদিত হয়েছে। হালদার তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে দেশের দূর-দূরান্তে রেণু সরবরাহ করে থাকে। উপরোল্লিখিত লেখচিত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প চলাকালীন নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে হালাদা নদী হতে রুই জাতীয় মাছের রেণু আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ টেকসইকরণ এবং হালদা নদীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন শেষে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা

প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিং এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও

গুণগতমানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল

তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম শুরু করা

হয়েছে। চাষি পর্যায়ে এসপিএফ (Specific Pathogen Free) বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ির পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারিতে এসপিএফ পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮ সালে প্রায় ১৫.৮৬ কোটি এসপিএফ পিএল চাষির খামারে সরবরাহ করা হয়েছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৭-১৮ সালে ২,৫৪,৩৬৭ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি টেকসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

৮. শীলা কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন এবং ক্র্যাবলেট উৎপাদন: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় শীলা কাঁকড়া চাষ চাষিদের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এর ভূমিকা আশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশে শীলা কাঁকড়ার প্রধান প্রজাতির নাম হচ্ছে *Scylla olivacea*। বিগত কয়েক বছর ধরে উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম চলে আসছে। ইতোমধ্যে প্লাস্টিক খাঁচায় কাঁকড়া চাষ এবং নরম খোলসের কাঁকড়া উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ছোট কাঁকড়া বা জুভেনাইল মোটাতাজাকরণের প্রধান উৎস হওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁকড়ার পর্যাপ্ততা ক্রমহ্রাসমান বিধায় দেশে কাঁকড়ার স্থায়িত্বশীল এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের জন্য কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রেখে সরকার মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে নির্বাচিত এলাকায় কুঁচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প'-এর মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে একটি শীলা কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করে। উক্ত হ্যাচারি সফলভাবে ক্র্যাবলেট উৎপাদন করছে যা সুধীমহলে প্রশংসিত হয়েছে। উক্ত ক্র্যাবলেট উৎপাদন প্রযুক্তি আগ্রহী চাষি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৯. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। আবহমানকাল হতে ইলিশ

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজ আমিষের যোগান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ইলিশ স্বাদে ও গন্ধে সেরা। তাই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে ইলিশের ঈর্ষণীয় কদর। সম্প্রতি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ-এর ভৌগোলিক নিবন্ধন প্রদান করেছে। ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ শীর্ষে। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে পরিচিত।

সরকার এ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব ইলিশ মাছ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন এবং পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। 'দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫' সংশোধন করে বিদ্যমান ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সাথে বরিশাল জেলায় ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা

কর্মসূচির আওতায় জাটকাসমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত জেলে পরিবার প্রতি মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ১৩ জেলার ৫১টি উপজেলায় ৪৭,৪৮০টি শুকনো খাবার প্যাকেট ৪৭,৪৮০টি ইলিশ নির্ভর জেলে পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আপদকালীন ও মাছ ধরায় আইনি নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জেলেদের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জেলেদের স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বৃহৎ

আকারের উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা** প্রকল্প

এর আওতায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩২,৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও পরিপক্ব ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু ছাগল পালন, ভ্যান/রিক্সা প্রদান, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট ECOFISH[BD] প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৯টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ২০,৭০০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বনির্ভর করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের তহবিল গঠনের লক্ষ্যে সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকারি অনুদানভিত্তিক ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ECOFISH[BD] প্রকল্পের মাধ্যমে থোক বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে উক্ত তহবিলে হস্তান্তরিত হয়েছে। এসব সমাজবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৭-১৮ সালে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে; যেখানে ২০০৮-০৯ সালে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন। অর্থাৎ মাত্র ৯ বছরের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৩ শতাংশ।

১০. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন: মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু নীতি, আইন বিধিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০

ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ অন্যতম। তাছাড়া The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, ২০০২ এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ। মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও কারেন্ট জাল উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে সরকার কর্তৃক এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance 1983 (Ordinance No.XXXV of 1983)- এর section ৫৫এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, ১৯৮৩-এর Rules ১৮-এর পর নতুন Rule ১৯ সংযোজন করা হয়েছে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে। উক্ত রুলের আওতায় ২০১৫ সাল হতে চলতি বছরেও বর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় ২৭/০২/২০১৭ তারিখে নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে, যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

১১. জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ দিকনির্দেশনায় সরকার মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে; যা উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। জেলেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের শনাক্তকরণ ও সামাজিকভাবে পেশার স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকার এ লক্ষ্যে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত ১৬.২০ লক্ষ জেলের

নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪.২০ লক্ষ জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত পেশাগত অবস্থায় আহত বা নিহত সংশ্লিষ্ট ৫৮৭টি জেলে পরিবারকে মোট ২৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই রাজস্ব খাতে অর্থনৈতিক কোড তৈরি করা হয়েছে।

১২. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল সমুদ্র এলাকায় মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুণ্ন রেখে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। এজন্য সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে বেশকিছু কার্যক্রম ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন, ১৩৩টি বাণিজ্যিক ট্রলারে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম ডিভাইস সংযোজন এবং এর মাধ্যমে ডিভাইস সংযোজনকৃত ভেসেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ ইত্যাদি। মেরিটাইম সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী, শিক্ষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকলের দায়িত্বশীল ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে 'আরভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে তিন ধরনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সার্ভে কার্যক্রম শুরুর পর হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত শ্রিম্প সার্ভের ওপর ১০টি, ডিমারসাল ফিস সার্ভের ওপর ১০টি এবং পেলাজিক সার্ভের ওপর ৪টি সহ সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৪ প্রজাতির মাছ ও হাঙ্গর, ২৩ প্রজাতির চিংড়ি ও লবস্টার, ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির সেফালোপোডসহ সর্বমোট ৪৩০টি সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। একইসাথে চলমান ট্রলিং-এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্পটের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যা উক্ত এলাকার মৎস্যসম্পদের অধিক্য বা স্বল্পতা নির্ধারণ, নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং এদের সহনশীল মাত্রায় আহরণ এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে। পাশাপাশি SDG Goal ১৪ (Life below water)-এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। ব্লু-ইকোনমির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ৯টি লং লাইনার ও ৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির অর্থাৎ মোট ১৬টি ফিসিং লাইসেন্সের সম্মতিপত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) -এর সার্বিক সহযোগিতায় নরওয়ের গবেষণা জাহাজ 'আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন' কর্তৃক

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ইকোসিস্টেম ও মৎস্যসম্পদ জরিপ ও ও গবেষণা পরিচালনা করা হয়। উক্ত গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে ২০১৮ সালের ০৩ হতে ১৭ আগস্ট উপরিস্তরের স্মল পেলাজিক, ডিমার্সাল, ৩০০-৫০০ মিটার গভীরতার মেসো পেলাজিক মৎস্যসম্পদের জরিপ এবং সমুদ্রতাত্ত্বিক ও ইকোসিস্টেম সার্ভে সম্পন্ন করেছে। নরওয়ের IMR-এর বিজ্ঞানী ড. এরিক ওলসেন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বর্ণিত জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সার্ভে প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ৩০ জনের গবেষক দল অংশগ্রহণ করেন। সার্ভে চলাকালে ৩৬টি পেলাজিক ও ৫টি বটম ট্রলিংসহ মোট ৪১টি ট্রলিং সম্পন্ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৩৬ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির ক্রাস্টাশিয়ান, ১০ প্রজাতির মোলাস্ক এবং ৩ প্রজাতির সাপসহ মোট ১৭২ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী তালিকাভুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১৬টি বিভিন্ন প্রজাতি শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ফরমালডিহাইডে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সমুদ্র ও নদীতে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্নপ্রায় সামুদ্রিক প্রাণীকূলসহ জাতীয় মাছ ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্রের সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে সরকার গত ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে নিঝুমদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন মোট ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে 'নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (marine reserve) এলাকা' ঘোষণা করেছে। জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন, উপকূলীয় ও

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ঈপ্সিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৬৫ দিন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সুবিধার্থে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা সামুদ্রিক মাছ ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক সদিচ্ছায় এ বছর হতে ৬৫ দিন সাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে উপকূলীয় ১২ জেলার ৪২টি উপজেলার ৪,১৪,৭৮৪ জন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ: মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO ১৭০২৫: ২০০৫ এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে চলেছে।

বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এনআরসিপি (National Residue Control Plan-NRCP) বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এনআরসিপি কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য অ্যাকোয়া ফুড সেইফটি আর্কাইভ মৎস্য ভবনে স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ। দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড

প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য EU Regulation অনুসারে স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় উৎপাদন ও রপ্তানি হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে DG-SANTE-এর Food & Veterinary Office (FVO) কর্তৃক ২০০৫ সাল হতে বাংলাদেশে অডিট পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্যপণ্যের রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অডিট পরিচালনার নিমিত্ত EU-FVO অডিট টিম ০৬-১৬ নভেম্বর ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে

অডিট টিম ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও বিসিএসআইআর এর IFST ল্যাবরেটরি; এবং ময়মনসিংহ, খুলনা ও বাগেরহাটে মৎস্য ও চিংড়ি খামার, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, পশু চিকিৎসার ঔষধ বিক্রয়কারী দোকান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং অডিট প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের রেসিডিউ ব্যবস্থাপনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদা পূরণে সক্ষম বলে মন্তব্য করেন। এটি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। উল্লেখ্য ২০১৫ সালের ২০-৩০ এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশে পরিচালিত অনুরূপ EU অডিট প্রতিবেদনের ইতিবাচক মন্তব্যের ধারাবাহিতায় একই বছরের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা সনদ ছাড়াই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে এ দেশের মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা যাবে বলে ইউরোপীয় কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৩,১৭১.৩২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৫০.৩১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

১৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ: বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে- এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন: কোন সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মানসে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করে সেবার মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতকে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ৪ লক্ষাধিক মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এনজিও কর্মীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে নবনির্মিত গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট-এ প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য ৩৭তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে এক মাস ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৬. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান: আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে ডাইনামিক ওয়েবসাইট কার্যকর রয়েছে (www.fisheries.gov.bd)। এতে মৎস্য বিষয়ক সব আইন, বিধি, নীতি-নির্দেশিকা ও সব ধরনের প্রকাশনা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে যে কেউ এ ওয়েবসাইট থেকে মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, ক্রয়-টেন্ডার, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যায়। অধিদপ্তরের কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক করার মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজড্ সফটওয়ার (Fish Advise System, E-book, DoF-PDS, ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, অনলাইনে চাকরির আবেদন ইত্যাদি) প্রবর্তন করা হয়েছে। মাছ ও চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ও রোগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুত করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর WiFi এবং LAN-এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১৭. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৫৫২.৮৭ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৯-২০ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার ও অভয়াশ্রম স্থাপন;
- প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ;
- মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বঙ্গোপসাগরে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিলেন্স পদ্ধতির জোরদারকরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ এবং জলবায়ুসহিষ্ণু মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

১৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: মৎস্য অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও শতভাগ অর্জিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৭টি, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ৫টি সহ মোট ২৮টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বের বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় মৎস্য অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে আশা করা যায়।

উপসংহার: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' এ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। এর ফলে অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদাপূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। মৎস্য উৎপাদনের অর্জিত সাফল্যকে স্থায়িত্বশীল করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, (ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম

Activities of Bangladesh Fisheries Development Corporation

দিলদার আহমদ

Abstract

Bangladesh Fisheries Development Corporation was first established as East Pakistan Fisheries Development Corporation under East Pakistan Ordinance no. 4, 1964. After the liberation, it was reformed as Bangladesh Fisheries Development Corporation by the Act 22 during 1973. This is an autonomous service providing commercial organization engaged all its endeavor to develop the fisheries sector of Bangladesh. This corporation is now working in the arena of exploitation of fisheries resources from the river, Kaptai lake, haor, coastal area and sea, development of capacity of transport, marketing, and storage of fish and fish products. The Corporation organizes training for the fishermen to develop capacity to explore fish, post-harvest handling, preservation and transport. It also promotes fishing trawler repairing and export of fish and fisheries products.

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ৪ মোতাবেক ইস্ট পাকিস্তান ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭৩ সালে ২২ নং অ্যাক্ট দ্বারা 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' নামকরণ করা হয়। এ কর্পোরেশন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ১৫টি ইউনিট দেশের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মতো সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং সামুদ্রিক মৎস্যকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলে। অত্র কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় জনসাধারণ ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানো।

প্রধান কার্যাবলি (Main functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয় ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-সহ মেরামত সুবিধাদি প্রদান;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- উপর্যুক্ত সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য (Significant success)

১. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন (Fish production in Kaptai lake)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে স্বাদুপানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে এবং প্রায় ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে। কাপ্তাই লেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদিত মাছের মধ্যে কর্পোরেশনের অবতরণ

চিত্র: রাঙ্গামাটিস্থ নিজস্ব হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন

কেন্দ্রসমূহে ১০,৫৭৮ মে.টন এবং স্থানীয় বাজারসমূহে প্রায় ৩১৭৩ মে.টন মাছ অবতরণ করা হয়। জনস্বার্থে স্থানীয় বাজারে অবতরণকৃত মাছের ওপর কোনো রাজস্ব আদায় করা হয় না।

২. কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ (Fingerling release in Kaptai lake)

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বছর লেকে কার্পজাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই লেকে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে মাছের পোনা উৎপাদন করে তা কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাপ্তাই লেকে ২৯ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান কাপ্তাই লেকে কার্পজাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন ও লেকে পোনা অবমুক্ত করছেন

৩. মৎস্য অবতরণ (Fish landing)

দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি এবং নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ১টি মৎস্য

চিত্র: কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণের চিত্র

অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৬,১৭৮ মে.টন মৎস্য অবতরণ করা হয়।

চিত্র: কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ শেডে সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ

৪. মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ (Fish Processing)

বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। এ খাতে বেসরকারি বা ব্যক্তি

চিত্র: রাঙ্গামাটি অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত কাপ্তাই লেকের বোয়াল

মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কর্পোরেশনের উল্লিখিত ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৩,৫৫৬ মে.টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৫. বরফ উৎপাদন (Ice Production)

বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্ত বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের বরফকলসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪,২৭০ মে.টন বরফ উৎপাদন করা হয়। চলতি অর্থবছরে উপকূল ও হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য আরও ৭টি বরফকল নির্মাণ করা হচ্ছে।

৬. ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় (Formalin free fish sale in Dhaka city)

ঢাকা শহরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ২০৩ মে.টন ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের পারিবারিক কাজের সুবিধার্থে ড্রেসড্ ফিস (Dressed Fish) বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩টি ফ্রিজারভ্যান ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্র: কক্সবাজারস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

চিত্র: ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয়

৭. ফিসিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণ (Repair and construction of fishing trawlers)

সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং সুবিধাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহ মেরামত ও নির্মাণের সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে 'মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট' এর উদ্বোধন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্পোরেশনের চট্টগ্রামস্থ মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট শুভ উদ্বোধন করেন

চিত্র: মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন

চিত্র: মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে নির্মিত টি হেড জেটি

এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাগেরহাট জেলার মোংলাস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্রে ফিসিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরও একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

চিত্র: মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট

৮. ট্রলার বহর (Trawler fleet)

১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে মূলত কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ত্বরান্বিত করে। কর্পোরেশনের ট্রলার বহরে বর্তমানে এফভি কোরাল, এফভি কাতলা, এফভি দাতিনা, এফভি মিনাক্ষী, এফভি বাগদা, এফভি রূপচান্দা, এফভি গলদা ও এফভি চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে। বর্তমানে ট্রলারসমূহ দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।

৯. ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদন (Value-added fish production)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কর্পোরেশনের সহায়তায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসাপ হ্যালদি ফুডস, এশিয়ান সী ফুডস লিঃ, ভার্গো ফিস এন্ড এগ্রো প্রসেস লি., বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লি., মাসুদ ফিস প্রসেসিং লি., নি হাও ফিস প্রসেসিং, লকপুর গ্রুপ লি., মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ, সেভেস ওশান ফিস প্রসেসিং লি., গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন, বিডি সী ফুড লি., সেফ এন্ড ফ্রেশ ফুডস লি., জেমিনি সি ফুডস লি., কুলিয়ার চর সী ফুড লি., এপেক্স ফুডস লি., আর্ক সী ফুডস লি., স্টার সী ফুড লি., সেন্ট মার্টিন সী ফুডস লি., মেঘনা সী ফুডস লি. ও মিনহার সী ফুডস লি. কর্তৃক ড্রেসড্ ফিসসহ ফিস বল, ফিস ফিঙ্গার, ফিস চপ, ফিস কেক ইত্যাদি বাজারজাতকরণ করছে; যা দেশের প্রায় সকল সুপারসপে পাওয়া যাচ্ছে।

চিত্র: কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়স্থ কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য প্রদর্শনী

উন্নয়ন প্রকল্প (Development Project)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের আহরণপরবর্তী ক্ষতি (post harvest loss) রোধকল্পে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১. হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

হাওর হতে আহরিত মাছ অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ

চাপিলা মাছ

মলা মাছ

রূপচান্দা মাছ

ফিস বল

ফিস ফিঙ্গার

ইলিশ

মাথাছাড়া চিংড়ি

ম্যাকারেল

ফিস চপ

ফিস কেক

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য

কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জের ভৈরব, নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাটে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

২. দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত মাছের Post Harvest Loss কমিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় পটুয়াখালী জেলার মহিপুর ও আলীপুর, পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট ও লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। এর আওতায় ৪টি স্থানেই মাছ প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য বর্ণিত ৪ (চার) টি কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে পাড়েরহাট ও রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় ৫০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত উন্নয়ন প্রকল্প ২টি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৪৩.০০ (তেতাল্লিশ) কোটি টাকা কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯,০০০ (নয় হাজার) লোকের কর্মসংস্থান হবে।

চিত্র: মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা

৩. আধুনিক শুঁটকি মহাল (Modern shutki mahal)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীন কক্সবাজার জেলার খুরুশকূল এলাকায় মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের বৃহত্তম একটি 'আধুনিক শুঁটকি মহাল' স্থাপনের কাজ কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করছে।

উপসংহার (Conclusion)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের পর হতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করায় এটি লাভজনক ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। মৎস্য সেক্টরে সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বিএফডিসি'র মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে মাছ অবতরণ হচ্ছে, চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ওয়ার্কশপ ও ডকইয়ার্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং একই সাথে ঢাকা শহরে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (ই-মেইল : dildar1984@gmail.com)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ঃ গবেষণায় বিগত ১০ বছরের অর্জন

BFRI : Research Achievements During Last 10 Years

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

Abstract

Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) has so far developed 61 improved aquaculture and management technologies through demand driven research. During last 10 years BFRI has achieved a remarkable success in research which has made significant contribution in fisheries and aquaculture development in the country. As a result Bangladesh has now ranked 3rd in inland open water fish capture and 5th in freshwater fish production in the global context. Bangladesh also attained self sufficiency in fish contributing 62.58 gm/capita/day as supplement to animal protein. The country has also achieved a remarkable success in hilsa fisheries development and management. BFRI has also succeeded in artificial breeding and culture technologies of 19 indigenous endangered fish species. In addition to finfish, BFRI has currently emphasized research on development of technologies for culture of non-traditional species such as, shellfish, crabs, snails, mussels, oysters, seaweeds etc to harness and promote mariculture enterprises in the marine sector.

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মৎস সেক্টরের চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় ১৯ প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, অ্যাকোয়াপনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও সবজি উৎপাদন, নোনা টেংরা ও পারশে মাছের পোনা উৎপাদন, পাঙ্গাস মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, রুই, তেলাপিয়া ও সরপুঁটি মাছের জাত উন্নয়ন, শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, হালদা নদীতে রুইজাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ কৌশল উদ্ভাবন, ক্রিকে মাছ চাষ, সমুদ্র উপকূলে সী-উইড চাষ, ফিস ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি অন্যতম। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন। দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ১ম (৫.১৭ লক্ষ মে.টন), তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ (প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টন) এবং এশিয়াতে ৩য়। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম। এটা জাতির জন্য গৌরবের এবং অহংকারের বিষয়। দেশ মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষ এখন স্বল্পমূল্যে মাছ ও পুষ্টি পাচ্ছে।

বিগত ১০ বছরের গবেষণা সাফল্য (Research achievements during last 10 years)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ১০ বছরে গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সফলতা অর্জন করেছে। অর্জিত কয়েককটি সফলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ (Genepool conservation of endangered fish)

দেশে স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪

চিত্র: চিতল মাছ

চিত্র: গুতুম মাছ

চিত্র: টেংরা মাছ

প্রজাতির মাছ বর্তমানে বিপন্নপ্রায়। ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে বিপন্নপ্রায় প্রজাতির গুতুম, টেংরা, গুজি আইড়, চিতল, ফলি ও কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। বিলুপ্তপ্রায় টেংরা মাছের (*Mystus vittatus*) প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭ -এ রৌপ্যপদক পুরস্কার অর্জন করে। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউট থেকে এযাবত বিলুপ্তপ্রায় ৬৪ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৯ প্রজাতির প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে এসব মাছের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিককালে বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ইনস্টিটিউটের ভ্যাকসিন উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

২. কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা (Breeding and culture management of mud eel)

কুঁচিয়া অন্যতম পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি মাছ। আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ কুঁচিয়া রপ্তানি করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। মূলত প্রকৃতি থেকে কুঁচিয়া সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয় বিধায় কুঁচিয়াও বর্তমানে ১টি বিপন্নপ্রায় প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক বাজারে কুঁচিয়ার যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কুঁচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে এবং দেশীয় প্রচলিত খাবারে ক্রমশ কুঁচিয়াকে অভ্যস্ত করা হচ্ছে। কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কুঁচিয়ার নির্বিচারে আহরণ হ্রাস পাবে এবং এর চাষাবাদ সহজতর হবে।

৩. কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন (Development of koi vaccine)

কৈ মাছের মড়ক প্রতিরোধে বিএফআরআই কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মতো ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে আমদানিকৃত ভিয়েতনামি কৈ মাছ অতি অল্প সময়ে খামারি পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষাবাদ শুরু হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে

চিত্র: ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কৈ ভ্যাকসিন

সারা দেশে বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও যশোর অঞ্চলের ৬০-৭০% ভিয়েতনামি কৈ-এর খামারে মড়ক দেখা দেয়। এতে অনেক চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ প্রেক্ষিতে খামারি পর্যায়ে ভিয়েতনামি কৈ মাছের মড়কের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিএফআরআই-এর বিজ্ঞানী দল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আক্রান্ত খামার হতে রোগাক্রান্ত ভিয়েতনামি কৈ মাছের নমুনা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত নমুনায় (যকৃত, প্লিহা, বৃক্ক ও মস্তিষ্ক) বায়োমলিকুলার পদ্ধতিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু হিসেবে স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি *(Streptococcus agalactiae)* নামক ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করা হয়। অতঃপর স্ট্রেপটোকক্কোসিস রোগ নিয়ন্ত্রণে তিন বছর গবেষণা পরিচালনা করে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে।

চিত্র: কুঁচিয়া চাষের পুকুর

চিত্র: পরিণত কুঁচিয়া মাছ

চিত্র: কুঁচিয়ার পোনা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। ভ্যাকসিন তৈরি প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে আদর্শ পদ্ধতি (OIE) অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শতভাগ কার্যকর অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বলে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লেখ্য, মাছের রোগ প্রতিরোধে এটি হবে দেশের প্রথম ভ্যাকসিন উদ্ভাবন।

৪. মিঠাপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন (Image pearl production in fresh water oyster)

গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট হতে ইতোপূর্বে মিঠাপানির ঝিনুকে (*Lamellidens marginalis* ও *L.corrianus*) মুক্তা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৭-৮ মাসেই ঝিনুকে ১টি পূর্ণাঙ্গ ইমেজ মুক্তা তৈরি করা সম্ভব। সাধারণত মোম, খোলস, প্লাস্টিক, স্টীল ইত্যাদি দিয়ে চাহিদা মাফিক তৈরিকৃত নকশাকে ঝিনুকের ম্যান্টল টিস্যুর নিচে স্থাপন করে ইমেজ মুক্তা তৈরি করা হয়। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নেত্রকোণা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর ও সিলেটের কয়েকজন নারী ও যুবক মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ইমেজ মুক্তা চাষ শুরু করেছেন। তাছাড়া দেশীয় ঝিনুকে (৬০-৭০ গ্রাম) নিউক্লিয়াস অপারেশনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে (৮-৯ মাস) বড় ও গোলাকৃতির মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র: মুক্তা গবেষণা অগ্রগতি সম্পর্কে ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

৫. খলিশা মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন (Success in kholisa fish breeding)

দেশে প্রথমবারের মতো ২০১৮ সালে বিএফআরআই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে খলিশা মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। খলিশা বাংলাদেশের অতি পরিচিত দেশীয় প্রজাতির একটি মাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Colisa fasciatus*; যা আমাদের দেশে খৈলশা নামে পরিচিত, অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ, জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, কলকারখানার বর্জ্য নিঃসরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্য ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং চাষের জন্য পোনা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ২০১৬ সাল হতে বিএফআরআই, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর হতে গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুকুরে ৮-১০ সেমি (১৫-২০ গ্রামের) আকারে খলিশা মাছ পরিপক্বতা লাভ করে। বয়স, আকার ও ওজন আনুপাতে

চিত্র: সুস্বাদু খলিশা মাছ

এর ডিম ধারণক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ১৩,০০০ এবং প্রজননকাল খলিশা, খৈইলা নামে পরিচিত। প্রাকৃতিকভাবে এ প্রজাতিটি মূলত বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল ও মিয়ানমারে পাওয়া যায়। মিঠাপানির জলাশয়ে বিশেষ করে পুকুর, নদী, ঝর্ণা, খাল, বিলে একসময় এ মাছটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এসব তথ্যের ভিত্তিতে উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে গত ২০১৮ সালে মাছটির কৃত্রিম প্রজননের

চিত্র: মুক্তা গবেষণাগার পরিদর্শন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

মাধ্যমে পোনা উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবনে সাফল্য লাভ করেন। উক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে খলিশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনা প্রাপ্তি এবং চাষাবাদ সহজতর হবে।

৬. হালদা নদীতে রুইজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা (Conservation of natural breeding ground of Halda river)

হালদা নদী রুইজাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। এ নদীতে উৎপাদিত পোনা ব্রুড তৈরিসহ

মাছ চাষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট ও পানি দূষণের কারণে হালদা নদীতে মাছের নিষিক্ত ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ২০১৫ সাল হতে আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। এ প্রেক্ষিতে বিএফআরআই মাছের ডিম উৎপাদনে হালদা নদীর পরিবেশ, প্রতিবেশ, পানির গুণাগুণ ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, রুইজাতীয় মাছের বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি তথা প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণের স্বার্থে হালদা নদীতে সারা বছর পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত বেশ কিছু সুপারিশ বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিককালে হালদা নদীতে নিষিক্ত ডিম উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ইলিশ উৎপাদনে ২২ দিন মা ইলিশ সংরক্ষণের প্রভাব নির্ণয় (Impact of hilsa fishing ban during breeding season)

গত বছর (২০১৮) অক্টোবর মাসের ০৭ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের ওপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় প্রায় ৪৮% মা ইলিশ ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে বলে বিএফআরআই-এর গবেষণা তথ্যে জানা গেছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক আহরিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক দেখা গেছে যে, ইলিশের প্রজনন সাফল্যে ২২ দিন আহরণ নিষিদ্ধকরণের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আহরণ নিষিদ্ধকালীন ধৃত ইলিশের অধিকাংশই ছিল পরিপক্ব অবস্থায়; এছাড়াও প্রজননক্ষম মা ইলিশের হার ৭৩% (২০১৭) থেকে ৯৩% (২০১৮) এ উন্নীত হয়েছে; এর মধ্যে ৪৭.৭৪% পরিপক্ব ইলিশ ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে (প্রজননোত্তর)। আংশিক ডিম ছাড়া ইলিশের হার ছিল ২২% এবং প্রজননরত ইলিশের হার ৩% থেকে ১০% এ উন্নীত হয়েছে। ইলিশ আহরণ ২২ দিন নিষিদ্ধকরণের ফলে প্রজনন সাফল্য প্রায় ৮০% এ উন্নীত হয়েছে। ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরণের ফলে ৭ লক্ষ ৬ হাজার কেজি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫০% ডিমের সাফল্যজনক পরিস্ফুটন হলে এবং এর ১০% বেঁচে থাকলে ৩ হাজার কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে যুক্ত হয়েছে বলে গবেষকগণ মনে করছেন। ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্রসমূহে পরীক্ষামূলক নমুনায়নের সময় প্রায় ৮৩% ইলিশের রেণু পোনা পাওয়া গেছে। অন্যান্য প্রজাতির মাছের রেণু পোনা পাওয়া গেছে প্রায় ১৭%। উল্লেখ্য, জাটকা ও মা ইলিশ সুরক্ষিত হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ইলিশ উৎপাদন ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

৮. উপকূলীয় নোনা টেংরা ও পারশে মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ (Breeding and culture of nona tengra and perse fish)

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা খুলনা জেলার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নোনা টেংরা ও পারশে মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। এ ২টি মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে এদের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নোনা টেংরা মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ এ স্বর্ণপদক লাভ করে। উল্লেখ্য উপকূলীয় ঘেরে চিংড়ি মাছের বিভিন্ন রোগবালাই হওয়ায় চাষিরা মাঝেমধ্যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে চিংড়ির সাথে নোনা টেংরা/পারশে মাছের মিশ্র চাষ করা হলে ক্ষতি পুষিয়ে আনা সম্ভব হবে। এছাড়াও ইনস্টিটিউট থেকে বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলের দাতিনা, চিত্রা, কাইন মাগুর, মিল্ক ফিস, চাকা ও হরিণা চিড়ির ওপর গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯. হ্যাচারিতে শিলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা (Success in mud crab breeding)

দীর্ঘ গবেষণার পর বিএফআরআই বিজ্ঞানীরা হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার (mud crab) পোনা (crablet) উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে প্রকৃতি থেকে শীলা কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করে মূলত সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে এর চাষাবাদ করা হয়। ফলে প্রাকৃতিক উৎসে শীলা কাঁকড়ার পোনা প্রাপ্তি সাম্প্রতিককালে হুমকির মধ্যে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে ২০১৫ সাল থেকে হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়। দীর্ঘ গবেষণার পর চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) গবেষকগণ হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছেন। এতে দেশে কাঁকড়া চাষ সহজতর হবে এবং প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে কাঁকড়ার পোনা (ক্রাবলেট) আহরণ হ্রাস পাবে।

চিত্র: কাকড়ার পরিপক্ব ডিম

চিত্র: জুইয়া-৩

চিত্র: জুইয়া-৪

চিত্র: জুইয়া-৫

১০. সী-উইড এর চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (Sea-weed culture technology)

অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ সী-উইড (সামুদ্রিক শৈবাল) এর চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিএফআরআই ইতোমধ্যে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউট হতে পরিচালিত গবেষণায় কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে এ পর্যন্ত ১১৭ প্রজাতির সী-উইড শনাক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে ১০ প্রজাতির সী-উইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ০৩ প্রজাতির সী-উইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় সেন্টমার্টিনে ৯০ দিনে সী-উইড এর উৎপাদন প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা পার্শ্ববর্তী দেশের সী-উইড উৎপাদনের (৩৬ কেজি) খুবই কাছাকাছি।

চিত্র: নারিকেলের ছোবড়ার রশি দ্বারা তৈরি জালে সী-উইড চাষ

আমাদের দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে সী-উইড চাষ সুনীল অর্থনীতিতে (ব্লু-ইকোনমি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সী-উইড চাষ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র: বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সী-উইড চাষ প্রযুক্তি মৎস্য অভিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে

১১. রুই মাছের উন্নত জেনেটিক জাত উদ্ভাবন (Development of improved strain of rohu)

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশীয় রুই মাছের নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন নদী উৎস থেকে রুই মাছের বন্যজাত (wild) সংগ্রহ করে ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতিতে প্রথম প্রজন্মের উন্নত রুই জাত উদ্ভাবন করা হয় যা বিদ্যমান জাত হতে ১৬ ভাগ অধিক উৎপাদনশীল। অধিক উৎপাদনশীল এসব মাছের জাত দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। রুই মাছের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিএফআরআই-কে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে কালিবাউস মাছের জাত উন্নয়ন গবেষণা চলমান রয়েছে।

১২. 'বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিস ড্রায়ার' ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন (Production of quality dry fish using BFRI mechanical fish dryer)

স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শুঁটকি তৈরির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক সময় সাশ্রয়ী ও দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী 'বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিস ড্রায়ার' উদ্ভাবন করা হয়েছে। ড্রায়ারটিতে সৌর ও বিদ্যুৎ শক্তি উভয়ই ব্যবহার করা যায়। ফিস ড্রায়ারের মূল কাঠামো মেটালিক যা জিআই পাইপ/অ্যাঙ্গেল বা এসএস বার এর তৈরি। এর একদিকে বাতাস প্রবেশের জন্য ছোট মেসের জালের দরজা ও অন্যদিকে বাতাস বের হওয়ার জন্য এক বা একাধিক একজস্ট ফ্যান লাগানো থাকে। জালের দরজা ছাড়া কাঠামোর সকল পাশে ৯ মিমি পুরুত্বের স্বচ্ছ সেলুলয়েড পলিথিন লাগানো থাকে। রাতে বা মেঘলা দিনে মাছ শুকানোর জন্য এই ড্রায়ারে হট এয়ার ফ্যান বা হিটিং কয়েল স্থাপন করা হয়। স্বচ্ছ সেলুলয়েডের মধ্য দিয়ে

চিত্র-২২ঃ বিএফআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের রুই

সূর্যকিরণ ড্রায়ারে প্রবেশ করে ও পাটাতনের কালো অংশে শোষিত হয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা ভেতরের বাতাসকে গরম করে। এই গরম বাতাস ফ্যানের মাধ্যমে মাছের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দ্রুত মাছ শুকিয়ে যায়। নিরাপদ শুঁটকি তৈরিতে কক্সবাজার অঞ্চলে বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা বর্তমানে এই ড্রায়ার ব্যবহার করছেন।

১৩. সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ণয় (Determination of breeding season of marine fish)

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ের জন্য ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হতে বিগত ৩ বছর যাবৎ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভেটকি (*Lates calcarifer*), লাল পোয়া (*Johnius argentatus*), তুলার ডান্ডি (*Sillago damina*), রূপচাঁদা (*Pampus chinensis*), ছুরি (*Trichiurus haumela*) ও লইট্যা (*Harpodon nehereus*) মাছ এপ্রিল থেকে জুলাই, তাইলা (*Eleutheronema tetradactylum*) মাছ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং মুগিল মাছ (*Mugil cephalus*) অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে প্রজনন করে থাকে। ভেটকি মাছের সর্বোচ্চ প্রজননকাল হচ্ছে মে মাস। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

১৪. মাছের রোগ নিরাময়ে ভেষজ কালোজিরার ঔষধি ব্যবহার (Use of herbal drugs in fish disease control)

আদিকাল থেকে বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার পাতা, ফল-ফুল, বীজ, আঠা, ছাল ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ঔষধ

চিত্র: গবেষণার শুরুতে সরপুঁটির লেজে ক্ষত চিহ্ন

চিত্র: কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসার পর ক্ষতরোগ নিরাময়

হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে বিএফআরআই ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভেষজ ঔষধের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কালোজিরা (*black cumin, Nigela sativa*) মাছের ক্ষতরোগ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, কালোজিরার বীজে ৪০% তেল থাকে। তাছাড়া তেলে লিনোলেয়িক, স্টিয়ারিক ও লেনোলেনিক নামক ফ্যাটি এসিড এবং পালমেটিক নামক অ্যামিনো এসিড থাকে (১৫%)। এছাড়া তেলে নাইজেলুন, টারপিন, কারভুন ও কারভিন থাকে। এর নির্যাস ছত্রাক নিরোধক হিসেবে কাজ করে। কালোজিরার এসব গুণ বিবেচনায় ক্ষতরোগে আক্রান্ত স্বরপুঁটি ও রুই মাছকে পুকুরে হাপার ভেতর ২৮ দিন কালোজিরা বীজ তেল ৬ মিলি/কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এতে মাছের ক্ষত রোগ ভালোভাবে নিরাময় হয়ে যায়। মাছের বাহ্যিক দিক ও হিস্টোলজি পরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তীতে তা নিশ্চিত করা হয়।

১৫. চিংড়ি রোগ শনাক্তকরণ (Development of shrimp disease diagnosis protocol)

আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পের মধ্যে চিংড়ি অন্যতম। চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। কিন্তু চিংড়ি চাষে আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পোনার স্বল্পতা ও চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটের বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র OIE (World Animal Health Organization) বর্ণিত চিংড়ির ১১টি রোগের মধ্যে ৭টি রোগ (WSSV, AHPND, NHP, MrNV, XSV, MrTV, EHP) মলিকুলার পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যম নির্ণয়ে ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ/প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১৬. ওয়েস্টার, ঝিনুক ও শামুকের পুষ্টিমান নির্ণয় (Nutritive value of oyster, snail and mussels)

আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির মিঠাপানি ও সামুদ্রিক ঝিনুক ও শামুক পাওয়া যায়। এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মাঝে অনেকগুলোরই খাদ্যমান অধিক উন্নতমানের। এরমধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ওয়েস্টার অন্যতম। এতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে। শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার-এ উচ্চমাত্রায় পুষ্টিগুণ বিদ্যমান থাকায় এবং বিদেশে এদের প্রচুর চাহিদা থাকার কারণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টারের চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়েছে।

চিত্র: সামুদ্রিক ওয়েস্টার, শামুক ও ঝিনুক

১৭. সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে অ্যাপস তৈরি (Development of Apps)

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট হতে এ যাবত ৫টি Apps তৈরি করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ই-ইলিশ, বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো, চিংড়ি স্বাস্থ্য বাতায়ন, ই-কার্প ও র‍্যাপিড ফিড টেস্ট। 'ই-ইলিশ' Apps এ ইলিশের প্রজননক্ষেত্র, অভয়াশ্রম, খাদ্যাভাস, ডিম ধারণ ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ; 'চিংড়ি স্বাস্থ্য বাতায়ন' Apps এ চিংড়ির খামার নির্বাচন, খামার প্রস্তুতকরণ, রোগ ব্যবস্থাপনা; 'বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো' Apps এ কাপ্তাই লেকের পরিচিতি, মাছের উৎপাদন, প্রজনন ক্ষেত্র; 'র‍্যাপিড ফিড টেস্ট' Apps এ স্বল্প সময়ে মাছের বিভিন্ন খাদ্যের গুণগতমান নির্ণয় এবং 'ই-কার্প' Apps এ বিভিন্ন মাছের প্রজনন সময়, হরমোন ডোজসহ বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এসব Apps বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ভেলিডেশন করা হচ্ছে।

চিত্র: বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলিশ বিষয়ক অ্যাপস

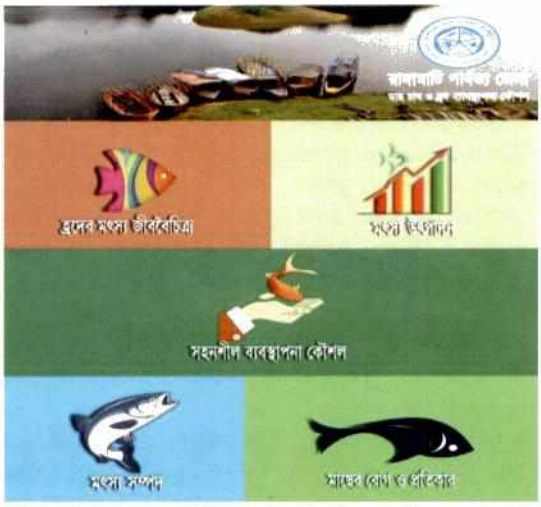

চিত্র: বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কাপ্তাই লেক বিষয়ক অ্যাপস

উপসংহার (Conclusion)

আমাদের ৪৭ লক্ষ হেক্টর মিঠাপানির অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে ৩৯ লক্ষ হেক্টর রয়েছে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় ও অবশিষ্ট ৮ লক্ষ হেক্টর হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়। বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৫৭% আসে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় থেকে এবং ২৭% আসে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে। দেশের ক্রমবর্ধমাণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে আমাদের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় এবং বিস্তৃত সমুদ্রকে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। অপরদিকে, মাছ থেকে মৎস্য ও মৎস্যজাত মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন এবং মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি কমিয়ে আনা এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ করছে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (ই-মেইল: dgbfri@gmail.com)

সমুদ্র স্বাস্থ্যসূচক ঃ নিরাপদ সাগর ব্যবস্থাপনা কৌশল
Ocean Health Index : Management Strategy for Safe Sea

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

Abstract

Ocean, the trusted deliverer of life saving items for human race, is facing tremendous threat due to deterioration of its health. Indiscriminate intrusion and exploitation of resources, specially overfishing from the oceans through IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing and making it a dumping ground of toxic and radioactive materials, oil spills, plastic debris, acidification, mining and other hazardous pollutants have made the health of ocean under threat. The oceans of the world are indexed through 10 categories such as biodiversity, clean waters, ability to provide food for human and support livelihood of the people living in coastal regions. In 2018, the Global ocean score was 70 explaining us a critical warning that we are not managing the oceans in a responsible manner. There exists enough opportunities for improvement and there is hope, the index will make that point abundantly clear. Bangladesh, ranked 120 among 221 countries scoring 66, has also ample opportunity for improvement of her coast-line and ocean area. This is high time to make a comprehensive plan for ocean health improvement so that we can leave a healthier ocean to our next generation.

পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে একটা বিশাল মহাসমুদ্র যার মাত্র ২৫ ভাগ জুড়ে রয়েছে স্থল। মহাসমুদ্র ৫টি (যথা- প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, মেরুঅঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলীয়) মূল বেসিনে বিস্তৃত। মহাসমুদ্রকে আমরা মহাসাগর, সাগর আর উপসাগর হিসেবে চিনি। আমাদের দেশ ভারত মহাসাগরের বঙ্গোপসাগরের কোলে বিস্তৃত। বস্তুত সমুদ্র হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তৃত, রহস্যময় এবং উপকারী স্থানগুলোর মধ্যে সেরা। পূর্বে ধারণা করা হতো যে, সমুদ্রের বিশালত্বের কারণে (আয়তন, গভীরতা, বিভিন্ন পদার্থের মজুদ, জড় ও জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি) এতে যে কোনো রকম অযাচিত হস্তক্ষেপের পরিণতি অগ্রাহ্য করার মতো ক্ষুদ্র হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, বিগত কয়েক দশকে মানব সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের প্রিয় এ সমুদ্রসীমায় মানুষের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত বলা যায় সমুদ্রের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষের গম্যতা নেই। সকল অগম্য, দুর্গম সমুদ্র এখন আমাদের করায়ত্তে। সেই সাথে সমান তালে চলছে পৃথিবীর, বিশেষত এর সমুদ্রের পরিবেশ বিপর্যয় যা এর স্বাস্থ্যের প্রতিনিয়ত ক্ষতিসাধন করে চলছে।

সমুদ্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের জীবনের জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তার ৭০ ভাগ, যে পানি ব্যবহার করি তার ৯৭ ভাগই সমুদ্র সরবরাহ করে। আমাদের জন্য খাবার, বাসস্থান, ঔষধ, অলংকার, ভ্রমণানন্দ ইত্যাদির সিংহভাগই আসে সমুদ্র থেকে। সমুদ্র আমাদের নিশ্বাসে ত্যাগ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে শুষে নেয়। এছাড়াও পরিবেশগত পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবকে কার্যকরভাবে কমিয়ে রাখে। আর তাই সমুদ্রস্বাস্থ্য ঠিক রাখা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

সমুদ্র স্বাস্থ্য (Ocean health)

সমুদ্রে রয়েছে বেশ ক'টি পরিবেশগত অবস্থা যা এর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। এগুলো যদি কোনোভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সমুদ্র স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'সমুদ্রস্বাস্থ্য' শুধুমাত্র সমুদ্রের 'সম্পদ' সংগ্রহের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ না করে সমুদ্র কর্তৃক এর ওপর নির্ভরশীল মানুষ আর প্রাণিকূলের জন্য পরিসেবা সরবরাহের টেকসই ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।

সমুদ্রস্বাস্থ্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়া (Process of determining Ocean Health Index)

সমুদ্রস্বাস্থ্য নির্ণয় একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। অসংখ্য নির্ণায়ক একে প্রভাবিত করে। গভীর সমুদ্রের ওপর খুব বেশি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে নেই বিধায় বিভিন্ন দেশের শুধুমাত্র একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone-EEZ) থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সমুদ্রসমূহকে ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর দিয়ে র‍্যাংকিং করা হয়েছে।

সমুদ্রস্বাস্থ্য বিপন্ন করার নিয়ামকসমূহ (Factors affecting ocean health)

সমুদ্রস্বাস্থ্য বিপন্ন করার নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. রাসায়নিক দুষণ; ২. প্লাস্টিক বর্জ্য; ৩. অনিয়ন্ত্রিত, অনিবন্ধিত, বেআইনি মৎস্য শিকার; ৪. প্রবাল রিফের

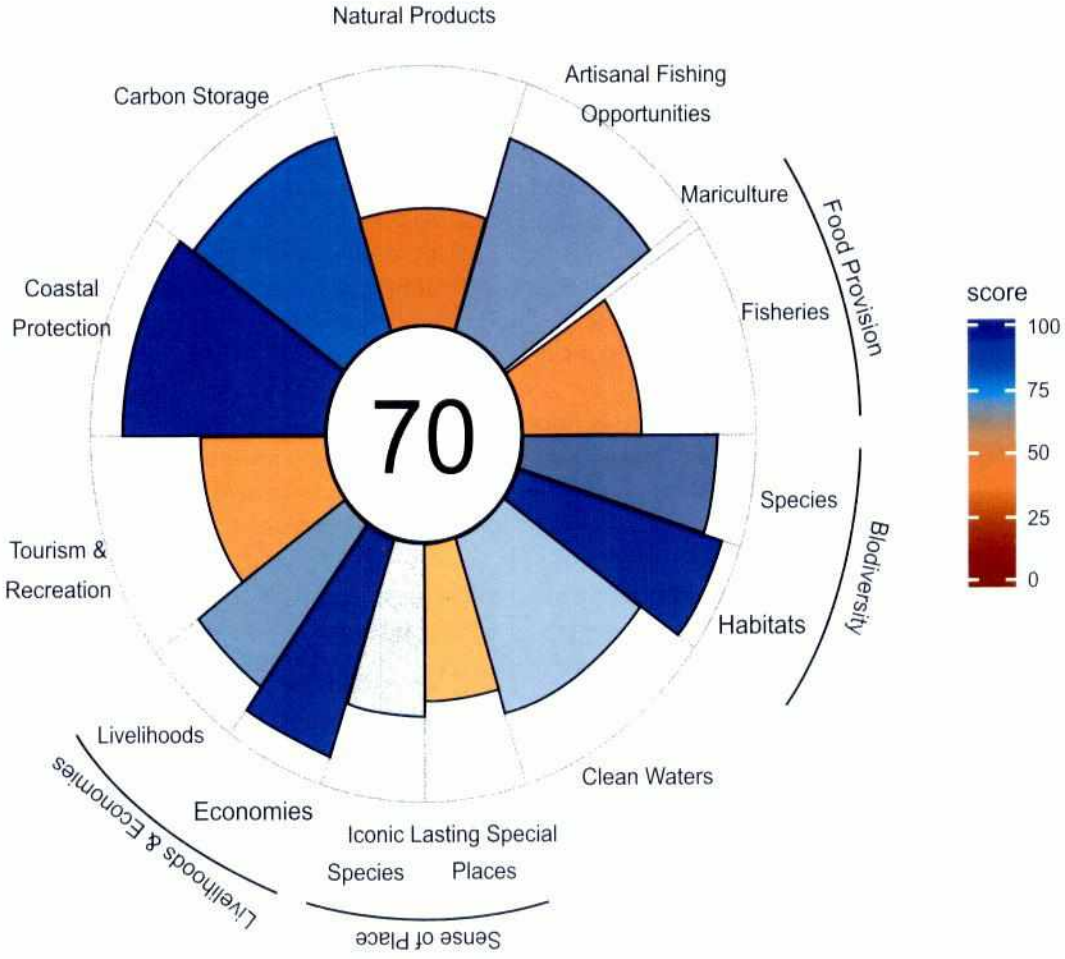

চিত্র: বৈশ্বিক সমুদ্রস্বাস্থ্যের স্কোর

অনিয়ন্ত্রিত আহরণ; ৫. অম্লতা বৃদ্ধি; ৬. মাছের অতি আহরণ; ৭. গলে যাওয়া হিমবাহ; ৮. সমুদ্রের সকল স্থানে মানুষের গম্যতা (সমুদ্রে এখন আর কোনো এলাকা অগম্য নেই);

৯. খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি; ১০. খনিজ সম্পদ আহরণে আবাসস্থল ধ্বংস।

সমুদ্রস্বাস্থ্য নির্ধারণের নির্ণায়কসমূহ (Criteria of ranking ocean health)

যে ১০টি নির্ণায়ক দিয়ে এ স্কোর ও র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয় সেগুলো হলো:

১. **খাদ্য সরবরাহ:** সংশ্লিষ্ট দেশ তার সমুদ্র থেকে কি পরিমাণ টেকসই খাদ্য আহরণ করে বা ফলায়;

সারণি: ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সমুদ্রস্বাস্থ্য (উৎস: ওয়ার্ল্ড ওশান ইনডেক্স)

ক্রম	সূচকের নাম	বাংলাদেশের স্কোর	বৈশ্বিক স্কোর
১	খাদ্য সরবরাহ	২৩	৫১
২	আর্টিসনাল ফিসিং	৬০	৭৮
৩	প্রাকৃতিক উৎপাদন	৯৫	৪৫
৪	কার্বন স্টোরেজ	১০০	৭৯
৫	উপকূল সংরক্ষণ	১০০	৮৬
৬	উপকূলীয় জনজীবনের জীবনমান ও অর্থনীতি	১০০	৮২
৭	পর্যটন ও বিনোদন	১১	৫৪
৮	পরিষ্কার পানি	২৪	৭১
৯	জীববৈচিত্র্য	৮৯	৮৭
১০	অবস্থান	৬৩	৬৪

২. **আর্টিসানাল ফিসিং:** ক্ষুদ্রায়তনের মাছধরা নৌকার সাহায্যে মাছ ধরার সম্ভাব্যতা;

৩. **প্রাকৃতিক উৎপাদন:** সমুদ্র থেকে জীবন্ত খাদ্য (যেমন- মাছ) বা খাদ্য নয় এমন জিনিসের (যথা- প্রবাল, শক্ত খোলসযুক্ত প্রাণী, শৈবাল, অ্যাকোরিয়াম ফিস ইত্যাদি) উৎপাদন;

৪. **মজুদ কার্বন:** সমুদ্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আবাস যথা ম্যানগ্রোভ, সামুদ্রিক তৃণভূমি ও লবণাক্ত জলাভূমি সংরক্ষণ। ফলে মজুদ কার্বন বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে পারে না এবং এতে করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষতি যথাসম্ভব কমানো যায়; এবং

৫. **উপকূল সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক আবাসস্থল (যথা- বাঁদাবন, প্রবাল প্রাচীর, সামুদ্রিক তৃণভূমি) ও উপকূলীয় বাঁধ যা সাধারণত উপকূলীয় অবকাঠামোসমূহ (যথা, উপকূল রেখা, ঘরবাড়ি, গো-চারণভূমি ইত্যাদি) রক্ষা করে।

সমুদ্রস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রাপ্ত স্কোর (Global average)

২০১৮ সালের সামগ্রিক সমুদ্রস্বাস্থ্য ১০০ পয়েন্ট গ্রেডের মধ্যে ৭০ অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে যেটি ছিল ৬০। বলা যেতে পারে সমুদ্রস্বাস্থ্য বিগত বছরে মোটামুটি স্থিতাবস্থায় রয়েছে। চিত্র-১ এ সমুদ্রস্বাস্থ্যের বিভিন্ন নিয়ামক এবং প্রাপ্ত গড় পয়েন্ট দেখা যেতে পারে। এটা থেকে অবশ্য এটাও বিবেচনা করা যায় যে, সমুদ্রস্বাস্থ্য উন্নয়নে এখনো অনেক কিছু করার সুযোগ আছে।

বাংলাদেশের অবস্থান (Bangladesh score)

বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরের একটি অংশ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। এ উপসাগরের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কলোমিটার এলাকা এ দেশের আওতায়। পৃথিবীর ২২১টি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকার (EEZ) মধ্যে সার্বিক নির্ণায়ক বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২০ পর্যায়ে।

বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর ৬৬ যা বৈশ্বিক স্কোরের চেয়ে কম। সমুদ্রস্বাস্থ্য সূচকের মাধ্যমে সমুদ্র হতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীকে সারণিতে বর্ণিত বিবিধ আর্থিক ও পরিবেশগত উৎকর্ষসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হলো।

সমুদ্রস্বাস্থ্যের অবস্থান বিবেচনায় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯০ স্কোর করে তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েছে হার্ড ও ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ, দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জার্মানি (স্কোর ৮৫)। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৮৫ (স্কোর ৫৯), শ্রীলংকা ১৭৫ (স্কোর ৬০), মিয়ানমার ১৪৪ (স্কোর ৬৩) ও মালদ্বীপ ১০৬ (স্কোর ৬৮)।

উপরের স্কোর পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের অন্যান্য দেশের সমুদ্রস্বাস্থ্য এবং বিশ্ব সমুদ্রস্বাস্থ্যের নিরিখে মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।

ইতোমধ্যে সমুদ্র সাস্থ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- ৫৬২৪ বর্গ কি.মি. মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা;
- প্রাকৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা;
- উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা;
- টুনা ও অন্যান্য মাছ আহরণে লং লাইনার ও পার্স সেইনার প্রকৃতির ফিসিং লাইসেন্সের অনুমতি প্রদান;
- IOTC এর সদস্য পদ অর্জন;
- RV Meen Shandani ও Dr. Fridtjof Nansen কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে Acoustic সার্ভে পরিচালনা;
- সকল বটম ট্রলিং ভেসেল মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project গ্রহণ।

উপসংহার (Conclusion): সমুদ্রস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে প্রতিটি দেশের উচিত এককভাবে নিজস্ব এলাকার সমুদ্র এবং যৌথভাবে আঞ্চলিক সমুদ্রস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমুদ্রস্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতিশ্রুত দেশের সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর টেকসই আহরণের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সমুদ্রস্বাস্থ্যের সুষ্ঠু পরিচর্যা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: sumanazma@yahoo.com)

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা

Fisheries Resources in Sundarbans : Potentials and Proposals

মোঃ আমিনুল ইসলাম[১], শবনম মোস্তারী[২] ও সালমা আক্তার[৩]

Abstract

The Sundarbans is the largest mangrove wetland in the world. It covers an area of about 6017 sq. km in Bangladesh territory. About 33% of the total Sundarbans is inland open water. This unique ecosystem support 204 fish and shell fish species. The mangrove forest and mudflats of Sundarbans provide the rich breeding and nursery grounds of fish, crustaceans, mollusks and other aquatic species. In spite of this potentials for fisheries, limited interventions have been taken for the conservation and management of fisheries resources in the Sundarbans. Fisheries management within the forest area have been carried out under the administrative control of the Department of Forest. For this reason, there is lack of integrated and technical support for appropriate conservation and management of fisheries. This initiative and planning did not support much to boost the fish production as well as aquatic biodiversity conservation. It is suggested that the policy options and the management regimes should be critically reviewed and grounded to the government's allocation of business. Beneficiaries and stakeholders at all levels should have access as to contribute towards sustainable conservation and management of sundarbans fisheries.

সুন্দরবন একক খণ্ডে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। আয়তন ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার। এটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল (reserve forest)। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৮৯.০০০ - ৮৯.৫৫০ পূর্ব অক্ষাংশ এবং ২১.৩০০-২২.৩০০ উত্তর দ্রাঘিমাংশে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ১০ লক্ষাধিক হেক্টর বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে অবস্থিত। সুন্দরবনের ৬০% বাংলাদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় বিস্তৃত বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৫,৫৭,২৮৬ হেক্টর (৫,৭৭২.৮৫ বর্গ কিমি)। এর মধ্যে ৪,০১,৬৮৫ হেক্টর বনভূমি এবং বাকি ১,৫৫,৬০০ হেক্টর নদী, খাল, খাঁড়ি এবং মোহনা। এ বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মঙ্গল ও আইরপাঙ্গাশিয়া। তাছাড়া ৪৫০টির বেশি খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে, যা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ প্রজননক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল। এ বনাঞ্চলের জলাশয়ে বিদ্যমান মৎস্য প্রজাতি ও মৎস্যসম্পদ বাংলাদেশের সার্বিক জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বনসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও আয়ের অন্যতম উৎস। সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছে।

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ
(Fisheries resources in Sundarbans)

জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ বিবেচনায় সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণী উচ্চ লবণাক্ত সহিষ্ণু। অভ্যন্তরীণ নদীসমূহের পলি, খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ মিষ্টি পানি মোহনা অঞ্চলে মিশে। আবার বনের লতাপাতাও পড়ে। ফলে এসব জৈব-অজৈব পুষ্টি উপাদান মিশ্রণে এ অঞ্চলের পানির উর্বরতা ও খাদ্যের প্রাচুর্য বেশি। মিষ্টি ও লোনা পানির মিশ্রণ এবং অন্যান্য অনুকূল পরিবেশ এখানে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম যা প্রতিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় ইকোটোন (ecotone) নামে পরিচিত। অনুকূল, সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত খাদ্য শিকল বিরাজমান থাকায় এখানে মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য সর্বাধিক। উচ্চ লবণাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় সামগ্রিকভাবে এ বনাঞ্চলের মৎস্যসম্পদের ওপর বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। সুন্দরবন বিভিন্ন প্রজাতির উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছের লালন ও চারণভূমি এবং স্থায়ী আবাসস্থল।

সুন্দরবনের মোট আয়তনের প্রায় ৩৩% অভ্যন্তরীণ জলাশয় যার আয়তন ১৮৭৪ বর্গ কিমি। বনসংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকার আয়তন ১৬০৩ বর্গ কিমি। সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয় মৎস্যসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইলিশ, লইট্টা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিতরা ইত্যাদি মাছ এবং গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য মৎস্যসম্পদ। সুন্দরবনে রয়েছে ২০৪ প্রজাতির মাছ। তন্মধ্যে ২০ প্রজাতির তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছ, ৪০ প্রজাতির অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মাছ, ৫৩ প্রজাতির পেলাজিক মাছ, ১২৪ প্রজাতির ডিমার্সাল মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ৮ প্রজাতির লবস্টার ও ৩ প্রজাতির কচ্ছপ (IUCN, 1994)। সুন্দরবনে আহরিত মাছের পরিমাণ সারাদেশে উৎপাদিত মাছের শতকরা ৫ ভাগ। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য মৎস্য প্রজাতিসমূহ হলো– *Hilsa ilisha, Lates calcarifer, Pomadasys hasta, Polynemus spp., Johnius dussumeri, Johnius argentatus, Haarpodon nehereus, Trichurus haumela, Setipinna taty, Pampus argenteus, Sardinella spp., Selar spp., Macrobrachium rosenbergii, Penaeus monodon, Penaeus indicus, Metapenaeus monoceros, Parapenaeus spp., Scylla serrata* এবং বিভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর (শাহ, ১৯৯৮)।

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ইনশোর (inshore) এবং অফশোর (offshore) ফিসারি এই দুইভাগে বিভক্ত। ইনশোর ফিসারি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরের জলাশয়ের ৮১৭ বর্গ কিমি এলাকায় বিস্তৃত। অফশোর ফিসারি সমুদ্র তীরের ৩,২১০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে অবস্থিত। প্রায় ২ লক্ষ জেলে পরিবার ৪০০০০ ছোট নৌকা দিয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জলাভূমি উপকূলবর্তী (inshore) এবং গভীর সমুদ্রের (offshore) মৎস্য সম্পদের মজুদ সমৃদ্ধকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজননক্ষেত্র ও নার্সারি গ্রাউন্ড। অবৈধ হলেও এখান থেকে লক্ষ লক্ষ বাগদা এবং গলদা চিংড়ির পোস্ট-লার্ভি সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত হয়। দুবলার চরের শুঁটকি শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শুঁটকি চাহিদার এক উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করে এবং প্রায় ৩০ হাজার দরিদ্র জেলের জীবিকার অন্যতম উৎস। সুন্দরবন ও বনসংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১৪ ধরনের উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে মৎস্য আহরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো ইলিশ জাল, কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, বিভিন্ন ধরনের বড়শি, ফাঁস জাল, বেড় জাল, জগৎ বেড় জাল, চরঘেরা জাল, ভেসাল জাল, ঠেলা জাল ইত্যাদি।

সুন্দরবনের বর্তমান মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Current management practice in Sundarbans)

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এককভাবে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এখানকার মৎস্য আহরণ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বোট লাইসেন্সিং সার্টিফিকেট (Boat Licensing Certificate) এর আওতায় পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতিতে বন অধিদপ্তর বছরে ১২০০০-১৫০০০ নৌকাকে সুন্দরবনে বছরব্যাপী মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতি নৌকায় ৩-৫ জন জেলে প্রতি ৭ দিনের জন্য মৎস্য আহরণ পারমিট (Permit) নিয়ে সুন্দরবনে মাছ আহরণ করে। সুন্দরবনের ২টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অধীন ৪টি রেঞ্জের ১৭টি স্টেশন অফিস হতে মৎস্য আহরণ পারমিট ইস্যু করা হয়। নির্দিষ্ট পারমিট ফি এবং আহরিত মাছের ঘোষিত পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে জেলেদের মোট ফি প্রদান করতে হয়। বর্তমানে বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সুন্দরবনের মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনা কেবল রাজস্বকেন্দ্রিক। জৈবিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে এ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ মারাত্মক হুমকির মুখে। বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের সময় অন্যান্য জাতের চিংড়ি ও মাছের পোনা ধরা পড়ে। বাজার চাহিদা বা আপাত অর্থমূল্য না থাকায় এগুলো ফেলে দেয়া হয়। এতে সামগ্রিকভাবে মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রতিটি বাগদা রেণুপোনা আহরণে ১০০-২৩৮৪টি অন্যান্য মৎস্যজীব (fisheries organism) নষ্ট হয় (সারণি ১)। চাঁনতারাশ্রী (১৯৯৪) সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং বার্ষিক প্রজাতিভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন (Yield, Ton), আহরণ হার (Exploitation Rate, E) এবং সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন হার (MSY, Ton) সুপারিশ করেন (সারণি ২)।

সারণি ১: বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণকালে ধৃত ও নষ্টকৃত অন্যান্য মাছ ও ম্যাক্রো-জুপ্ল্যাংকটন ক্ষতির তুলনামূলক বিবরণ

বছর	এলাকা	বাগদা পোনা (সংখ্যা)	অন্যান্য চিংড়ি পোনা (সংখ্যা)	সাদা মাছের পোনা (সংখ্যা)	ম্যাক্রো জুপ্ল্যাংকটন (সংখ্যা)	বাগদা:অন্যান্য মৎস্যজীব (অনুপাত)	তথ্যসূত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৮৯	কক্সবাজার	১	২২	৩১	৪৭	১:১০০	আলম, ১৯৯০
১৯৯৭	শৈলমারি, খুলনা	১	৬৪১	৭৩	১৬৭০	১:২৩৮৪	কামাল ও অন্যান্য, ১৯৯৮

সারণি ২: সুন্দরবনের মাছের প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন, আহরণ ও সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল আহরণ হার

প্রজাতি (Species)	উৎপাদন (Yield,Ton)	স্থায়িত্বশীল উৎপাদন (MSY, Ton)	আহরণ হার (Exploitation Rate, E)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
Hilsa ilisha	750	-	0.58	Over exploited
Lates calcarifer	150	-	0.50	Fully exploited
Pangasius pangasius	150	-	0.75	Over exploited
Pomadasys hasta	200	-	0.40	Optimum exploited
Macrobrachium rosenergii	250	-	0.37	Optimum exploited
Scylla serrata	375	283	-	Over exploited
Crassostrea gigas	3000	6000	-	Under exploited
Cassidula auristelis	35	113	-	under exploited
penaeus monodon	1453	672	-	Optimum exploited

সারণি ২ হতে দেখা যায় যে, বর্ণিত ৯টি প্রজাতির মধ্যে ৫টি প্রজাতি অতিরিক্ত আহরিত, ২টি প্রজাতি সহনীয় আহরিত ও ১টি প্রজাতি কম আহরিত। মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদনসহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্বভুক্ত। অথচ সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা বনবিভাগের একক নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কোন কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

বিগত তিন দশকে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ, যেমন অতি আহরণ, মাছের লালন, বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস, বাণিজ্যিক জলযানের যথেচ্ছ চলাচল, চর, অভিপ্রয়াণ রুট হ্রাস, ইত্যাদি কারণে সুন্দরবনের মৎস্য উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে। এগুলো সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে সুন্দরবন সংলগ্ন নদীগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও স্বাদু পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। স্পষ্টতই খুলনা এবং মংলা বন্দরের বর্জ্যসমূহ সুন্দরবনের মৎস্য প্রজাতির ওপর সরাসরি বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল (reserve forest)। এ বনের বাইরে বনসংলগ্ন ১০ কিমি ব্যাপী এলাকা পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত। কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরবন থেকে কাঠ সংগ্রহ, গোলপাতা আহরণ, মধু সংগ্রহ এবং মাছ আহরণে অনুমতি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের মজুদ সম্পর্কে কোনো গবেষণাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বস্ত তথ্য নেই। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন পূর্ণাঙ্গ জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ হ্রাসের অনুমিত কারণ
(Possible reasons for reducing the fisheries resources in Sundarbans)

- মজুদ নিরূপণ ছাড়াই রাজস্বভিত্তিক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ জাল ও আহরণ উপকরণ দিয়ে মৎস্য আহরণ;
- সুষ্ঠু মৎস্য ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি এবং আহরণে তদারকি না থাকা;
- মৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত না করা;
- অবৈধ উপায়ে ও বিষ প্রয়োগে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ, কাছিম আহরণ;
- অবৈধভাবে চিংড়ির পিএল আহরণ এবং জাটকা নিধন;
- জলযানের নির্বিচার চলাচল এবং তেল ও বর্জ্য নিঃসরণ;
- দূষণ ও মাছের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; এবং
- চিংড়ি, কাঁকড়া ও মাছের প্রজনন ও লালনক্ষেত্রের পরিচর্যার অভাব।

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবনা
(Fisheries management proposals of Sundarbans)

বর্তমানে সুন্দরবন এলাকায় মৎস্য আহরণে অনুমতি প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম বন অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক কারণে সুন্দরবনে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত। দেশের মৎস্যসম্পদ সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলেও সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। ফলে সুন্দরবন এলাকার মৎস্য নৌযান সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ডাটাবেইজ মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকটি স্থানের মৎস্যজীবী, মৎস্য

নৌযান, জাল ও মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ইতোমধ্যে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ২৭/১০/২০১৫ তারিখে সুন্দরবন সুরক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় 'বন অধিদপ্তরের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর সুন্দরবনে মৎস্য সংক্রান্ত বিষয়ের সমীক্ষা করবে' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের টেকসই ও স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বন অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সরাসরি অংশগ্রহণে এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের গবেষণাভিত্তিক কারিগরি সহযোগিতায় ইকোসিস্টেমভিত্তিক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- মৎস্য এবং অন্যান্য Aquatic fauna and flora-এর মজুদ নিরূপণ;
- সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য উৎপাদনমাত্রা (Maximum Sustainable Yield–MSY) বা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক উৎপাদনমাত্রা (Maximum Economic Yield–MEY) নির্ধারণ;
- Ecosystem based মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মৎস্য অধিদপ্তর ও বন বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে মৎস্য আহরণকারী নৌযান, মৎস্য আহরণ উপকরণের প্রকার ও সংখ্যা, জেলের সংখ্যা এবং আহরণকাল সুনির্দিষ্টকরণ;
- কেবলমাত্র মৎস্য অধিদপ্তর প্রদত্ত বৈধ আইডি কার্ডধারী জেলেদের মৎস্য আহরণের অনুমতি প্রদান;
- মাছের মজুদ সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;
- বন অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ পরিচালনার জন্য বন বিভাগের সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন;
- মৎস্য আহরণকারী জেলেদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণ;
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাছের সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা ও বলবৎসহ অন্যান্য উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;
- সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring, Control and Surveillance–MCS) কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন প্রতিপালনপূর্বক টেকসই মৎস্য আহরণ এবং আবাসস্থলের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যুগপৎ উদ্যোগে সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা কৌশল প্রবর্তন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

উপসংহার (Conclusion)

সুন্দরবন বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজাতি বৈচিত্র্য, উৎপাদন, বিস্তৃতি ও আবাস বৈচিত্র্য বিবেচনায় সুন্দরবনের মৎস্য ভাণ্ডার দেশের সামগ্রিক মৎস্যসম্পদের উল্লেখযোগ্য পরিপূরক। এ প্রেক্ষিতে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের সার্বিক ও স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুন্দরবনে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রবেশাধিকার, মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আশু উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। এজন্য বন অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা প্রয়োজন।

[১]পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: amindofbd@gmail.com)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অর্জিত সাফল্য

Initiatives for Hilsa Fishery Management and Success

মাসুদ আরা মমি[১] ও মোঃ মাহবুব উল হক[২]

Abstract

Hilsa (Indian shad) is an iconic fish of Bangladesh contributing significantly to national fish production, employment and economic return. Hilsa production increased by 2.14 lac MT from the year 2008 to 2018. A number of initiatives have been undertaken by all concerned stakeholders in attaining incremental production of hilsa. The major actions were mass awareness for the protection of Jatka from November to June and protection of brood hilsa in peak beeding season during 22 days ensuring ban period for hilsa catch, vulnerable group feeding (VGF) program for fishers' under GoB's safety net coverage, support with alternative livelihoods materials, establishing hilsa sanctuary, ceasing illegal fish net and observing Jatka week each year. In terms of quantitative assessment for implementing 6 hilsa sanctuaries with a total length of 432 km covering 6 coastal districts- Barishal, Bhola, Chandpur, Laxmipur, Shariatpur and Patuakhali were declared by the competent authority. For uninterrupted breeding of hilsa, about 7000 sq. km area was declared as a reserve area spreading over in Mirersharai, Tojumuddin, Kolapara and Kutubdia Upazilas. About 2000 MT of jatka was seized over the country in last 8 years. A great achievement is the declaration of first ever Marine reserve area covering an area of 3188 sq. km adjacent to 'Nijhum Dwip' in Hatia upazila under Noakhali district. A number of challenges were also identified such as using current jal, behundi jal, reducing river navigation and having no specific mesh size to catch hilsa. In continuing the aforesaid initiatives for sustainable management of hilsa and conserving Jatka, finally other aquatic biodiversity and productivity be restored and enriched.

ইলিশ মাছ ইন্ডিয়ান স্যাড (Indian shad) নামে বিশ্বে পরিচিত। জীববৈচিত্র্যের আলোকে ইলিশ মাছের *(Tenualosa ilisha)* মত অভিপ্রয়াণশীল মাছ থাকা একটি দেশের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার তাই এর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সবার উপরে। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মিশে আছে ইলিশের স্বাদ, রূপ ও সুঘ্রাণ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সকল নদ-নদীতে এক সময় সারা বছরব্যাপী ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু আশির দশকের পর থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া জাতীয় ইলিশ মাছ রক্ষা ও উন্নয়ন মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট।

জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের গুরুত্ব

(Importance of hilsa in national economy)

বাঙালীর অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু এ মাছ যুগ যুগ ধরে রসনা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিরাপদ আমিষ সরবরাহে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরে একক প্রজাতি হিসেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদ। গত ২০০৮-০৯ সনে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ৩.১৩ লক্ষ মে.টন, ২০১৭-১৮ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.১৭ লক্ষ মে.টনে, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ এবং এর চলতি বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা (৪০০ টাকা/কেজি)। শুধু তাই নয় জিডিপি-তে ইলিশ মাছের আবদান প্রায় শতকরা ১ ভাগ। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিগত দশ বছরে ইলিশ উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৫.২৬ শতাংশ।

সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৭৫ শতাংশের অধিক আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী, মোহনা ও সাগর হতে। আর এ বিশাল সম্পদের আহরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার ওপর উপকূলীয় জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলবাসীদের জীবন-জীবিকা অতিবাহিত হয়ে থাকে। দেশের উপকূলীয় এলাকা ও পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ আহরণে প্রায় ৫ লক্ষ মৎস্যজীবীর প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ইলিশ পরিবহণ ও বিপণন, জাল-নৌকা তৈরি ও বিপণন, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কাজে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং দরিদ্র মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে ইলিশের ভূমিকা অপরিসীম।

ইলিশ সম্পদ রক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
(Government initiatives in hilsa fishery conservation)

জাতীয় এ সম্পদ রক্ষার বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার ইতোমধ্যেই ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইলিশ সম্পদ রক্ষা এবং এর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় সর্বস্তরের জনগণকে অবহিতকরণ এবং সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালানো;
২. প্রতিবছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা ধরা নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় নদীতে, মাছ-ঘাটে, আড়তে ও বাজারে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
৩. জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যাতে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়, সেজন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;
৪. জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা প্রকার উপকরণ বিতরণ;
৫. পদ্মা, মেঘনা, আন্ধারমানিক ও তেতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে জাটকার বিচরণক্ষেত্রে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন;
৬. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২দিন প্রজনন এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা এবং জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;
৭. উপকূলীয় এলাকায় জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে 'সম্মিলিত বিশেষ অভিযান' পরিচালনা; এবং
৮. প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন।

ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন
(Amendment of fish conservation act for protection and development of hilsa fishery)

- মা ইলিশ রক্ষায় ২০১১ সালে মৎস্য সংরক্ষণ বিধি সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী আশ্বিন মাসের ১ম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে প্রধান প্রজনন মৌসুম পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে ১১দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হলেও মাঠ পর্যায়ে আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে গবেষক, জেলে প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- জাটকা রক্ষায়ও বিদ্যমান বিধিটি সংশোধন করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধিটি ২০১৪ সালে সংশোধন করে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত ৮ মাস এবং জাটকার দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি বা ১০ ইঞ্চি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধি অনুযায়ী ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেমি এর কম দৈর্ঘ্যের ছোট ইলিশ (জাটকা) ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত ধরা, পরিবহণ, বিক্রয়, হেফাজতে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ।
- জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষায় অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রজননক্ষেত্র সুরক্ষা, জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব ইলিশ রক্ষা ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল।
- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব ইলিশ সুরক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ইলিশ রক্ষায় অভয়াশ্রম স্থাপন
(Establishment of hilsa sanctuary)

দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ইতোমধ্যেই ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৩২ কিলোমিটার। অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ৬টি জেলা হচ্ছে- বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও শরিয়তপুর।

ইলিশের ৬টি অভয়াশ্রমা হলো:

১. চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিলোমিটার এলাকা)
২. ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার এলাকা)
৩. ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত (তেতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা)
৪. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার সমগ্র আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকা
৫. শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার মধ্যে অবস্থিত পদ্মা নদীর ২০ কিলোমিটার এলাকা
৬. বরিশাল জেলার হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ ও বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর, গজারিয়া ও মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিলোমিটার এলাকা।

ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে নিষিদ্ধকালীন ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ও মাছ ধরা কাঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হচ্ছে।

ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র
(Hilsa breeding ground)

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব ইলিশ যেন নিরাপদে ডিম ছাড়তে পারে সে লক্ষ্যে প্রজননক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ৭০০০ বর্গ কিমি এলাকাসহ সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং বিনিময় নিষিদ্ধ করে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ইলিশ প্রজননক্ষেত্রের (৭০০০ বর্গ কিমি) পয়েন্টসমূহের সীমানা হলো:

ক. মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী হতে হাইতকান্দী পয়েন্ট (মিয়ানী পয়েন্ট);
খ. তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তজুমদ্দিন হতে পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট;
গ. কলাপাড়া উপজেলার লতা চাপালি পয়েন্ট;
ঘ. কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর কুতুবদিয়া হতে গণ্ডামারা পয়েন্ট;

জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম
(Jatka conservation program)

মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছর পৃথকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জাটকা রক্ষায় নভেম্বর-জুন পর্যন্ত ৮ মাস বিভিন্ন সংস্থা যেমন-জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় যৌথ অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত এবং বিশেষ কম্বিং অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের ২০ জেলার ৯১ উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা সম্প্রসারিত হয়ে ৩৬ জেলার ১৬৪ উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় জাটকা রক্ষা অভিযানে বিগত আট বছরে মোট ১১,৯৩০টি মোবাইল কোর্ট ও ৫৪,১৭৬টি অভিযান পরিচালনা করে মোট ২০১৯.৮০ মে.টন জাটকা জব্দ এবং ৫৬৬১.৯৪ লক্ষ মিটার জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৩৫৫.৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ৩৯১০ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।

মা ইলিশ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন
(Implementation of fish act to protect hilsa brood)

জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিগত ২০১১ সাল হতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২দিন বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় যৌথ অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মা ইলিশ রক্ষায় সংশোধিত বিধি বাস্তবায়নের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১১ সালে ইলিশ প্রজনন করে এমন নদী তীরবর্তী ৯ জেলার ৩৩ উপজেলায় যৌথ অভিযান বাস্তবায়ন করা হলেও বর্তমানে দেশের ৩৭ জেলার ১৭৩টি উপজেলায় মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মা ইলিশ রক্ষায় বিগত আট বছরে মোট ১২,৯০৮টি

চিত্র: জাটকা সংরক্ষণে বিশেষ অভিযান

মোবাইল কোর্ট ও ৬২,০১১টি অভিযান পরিচালনা করে ৫৫০.৫৯ মে.টন মা ইলিশ জব্দ এবং ২১৬৭.৪৭ লক্ষ মিটার জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৩০৪.২৯ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ১১৬০৯ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।

অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা
(Special combing operation against illegal nets)

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল যেমন কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, মশারি জালসহ অন্যান্য জাল নির্মূলে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে ১৫ দিন বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়ে থাকে। চলতি বছর উপকূলীয় ১১টি জেলায় ২১ জানুয়ারি হতে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। এ সম্মিলিত বিশেষ অভিযানে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, পুলিশ, নৌপুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরাসরি নিয়োজিত থেকেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪২৪টি মোবাইল কোর্ট ও ১,২৩৫টি অভিযান পরিচালনা করে ১,৮৮৩টি বেহুন্দী জাল, ৮৮.৯২ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল এবং ১,৭৪৯টি অন্যান্য জাল যেমন- বেড়জাল, চরঘড়া জাল, মশারি জাল, পাই জাল ইত্যাদি আটক করা হয়েছে এবং ৫.৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান (VGF program for hilsa fishery conservation)

বর্তমান সরকার জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে।

জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বিবরণ:

ক্র. নং	আর্থিক সাল	বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মে. টন)	পরিবারের সংখ্যা	পরিবার প্রতি মাসিক বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ
১	২০০৯-১০	১৯,৭৬৮.৬০	১,৬৪,৭৪০	৩০ কেজি
২	২০১০-১১	১৪,৪৭০.৬৪	১,৮৬,২৬৪	২০ কেজি
৩	২০১১-১২	২২,৩৫১.৬৮	১,৮৬,২৬৪	৩০ কেজি
৪	২০১২-১৩	২৪,৭৪৭.৪৮	২,০৬,২২৯	৩০ কেজি
৫	২০১৩-১৪	৩৫৮৫৬.৩২	২,২৪,১০২	৪০ কেজি
৬	২০১৪-১৫	৩৫৮৫৬.৩২	২,২৪,১০২	৪০ কেজি
৭	২০১৫-১৬	৩৭,৭৮৮.১৬	২,৩৬,১৭৬	৪০ কেজি
৮	২০১৬-১৭	৩৮,১৮৭.৬৮	২,৩৮,৬৭৩	৪০ কেজি
৯	২০১৭-১৮	৩৯,৭৮৭.৮৪	২,৪৮,৬৭৪	৪০ কেজি
১০	২০১৮-১৯	৩৯,৭৮৭.৮৪	২,৪৮,৬৭৪	৪০ কেজি

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪৮,৬৭৪টি জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি হারে প্রদানের জন্য মোট ৩৯,৭৮৮ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি সনে উপকূলীয় জেলা ছাড়াও জাটকার সম্প্রসারিত নদী তীরবর্তী ১৩টি জেলার ৫১ উপজেলায় মোট ৪৭,৪৮০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত

চিত্র: জাটকা আহরণে বিরত আইডি কার্ডধারী জেলেদের মাঝে ভিজিএফ বিতরণ।

১১ বছরে মোট ৩,০৮,৬০২.৫৬ মে.টন খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে অপরপক্ষে ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত এ সহায়তা প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল মোট ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় বিগত তিন বছর যাবৎ মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সময়ও জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪ জেলার ৭৬ উপজেলায় ভিজিএফ প্রদান করা হলেও চলতি সনে তা ২৯ জেলার ১২৭ উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এর আওতায় বিগত তিন বছরে সর্বমোট ৩,৯৫,৭০৯টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ২২,৭৩৭.৮৮ মে.টন চাল দেয়া হয়েছে।

মা ইলিশ রক্ষা অভিযানের সময় মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ:

ক্র. নং	অর্থবছর	বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মে.টন)	পরিবারের সংখ্যা	পরিবার প্রতি বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২০১৬-১৭	৭১৩৪.৪৬	৩,৫৬,৭২৩	২০ কেজি	১৪ জেলার ৭৬ উপজেলায় ভিজিএফ প্রদান করা হয়।
২	২০১৭-১৮	৭৬৮৯.২৪	৩,৮৪,৪৬২	২০ কেজি	২৫ জেলার ১১২ উপজেলায় ভিজিএফ প্রদান করা হয়।
৩	২০১৮-১৯	৭৯১৪.১৮	৩,৯৫,৭০৯	২০ কেজি	২৯ জেলার ১২৭ উপজেলায় ভিজিএফ প্রদান করা হয়।

বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ সহায়তা (Alternative livelihood for fishers)

ভিজিএফ চাল দেয়ার পাশাপাশি জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ৫২,৭৬০ জন জাটকা জেলেকে তাদের চাহিদানুযায়ী উপকরণ যেমন রিক্সা/ভ্যান, বৈধ জাল, খাঁচায় মাছচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপের সফলতা (Success of hilsa fishery management initiatives)

ইলিশ সম্পদের উন্নয়নে নানামুখী সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে উৎপাদন ছিল ২.৯৮ লক্ষ মে.টন সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ইলিশ এবং জাটকা রক্ষায় সম্মিলিত অভিযান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ইলিশ নিরাপদে ডিম ছাড়তে পেরেছে এবং জাটকাও বড় হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। তাই নিম্নমেঘনা হতে "জাটকা" আজ পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, সুরমায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে পদ্মা নদীর দুই পাড়ের জেলাসমূহে যেমন- ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং যমুনা নদীর তীরবর্তী জেলা সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুড়িগ্রাম-এ প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়েছে। ইলিশ আজ তাই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রয়েছে। জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার চলমান কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সারা বছর ইলিশের

প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। সম্প্রতি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ এর ভৌগোলিক নিবন্ধন প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে এবার নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ব বাজারে হাজির হবে বাংলাদেশের ইলিশ; মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিশ্বে উপস্থাপিত হবে ইলিশের দেশ হিসেবে। ফলে ইলিশকেন্দ্রিক বহু সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছে। ইলিশের প্রজননক্ষেত্র ও মাইগ্রেশন পথ নির্বিঘ্ন করতে এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ ও জীববৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিগত ২৬ জুন ২০১৯ খ্রি. নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩ হাজার ১ শত ৮৮ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (marine reserves) ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র ও মাইগ্রেশন পথ যেমন সুরক্ষিত হবে তেমনি অনেক বিপন্ন প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও শামুক-ঝিনুক, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর, স্থানীয় এবং পরিযায়ী পাখিদের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলও নিরাপদ থাকবে। এছাড়াও মেরিন রিজার্ভ ঘোষণার ফলে বিশ্বব্যাপী হুমকির মুখে থাকা মেরিন মেগাফোনা যেমন- ডলফিন, পরপয়েস, হাঙর, শাপলাপাতা মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপদের সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে।

ইলিশ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ
(Challenges for hilsa fishery management)

- কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জালের মতো ধ্বংসাত্মক অবৈধ জাল দিয়ে জাটকা ও মা ইলিশ নির্বিচারে আহরণ;
- অত্যধিক মাত্রায় জাটকা ও মা ইলিশ আহরণের ফলে রিক্রুটমেন্ট ওভারফিশিং এবং গ্রোথ ওভারফিশিং;
- আবাসস্থল ধ্বংস এবং পানি দূষণ;
- নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে মাইগ্রেশনে বাধা সৃষ্টি;
- ইলিশ ধরার জালের নির্দিষ্ট ফাঁসের আকার না থাকা; এবং
- ইলিশ আহরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও ইলিশ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ।

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ মাছের অনন্য অবদান এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে এর টেকসই উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। ইলিশের টেকসই উৎপাদন নির্ভর করে জলজ পরিবেশ, প্রজনন সফলতা, জাটকা রক্ষা তথা বাঁচার হার, বৃদ্ধির সুযোগ এবং মাছ আহরণের পরিমাণের ওপর। দেশের ইলিশ সম্পদ ধ্বংসের এবং উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান কারণটি হচ্ছে নির্বিচারে ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে জাটকা আহরণ। দেশে কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জাল দিয়ে বছরে যে পরিমাণ জাটকা ধরা হয় তার ১০ ভাগের ১ ভাগও যদি বড় হবার সুযোগ পায় তাহলে বার্ষিক ১ লাখ টনের অধিক ইলিশ মাছ উৎপাদিত হতে পারে। জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় ইলিশ ও জাটকা আহরণকারী জেলেদের জীবনমান বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ নিরূপণ এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া জাটকা রক্ষা ও ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের লক্ষ্যে "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক" একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে প্রণীত ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (Hilsa Fisheries Management Action Plan-HFMAP)-টি ইকোফিস প্রকল্পের আওতায় আপডেট করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবৈধ ইলিশ ও জাটকা আহরণকারীদের আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করা এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে দরিদ্র জেলেদের খাদ্যশস্য বিতরণ ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে দেশের জেলে, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি ভোক্তা জনগণ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী; তাই সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা অপরিহার্য।

---

[১]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: masudara_momi@yahoo.co.uk)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মাইকোটক্সিন বিষক্রিয়া ঃ একটি নীরব ঘাতক

Mycotoxin Poisoning : A Silent Killer

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

Abstract

By dint of the advancement of the modern food science, it is evident that some mycotoxins may be generated from the metabolites of some species of molds (fungus); these belong to mainly *Aspergillus* and *Penicillium* genus. The mycotoxins are in the fungal spores and are only released from the spores when they become solublized in water. Out of the known 500 or more mycotoxins few are carcinogenic and mutagenic in nature. Some raw commodities of cereal crops and grains such as wheat, maize, barley, oat, rye, etc; dried fruits such as peanuts, almonds, nuts, walnuts, dried figs; oleaginous seeds (sunflower, cotton, mustard, etc); fruit products and vegetables (grape, apple, pear, carrot, tomatoes, etc); licorice, coffee beans and spices such as chilly, pepper, gingers and cocoa beans; affected by molds are the sources of wide variety of mycotoxins. According to toxicologists and food scientists, the most common harmful mycotoxins are Aflatoxin-B1, B2, G1, G2, Ochratoxin-A, Trichothecenes, Fumonisins, Zearalenone and Ergot alkaloids. Some mycotoxins are also known as neprotoxin, neurotoxin. Aflatoxin-B1, B2, G1, G2 is identified as mutagenic and carcinogenic. The human organs most susceptible to the mycotoxin (aflatoxin) are liver and kidney. As mycotoxins are serious health concern of human and as the facts are known to us, the control measures at the primary stages are required to initiate to avoid such health risks and as preventive measures. Primary level control measures needs to be undertaken at production, harvest, processing and storage stages of susceptible commodities by regulating internal moisture content, temperature and humidity at storage. Simultaneously monitoring programs of mycotoxin contaminations in both raw commodities and ready-to-eat food products need to be undertaken as residue control program and the credible analytical capacities of different harmful mycotoxins should be taken as priority food safety concern for the nation through public initiative.

ছত্রাকের (mold/fungus) বিপাক প্রক্রিয়ায় (metabolism) উদ্ভূত এক প্রকার বিষাক্ত উপাদানের নাম মাইকোটক্সিন যা সাধারণত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য (food & feed), নদী বা স্থির জলাধারের পানি ও তলদেশ এমন কি প্রাকৃতিক বনরাজীতেও মাইকোটক্সিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাইকোটক্সিন এক প্রকার প্রাকৃতিক বিষ (toxins) বা দূষক (contaminants) যা সুতাকৃতির ছত্রাকের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রধানত দানাদার শস্য, স্নেহ ও শর্করা সমৃদ্ধ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মাছ ও প্রাণিখাদ্য বা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের কারণে এসপার্জিলাস (*Aspergillus*) ও পেনিসিলিয়াম (*Penicillium*) জাতীয় ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব ছত্রাকই উপযুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার মাইকোটক্সিন উৎপন্ন করে থাকে। তবে কোনো কোনো পেনিসিলিয়াম নির্গত মাইকোটক্সিন অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মাইকোটক্সিন বিভিন্নভাবে আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন ছত্রাক আক্রান্ত শস্য ও খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায় আর্থিক লোকসানের কারণ এবং মানুষ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টির কারণ এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ্ কেয়ার সেন্টারের মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি এর অধ্যাপক ডেভিড ট্রস (David Traus) এর মতে, ছত্রাক বাতাসে মাইকোটক্সিন ছড়ায় না; বরং পানি বা খাদ্য দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার ফলে ছত্রাক এর অভ্যন্তরস্থ মাইকোটক্সিন ওই পরিবেশে নিঃসৃত হয়। কিছু কিছু মাইকোটক্সিন মানুষের ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ এমন কি স্বল্পতর সময়ে অধিক পরিমাণে মাইকোটক্সিন গ্রহণের ফলে মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

সাধারণত দানাদার শস্য (grain/cereal) যার মধ্যে শর্করা ও চিনির ঘনত্ব বেশি থাকে সেখানে মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ছত্রাক জন্ম নিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ বা প্রাণী যদি ছত্রাক আক্রান্ত দানাদার শস্য বা এরূপ শস্যভূক প্রাণিজ উপাদান (মাংস, দুধ, মাছ ইত্যাদি) থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য গ্রহণ করে তবে ওই প্রাণী দেহে ছত্রাক বা ছত্রাক নিঃসৃত মাইকোটক্সিন দূষণে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বের প্রায় এক চতুর্থাংশ দানাদার শস্য ও ফল মাইকোটক্সিন আক্রান্ত। ১৯৬২ সনে লন্ডনে পিনাট মিল দ্বারা তৈরি খাদ্য খাওয়ানোর ফলে লক্ষাধিক টার্কির মৃত্যুর ঘটনা উদঘাটন করতে গিয়ে মাইকোটক্সিনের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত

অনুসন্ধানে এসপারজিলাস ফ্লাভাস *(Aspergillus flavus)* প্রজাতির ছত্রাকের বিপাক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত মাইকোটক্সিন (যা আফলাটক্সিন নামে খ্যাত) উক্ত মড়কের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মূলত এই ঘটনাই মাইকোটক্সিন বিষয়ক গবেষণার সূচনা ঘটায়। এসপারজিলাস ফ্লাভাস নামক মোল্ড প্রধানত আফলাটক্সিন (aflatoxin) উৎপন্ন করে। এই আফলাটক্সিন মানব দেহে ক্ষতি বিশেষ করে দৈহিক বৃদ্ধি স্থবিরতা, ডিএনএ মিউটেশনের কারণে যকৃৎ ক্যান্সার (liver cancer) এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) অবদমন করে থাকে। বিশ্বে প্রায় ৫ শতাধিক মাইকোটক্সিন সম্পর্কে জানা গেছে।

মাইকোটক্সিনের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রকারভেদ (Classification of mycotoxins)

আমাদের অজানা থাকলেও বাস্তবতা এটাই যে, মাইকোটক্সিন মানব জীবনের সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে যেখানে ক্ষতির পাল্লাই ভারি। বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে মাইকোটক্সিনের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। চিকিৎসকগণ (Physicians) মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নামানুযায়ী মাইকোটক্সিনের নামকরণ করেছেন, যেমন: যকৃতের ক্ষতিকারক মাইকোটক্সিনকে হেপাটোটক্সিন, বৃক্কের (কিডনি) ক্ষতিকারক মাইকোটক্সিনকে নেফরোটক্সিন, স্নায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট মাইকোটক্সিনকে নিউরোটক্সিন এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর প্রভাবক মাইকোটক্সিনকে ইমিউনোটক্সিন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কোষ জীববিদ্যাবিদগণ (cell biologists) টেরাটোজেন, মিউটাজেন, কারসিনোজেন ও এলার্জি উদ্দীপক (allergens) শ্রেণিতে মাইকোটক্সিনকে বিভক্ত করেছেন। আবার জৈবরসায়নবিদগণ ল্যাক্টোনস, কুমারিনস্ নামে এবং ছত্রাকবিদগণ (mycologist) এসপারজিলাস টক্সিন ও পেনিসিলিয়াম টক্সিন নামে মাইকোটক্সিনকে অভিহিত করেছেন।

খাদ্যে জ্ঞাত মাইকোটক্সিন, উপস্থিতি ও ক্ষতিকর প্রভাব (Known mycotoxins, presence and harmful effects)

বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার মোল্ডস সম্পর্কে জেনেছেন যাদের বিপাক প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর উপাদান সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ৫ শতাধিক মাইকোটক্সিন শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সারণি ১-এ বাংলাদেশের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যে উক্ত মাইকোটক্সিনগুলোর উৎস সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১: বাংলাদেশের প্রচলিত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সৃষ্ট মাইকোটক্সিনের তালিকা

পণ্যসমূহ (Commodities)	মাইকোটক্সিন (Mycotoxin)	মন্তব্য
দানাদার শস্য (গম, ভুট্টা, বার্লি, ওট, রাই, ইত্যাদি)	আফলাটক্সিন, ওকরাটক্সিন-এ, ফিউমোনিসিন, ডি-অক্সিনিভালেনল (Deoxynivalenol), T-2, HT-2 ও জিয়ারালেনন	বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত খাদ্যে সবসময় ছত্রাক বা মাইকোটক্সিন সৃষ্টি হবে না। কেবল অনুকূল পরিবেশ পেলেই বর্ণিত ছত্রাক (মোল্ড) এবং আরও সুনির্দিষ্ট অবস্থায় সংশ্লিষ্ট খাদ্যে মাইকোটক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে সীমিত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ নমুনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষায় আফলাটক্সিন ও ওকরাটক্সিনের উপস্থিতির নজির পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ অবস্থায় মাইকোটক্সিন উৎপন্ন করতে সক্ষম পরবর্তী অধ্যায়ে ২নং ছকে এমন ছত্রাক (মোল্ড) সৃষ্টির বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশের বিবরণ দেয়া হলো।
শুকনা ফল (কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম চিনাবাদাম, আখরোট, শুকনা ডুমুর, ইত্যাদি)	আফলাটক্সিন	
তৈলবীজ (সূর্যমুখী বীজ, তুলাবীজ, ইত্যাদি)	আফলাটক্সিন	
ফলজাত পণ্য ও সবজি (আঙ্গুর, আপেল, নাশপাতি, গাজর, টমেটো, ইত্যাদি)	ওকরাটক্সিন, পাটুলিন (patulin)	
যষ্ঠি মধু, কফি দানা (coffee beans), কোকা দানা (cocoa beans)	ওকরাটক্সিন	
মশলা (মরিচ, গোলমরিচ, সরিষা, আদা, ইত্যাদি)	আফলাটক্সিন, ওকরাটক্সিন	
পাস্তা, পাউরুটি, ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালস	আফলাটক্সিন, ওকরাটক্সিন-এ, ফিউমোনিসিন, ডি-অক্সিনিভানেলন (Deoxynivalenol), T2 HT2 ও জিয়ারালেনন	
চকোলেট, রোস্টেড কফি, তরল মাদক (ওয়াইন, বিয়ার), ফলের রস	ওকরাটক্সিন	
দুধ, পনির, দুগ্ধজাত পণ্য	আফলাটক্সিন এম-১	
মাংসজাত খাদ্য (ham, salami)	ওকরাটক্সিন	
মাচানে বা জাংলিতে শুকানো ফল	ওকরাটক্সিন	

Aspergillus flavus

Aspergi in maizllus flavus

Aspergi in maizllus flavus

Molds in cooked fish under ambient condition

Molds in cooked roasted ground nut under ambient condition

Molds in cooked fish under ambient condition

মাইকোটক্সিন সৃষ্টিকারী মোল্ড উৎপন্ন হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ (Favourable environment for occurrence of mycotoxin producing molds)

সাধারণত অবস্থা বিশেষে অনুকূল পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ছত্রাকের মাধ্যমে মাইকোটক্সিন সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট মাইকোটক্সিন বিশেষ পরিবেশে নির্দিষ্ট কিছু ফসলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার অঞ্চল বা ভৌগোলিক অবস্থাভেদে দায়ী ছত্রাকের মাধ্যমে ফসলে টক্সিন সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও বিস্তৃতির তারতম্য হয়ে থাকে। কোনো ফসল বা দ্রব্যে ছত্রাকের উপস্থিতি দৃশ্যমান না হলেও মাইকোটক্সিনের উপস্থিতি থাকতে পারে। ছত্রাক পরিষ্কার করে ফেললেও ছত্রাকের পোষকের অঙ্গে টক্সিন থেকে যায়। ছত্রাক সৃষ্ট টক্সিন এতটাই স্থিতিশীল যে অধিক তাপমাত্রায় প্রক্রিয়া করার পরেও টক্সিন নির্মূল হয় না। উত্তম উৎপাদন ব্যবস্থা অনুসরণ ব্যতিরেকে মাইকোটক্সিন দূষণযুক্ত কাঁচামাল বা উপাদান দিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন মোটেও সম্ভব নয়।

মাইকোটক্সিন সৃষ্টিকারী ছত্রাকের উৎপন্ন হওয়ার অনুকূল পরিবেশ-

- আপেক্ষিক আর্দ্রতা- ৭০% বা ততোধিক;
- তাপমাত্রা ৩০^0 সে. বা ততোধিক তাপমাত্রা কয়েক দিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বজায় থাকা;
- শস্য দানার অভ্যন্তরে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা (২০% বা ততোধিক);
- ছত্রাক আক্রান্ত ফসলে পীড়ন (খরা, বন্যা বা কীটপতঙ্গ সংক্রমণ); এবং
- সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ত্রুটি হলে সাধারণত এসপারজিলাস ও পেনিসেলিয়াম ছত্রাক জন্মায়; যারা সর্বাধিক ক্ষতিকারক আফলাটক্সিন ও ওকরাটক্সিন উৎপন্ন করার জন্য দায়ী।

মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ১ নং ছকে বর্ণিত দানাদার শস্যের উৎপাদন, আহরণ, শুষ্ককরণ ও গুদামজাত পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য সঠিক তাপমাত্রা ও পরিবেশে সংরক্ষণ না করা হলে ছত্রাক আক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী (Wilson, 1992) এবং এসব ছত্রাকের বীজগুটি (spore) মাসের পর মাস এমনকি বছর অবধি সুপ্তাবস্থায় থেকে পুনরাবির্ভাবের সুযোগের অপেক্ষা করতে পারে। সারণি ২-এ ক্ষতিকর কিছু মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ছত্রাকের বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ২: ক্ষতিকর কিছু মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ছত্রাকের বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশের বিবরণ

ছত্রাক (mold)	মাইকোটক্সিন	ওয়াটার একটিভিটি (wa)	আর্দ্রতা (%)	মন্তব্য
Aspergillus flavus & Aspergillus parasiticus	Aflatoxins	০.৭৮-০.৮০	১৫.৫-১৭	ওয়াটার একটিভিটি (wa) 0.65 corresponds generally to moisture content less 15%. (Oldenbugh, 1991 & Dr. Jaya Olaniran, 2010.)
Aspergillus ochraceus	Ochratoxins	০.৮১-০.৮৩	১৪.৫-১৭	
Penicillium verrucosum	Aflatoxins	০.৭৮-০.৮০	১৫.৫-১৭	
Penicillium verrucosum	Ochratoxins	০.৭৬-০.৮০	১৭-২০	
Fusareum graminearum Fusareum culmorum	Trichothecenes Zearalenone	০.৮৯-০.৯৩	২০-২৪	
Fusareum moniliforme Fusareum proliferatum	Fumonisins	০.৮৭	২০-২২	

সারণি ৩-এ ক্ষতিকর কিছু মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ছত্রাকের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের পরিবেশের তুলনামূলক অবস্থার বিবরণ দেয়া হলো:

আবশ্যক। মনে রাখতে হবে যে, মাইকোটক্সিন এতটাই স্থিতিশীল যে অধিক তাপমাত্রায় প্রক্রিয়া করার পরেও টক্সিন নির্মূল হয় না।

সারণি ৩: ক্ষতিকর কিছু মাইকোটক্সিন উৎপন্নকারী ছত্রাকের বেড়ে ওঠার অনুকূল ও নিয়ন্ত্রণের পরিবেশের তুলনামূলক অবস্থা

পরিবেশের উপযুক্ততা	তাপমাত্রা (^{0} সে)	ওয়াটার একটিভিটি	অক্সিজেন (%)	পিএইচ	কার্বন-ডাই-অক্সাইড (%)	আর্দ্রতা (%)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)
নিয়ন্ত্রিত	-৩	০.৬৫	০.১৪	২.০	-	< ১৪	< ৬০
অনুকূল	২০-৩৫	০.৮৫-০.৯৫	> ২.০	৪.৫-৬.৫	< ১০	২২-২৩	> ৭০
সর্বোচ্চ অনুকূল	৬০	০.৯৯	-	৮.০	> ১৫	৩০	-

আফলাটক্সিনের বিষক্রিয়ার ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগের লক্ষণসমূহ (Symptoms of Aflatoxin exposure in human)

খাদ্য দূষক হিসেবে মানুষ ও জীবের জন্য সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ মাইকোটক্সিনগুলো হচ্ছে আফলাটক্সিন (aflatoxin-B1, B2, G1, G2), ওকরাটক্সিন-এ, ট্রাইকোথেসেনেস্, ফিউমোনিসিনস্, জয়ারালেনন ও এরগট এলকালয়েড। তন্মধ্যে আফলাটক্সিন (aflatoxin-B1, B2, G1, G2), ওকরাটক্সিন-এ বাংলাদেশের কিছু পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিতির নজির আছে। মাইকোটক্সিন বিশেষ করে আফলাটক্সিন দূষণের কারণে যকৃৎ বিকল, যকৃৎ শুকিয়ে যাওয়া (liver necrosis), যকৃৎ ক্যান্সার (liver cirrhosis), জ্বর, ক্রমাবনতিশীল জন্ডিস (progressive jaundice), লসিকা গ্রন্থির ফুলে যাওয়া (limb swelling), প্রদাহ, বমন (vomiting), যকৃৎ প্রলম্বন (enlarged liver) ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। খাদ্যে মাইকোটক্সিনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো মনিটরিং ও পাশাপাশি যথাযথ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাগার

মাইকোটক্সিন ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অবস্থান (Measures taken for identification and control of risks of mycotoxin contamination in Bangladesh)

খাদ্যে মাইকোটক্সিনের উৎস এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশে ব্যাপক জনসচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তার তুলনায় খুবই অপ্রতুল বা ক্ষেত্র বিশেষে অনুপস্থিত। আশার কথা এই যে, মৎস্য অধিদপ্তর নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাছে ও মৎস্য খাদ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর মাইকোটক্সিনগুলোর মধ্যে আফলাটক্সিন (aflatoxin-B1, B2, G1, G2) দূষণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ থেকে মৎস্য রপ্তানির সুবাদে ইউরোপ, আমেরিকাসহ আমদানিকারক দেশসমূহের চাহিদার আলোকে পর্যবেক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (NRCP) এর আওতায় সারাদেশ থেকে ঝুঁকি বিবেচনায় মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যখাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। নমুনা বিশ্লেষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সাভারস্থ মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে আফলাটক্সিনের বি বা জি গ্রুপ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিত পরিমাণ (aflatoxin-B1, B2, G1, G2) বিশ্লেষণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফুড সেফটি ল্যাবরেটরিতে এবং বিসিএসআইআর - ল্যাবরেটরিতে আফলাটক্সিন পরীক্ষার ব্যবস্থা

আছে। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর খামার থেকে দূষণের উদ্ভব নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (GAP) প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। মৎস্য অধিদপ্তর এরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নসহ দক্ষ জনবল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

মাইকোটক্সিন দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনি পরিকাঠামো (Legal frameworks to control micotoxins contaminations)

বিশ্বব্যাপী খাদ্য বিজ্ঞানী ও সচেতন ভোক্তার আফলাটক্সিনের ঝুঁকি উদ্ভূত উদ্বিগ্নতার জন্য খাদ্যদ্রব্যে আফলাটক্সিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসি রেগুলেশন ১১৮৮১/২০০৬ অনুযায়ী দানাদার শস্যে (সিরিয়াল ফুড) আফলাটক্সিন জি১ জি২ প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাত্রা ২ পিপিবি (মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি) এবং আফলাটক্সিন-বি১ বি২ জি১ জি২, সম্মিলিতভাবে ৪ পিপিবি সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল ৭(ক) ক্রমিক-৮ এ ইসি রেগুলেশনের অনুকরণে আফলাটক্সিন-বি১ বি২ জি১ জি২ সর্বোচ্চ মাত্রা এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর অধীন প্রণীত দূষণ, টক্সিন, ক্ষতিকর অবশেষ রেগুলেশন - ২০১৭ এর তফসিল-৬ এ বিভিন্ন প্রকার উপাদানে (সিরিয়াল) আফলাটক্সিনসহ অন্যান্য টক্সিনের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিভাবে মাইকোটক্সিন ঝুঁকি প্রশমন করা যায় (How to reduce risks of mycotoxin contamination)

মানব ও প্রাণিখাদ্য তৈরির কাঁচামাল হিসেবে দানাদার শস্য ও তেলবীজ ব্যবহার করা হয় এবং এদের উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণের যেকোনো পর্যায়ে এসপারজিলাস ছত্রাক জন্ম নিয়ে টক্সিন উৎপন্ন করতে পারে বিধায় মাইকোটক্সিন তথা আফলাটক্সিন দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. **চাষ পর্যায়ে প্রযোজ্য ব্যবস্থা** (Measures applicable during farming of crops): অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি চাষ পর্যায়ে ফসলে মোল্ড জন্মাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তাই অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন চক্রে প্রভাব দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সেচসহ জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে জমির জল নিষ্কাশনে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. **আহরণ ও প্রাকসংরক্ষণ পর্যায়ে প্রযোজ্য ব্যবস্থা** (Measures applicable during harvesting and preprocessing stages of crops): সম্পূর্ণ পরিপক্ব ফসল আহরণ জরুরি এবং ফসল মাড়াই এর পর দ্রুততম সময়ে শুকিয়ে বস্তাবন্দী করতে হবে। সংরক্ষণের পূর্বে যথাযথভাবে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৪ শতাংশ বা তার নিচে আনতে হবে।

৩. **গুদামজাতকরণ পর্যায়ে প্রযোজ্য ব্যবস্থা** (Measures applicable during storage of crops): সঠিকভাবে শুকিয়ে বস্তাবন্দীপূর্বক গুদামজাত করতে হবে। গুদামে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপযুক্ত ২ নং ছকের অনুরূপ অবস্থা বহাল রাখাসহ গুদামে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবাহের জন্য ভেন্টিলেশন এবং বস্তা রাখার জন্য কাঠের পাটাতন ব্যবহার শ্রেয়।

৪. **উৎপাদনকারীর জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা** (Measures applicable food manufacturer): গুণ ও মানোত্তীর্ণ ফসল হতে কাঁচামাল ও ফিসমিল সংগ্রহ করে উত্তম উৎপাদন অনুশীলন (GMP) অনুসরণ করে মৎস্যখাদ্য, প্রাণিখাদ্য এবং মানুষের খাদ্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। মৎস্যখাদ্য ও প্রাণীখাদ্যের জলীয় অংশ অবশ্যই ১৪ শতাংশের নিম্নে ও আর্দ্রতা ৬০ শতাংশের মধ্যে বজায় রাখতে হবে।

৫. **তৈরি খাদ্য সংরক্ষণে প্রযোজ্য ব্যবস্থা** (Measures applicable for preservation of ready-to-eat food): ১নং সারণিতে বর্ণিত তৈরি খাদ্য সাধারণ তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টার অধিক উন্মুক্ত রাখা যাবে না। এ ধরনের খাদ্য প্রস্তুতির ২ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া না হলে দ্রুততম সময়ে ৪° সেন্টিগ্রেডের নিম্ন তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে রাখা আবশ্যক।

৬. **অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়** (Other considering matters): এছাড়া খাদ্যদ্রব্যের প্যাকিং ভালো মানের হতে হবে। দীর্ঘদিন বস্তাবন্দী মৎস্যখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য গুদামজাত না রাখাই শ্রেয়। সংরক্ষণাগারে পোকা-মাকড়, ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

উপসংহার (Conclusion)

সভ্যতা সৃষ্টির আদি থেকেই খাদ্যের মাইকোটক্সিন বিষক্রিয়া শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণে বহু মানুষ ও প্রাণীর জীবন হরণ করেছে। কাজেই ভুক্তভোগীদের অবহিত করাসহ মাইকোটক্সিন দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্য উৎপাদনের সংবেদনশীল পর্যায়গুলোতে যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, টক্সিনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ঝুঁকির ভিত্তিতে ফসল ও খাদ্যের নমুনায়ন ও পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি নকশা (risk mapping) প্রণয়ন করা এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য নীরব ঘাতকরূপী মাইকোটক্সিন সম্পর্কে অভিধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যথাযথভাবে শনাক্ত করে তাদের দিক নির্দেশনায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার অভিযাত্রাকে বেগবান ও কার্যকরি করার পদক্ষেপ সরকারি উদ্যোগেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল : rbnittya@gmail.com)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে মনোসেক্স (স্ত্রী) থাই সরপুঁটি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

Technique for Production Performance Enhancement of Silver Barb Through Genetic Engineering

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[১] ও মোহাম্মদ রফিকুর রহমান[২]

Abstract

Silver barb (*Barbonymus gonionotus*) is an important aquaculture species and contributes significantly to the total fish production. However, the quality of seeds has been deteriorated due to inbreeding, hybridization and improper bloodstock management that results in slow growth, high mortality, and disease susceptibility of fry. Females of silver barb have higher growth rate (20-30% or more) over the males, so production of gynogens (all-female) would definitely increase the total fish production. It is, therefore, necessary to improve the quality of seeds through chromosome manipulation, i.e. gynogenesis. In this research, gynogensis produced nearly 100% female while the female sex of the control fish was 51.56%. Sex-reversed gynogenetic males (XX) were produced using masculinizing hormone and these males are much valuable as they produce monosex all-female population upon crossing with normal females (XX). The production of monosex population was the main target of the study as it would accelerate the total fish production of the country.

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের মানুষের প্রধান প্রাণিজ খাবারের উৎস হচ্ছে মাছ। আমাদের দেশের প্রায় ১.৯০ কোটি মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মাছ চাষের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে হারে মানুষ বাড়ছে সে হারে সম্পদ বাড়ছে না। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি আবশ্যক। আবার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভালো মানের পোনা। কিন্তু বেশির ভাগ হ্যাচারিতে গুণগতমানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন না হওয়ায় মাছ চাষিরা তাদের প্রত্যাশিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তারা দিন দিন মাছ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সুতরাং গুণগতমানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তথা ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশন কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশন কৌশল (Chromosome manipulation technique)

ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিদ্যমান জেনেটিক উৎসকে ব্যবহার করে মাছের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা যায়। এক্ষেত্রে ক্রোমোজোম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় একই মাছের একসেট ক্রোমোজোমকে অন্য একসেট ক্রোমোজোম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণরূপে মাতৃবৈশিষ্ট্য ধারণকারী গাইনোজেন অথবা সম্পূর্ণরূপে পিতৃবৈশিষ্ট্য ধারণকারী এন্ড্রোজেন উৎপন্ন হয়। গাইনোজেনেসিস হলো গাইনোজেন উৎপাদনের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে নিষ্ক্রিয় শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত করা হয় এবং ভ্রূণ পরিস্ফুটনে পুরুষ জেনোমের কোনো অবদান থাকে না। এটি মনোসেক্স স্ত্রী (monosex all-female) মাছ উৎপাদনের একটি কার্যকরি পদ্ধতিও বটে যেখানে স্ত্রী মাছ অভিন্ন ক্রোমোজোম (XX) ধারণ করে। থাই সরপুঁটির স্ত্রী মাছ অভিন্ন ক্রোমোজোম (XX) ধারণ করে এবং পুরুষ মাছের চেয়ে এদের দৈহিক বর্ধন ২০-৩০% এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং থাই সরপুঁটির মনোসেক্স স্ত্রী মাছ চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাছের মোট উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সরপুঁটি দ্রুত বর্ধনশীল, কম সময়ে (৪-৫ মাসে) বাজারজাতকরণের উপযোগী হয় এবং অল্প পানিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। অধিকন্তু মনোসেক্স স্ত্রী মাছগুলো সম আকৃতির হয়, ফলে মাছ চাষিরা অল্প সময়ে আহরণ করতে পারবে এবং ভালো দামে বিক্রিও করতে পারবে। মিয়োটিক (meiotic) এবং মাইটোটিক (mitotic) গাইনোজেনেটিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মাছ গবেষণার কাজেও ব্যবহৃত হয়। মিয়োটিক গাইনোজেনেসিস অন্তঃপ্রজনন হার নির্ণয়, লিঙ্গ নিরূপণ কৌশল এবং জীন ম্যাপিং কাজে ব্যবহৃত হয়। মাইটোটিক গাইনোজেনেসিস প্রথম বংশানুতে (F_1 generation) সম্পূর্ণভাবে হোমোজাইগাস (homozygous) মাছ উৎপাদন করে এবং দ্বিতীয় বংশানুতে (F_2 generation) ক্লোনাল লাইন (clonal line) তৈরি করে; যা পরবর্তীতে উচ্চ উৎপাদনশীল (high yielding) এবং নতুন ব্রিডিং লাইন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, গাইনোজেনেসিস এমন একটি পরিবেশবান্ধব প্রজনন প্রক্রিয়া যেখানে কোনো ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। এই প্রক্রিয়ায় একই মাছের মধ্যে

শুধু ক্রোমোজোম সংখ্যার এবং ধরনের পরিবর্তন করা হয় বিধায় পরিবেশের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে না এবং উৎপাদিত মাছ মানুষের খাওয়ার জন্যও নিরাপদ।

ক. মিয়োটিক ও মাইটোটিক গাইনোজেনেসিসের সূচনা (Induction of meiotic and mitotic gynogenesis):

পুরুষ মাছ থেকে সংগৃহীত শুক্রাণুকে ১৯৬ μWcm^{-2} হারে অতি বেগুনি রশ্মি (UV- light) দ্বারা ১ মিনিট রেডিয়েশন দেয়া হয়। ফলে শুক্রাণুর ডিএনএ ভেঙ্গে

চিত্র ১: শুক্রাণুকে অতি বেগুনি রশ্মি দ্বারা রেডিয়েশন দেওয়া হচ্ছে

যায় কিন্তু ডিম নিষিক্তকরণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। মিয়োটিক গাইনোজেনেসিসের জন্য সংগৃহীত ডিমকে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে নিষ্ক্রিয় শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করার ১.৫ মিনিট পর ২°সে তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ঠাণ্ডা শক ট্রিটমেন্ট (cold shock treatment) এবং ৪০° সে তাপমাত্রায় ১ মিনিট গরম শক ট্রিটমেন্ট (heat shock treatment) দেয়া হয়।

চিত্র ২: নিষিক্ত ডিমকে ঠান্ডা শক (Cold shock) ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে

অপরদিকে মাইটোটিক গাইনোজেনিসিসের জন্য সংগৃহীত ডিমকে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে নিষ্ক্রিয় শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্তকরণের ২৭.৫ মিনিট পর ২° সে তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ঠাণ্ডা শক ট্রিটমেন্ট এবং ৪০° সে তাপমাত্রায় ১ মিনিট গরম শক ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় (চিত্র ২ এবং ৩)। অতঃপর শক ট্রিটমেন্ট দেয়া ডিমকে হ্যাচিং এর জন্য ইনকিউবেটরে দেয়া হয়। হ্যাচিং শেষ হওয়ার পর

চিত্র ৩: নিষিক্ত ডিমকে গরম শক (Heat shock) ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে

ইনকিউবেটর থেকে রেণু সংগ্রহ করে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা হয়। গাইনোজেনেসিসের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য কিছু হ্যাপ্লয়েড রেণু তৈরি করা হয় যেখানে ডিমকে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে নিষ্ক্রিয় শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করার পরপরই হ্যাচিং এর জন্য ইনকিউবেটরে দেওয়া হয় এবং কোনো রকম শক ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় না। এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন রেণু হ্যাচিং শেষ হওয়ার ২-৩ দিনের মধ্যেই মারা যায়। অনেক সময় হ্যাচিং সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ডিমের মধ্যেই ভ্রূণ মারা যায়। এসব রেণু অর্ধেক সংখ্যক (N) ক্রোমোজোম বহন করে।

খ. সেক্স-রিভার্সড বা নিও-পুরুষ (XX) মাছ উৎপাদন (Production of sex-reversed male or Neo-male):

সেক্স-রিভার্সড (Sex-reversed) পুরুষ (XX) মাছ উৎপাদনের জন্য অ্যাকোয়ারিয়ামে মিয়োটিক ও মাইটোটিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত রেণুকে ২৮ দিন পর্যন্ত ১৭-আলফা মিথাইল টেস্টোস্টেরন হরমোন মিশ্রিত খাবার খাওয়ানো হয়। এভাবে উৎপাদিত পুরুষ মাছ কৌলিতাত্ত্বিকভাবে স্ত্রী কিন্তু বাহ্যিকভাবে পুরুষ হয় যা শুধুমাত্র শুক্রাণু তৈরি করে এবং অভিন্ন ক্রোমোজোম (XX) বহন করে। নিও-পুরুষগুলো (neo-male) অতীব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মাছ সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX) এর সাথে ব্রিডিং করে অধিক মাত্রায় স্ত্রী মাছ উৎপাদন করে। অপরদিকে মাছের লিঙ্গ নিরূপণের জন্য ২৮ দিন পর্যন্ত অ্যাকোয়ারিয়ামে লালন-পালনের পর পোনাগুলো পুকুরে মজুদ করা হয় এবং হরমোনবিহীন সুষম খাবার খাওয়ানো হয়। পুকুরে দুই থেকে আড়াই মাস প্রতিপালনের পর গাইনোজেনেটিক স্ত্রী এবং সেক্স-রিভার্সড পুরুষ উভয় প্রকার মাছের লিঙ্গ নিরূপণ করা হয় (সারণি: ১-৪)। মনোসেক্স স্ত্রী মাছ উৎপাদন

করে। অপরদিকে, মাছের লিঙ্গ নিরূপণের জন্য ২৮ দিন পর্যন্ত অ্যাকোয়ারিয়ামে লালন-পালনের পর পোনাগুলো পুকুরে মজুদ করা হয় এবং হরমোনবিহীন সুষম খাবার খাওয়ানো হয়। পুকুরে দুই থেকে আড়াই মাস প্রতিপালনের পর গাইনোজেনেটিক স্ত্রী এবং সেক্স-রিভার্সড পুরুষ উভয় প্রকার মাছের লিঙ্গ নিরূপণ করা হয় (সারণি: ১-৪)।

সারণি ১: হরমোনবিহীন খাবার প্রয়োগে লালিত মিয়ো-গাইনোজেনেটিক বংশধরদের লিঙ্গ নিরূপণ ফলাফল

পুরুষ মাছ (XY)	স্ত্রী মাছ (XX)	ব্যবহৃত আঙ্গুলি পোনার সংখ্যা	পুরুষ:স্ত্রী (♂:♀)	% স্ত্রী	ক্রোমোজোম
♂	♀	৫৯	১:৫৮	৯৮.৩১%	XX
♂	♀	৫৩	০:৫৩	১০০.০০%	XX
♂	♀	৫৮	১:৫৭	৯৮.২৮%	XX
♂	♀	৬২	১:৬১	৯৮.৩৯%	XX
♂	♀	৫৬	০:৫৬	১০০.০০%	XX

সারণি ২: হরমোন খাবার প্রয়োগে লালিত মিয়ো-গাইনোজেনেটিক বংশধরদের লিঙ্গ নিরূপণ ফলাফল

পুরুষ মাছ (XY)	স্ত্রী মাছ (XX)	ব্যবহৃত আঙ্গুলি পোনার সংখ্যা	পুরুষ:স্ত্রী (♂:♀)	% পুরুষ	ক্রোমোজোম
♂	♀	৫৫	৫০:৫	৯০.৯০%	XX
♂	♀	৬১	৫৭:৪	৯৩.৪৪%	XX
♂	♀	৫৭	৫৪:৩	৯৪.৭৪%	XX
♂	♀	৫৪	৪৬:৮	৮৫.১৯%	XX
♂	♀	৫৪	৫০:৪	৯২.৫৯%	XX

সারণি ৩: হরমোন খাবার প্রয়োগে লালিত মাইটো-গাইনোজেনেটিক বংশধরদের লিঙ্গ নিরূপণ ফলাফল

পুরুষ মাছ (XY)	স্ত্রী মাছ (XX)	ব্যবহৃত অঙ্গুলি পোনার সংখ্যা	পুরুষ:স্ত্রী (♂:♀)	% পুরুষ	ক্রোমোজোম
♂	♀	৩৩	২৭:৬	৮১.৮২%	XX
♂	♀	৩২	২৬:৬	৮১.২৫%	XX
♂	♀	৩৫	২৭:৮	৭৭.১৪%	XX
♂	♀	২৭	২২:৫	৮১.৪৮%	XX
♂	♀	৩৬	২৮:৮	৭৭.৭৮%	XX

উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত নিও-পুরুষের (XX) সাথে যখন সাধারণ স্ত্রী মাছের প্রজনন করা হয় তখন উৎপাদিত সকল বংশধর স্ত্রী মাছ হয় যা লিঙ্গ নিরূপণের মাধ্যমে জানা যায়।

সারণি ৪: থাই সরপুঁটির নিও-পুরুষের (XX) সাথে সাধারণ স্ত্রী মাছের (XX) প্রজনন করার ফলে উৎপাদিত বংশধরদের লিঙ্গ নিরূপণ ফলাফল

পুরুষ মাছ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	ব্যবহৃত আঙ্গুলী পোনার সংখ্যা	পুরুষ মাছ	স্ত্রী মাছ
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	২৭	০% (০)	১০০% (২৭)
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	১৮	০% (০)	১০০% (১৮)
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	৩৫	২.৮৬% (১)	৯৭.১৪% (৩৪)
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	৩১	৩.২৩% (১)	৯৬.৭৭% (৩০)
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	২৯	০% (০)	১০০% (২৯)
নিও-পুরুষ (XX)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	১৭	০% (০)	১০০% (১৭)
সাধারণ পুরুষ মাছ (XY)	সাধারণ স্ত্রী মাছ (XX)	৪১	৪৮.৭৮% (২০)	৫১.২২% (২১)

গাইনোজেনেসিসের ফলে উৎপাদিত থাই সরপুঁটির মনোসেক্স স্ত্রী মাছ (monosex all-female) এবং পুরুষ–স্ত্রী মিশ্রিত (mixed sex) মাছ আলাদাভাবে চাষ করলে মনোসেক্স স্ত্রী মাছের উৎপাদন পুরুষ–স্ত্রী মিশ্রিত মাছের উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হয়, যা নিম্নের সারণি থেকে সহজেই বুঝা যায়:

সারণি ৫: মনোসেক্স স্ত্রী মাছ এবং পুরুষ–স্ত্রী মিশ্রিত থাই সরপুঁটির আলাদাভাবে চাষে মাছের বৃদ্ধির তুলনা

মাছের ধরন	প্রাথমিক মজুদ আকার (গ্রাম)	চূড়ান্ত ওজন (গ্রাম)	জীবিত থাকার হার (%)	খাবার গ্রহণের হার (%)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
পুরুষ-স্ত্রী মিশ্রিত সরপুঁটি	১.৯৩	১৮৮.৬৯	৮৮.৭৫	১.৩৪	৩২৭৫.৮২
মনোসেক্স স্ত্রী (all-female) মাছ	১.৯৫	২২৮.১৭	৮৯.৭৫	১.১৭	৪০২১.৭৪

উপর্যুক্ত গবেষণায় প্রতি শতাংশে ১২০টি মাছ মজুদ করা হয় এবং গবেষণা শেষে মনোসেক্স স্ত্রী সরপুঁটির উৎপাদন পুরুষ-স্ত্রী মিশ্রিত মাছের উৎপাদনের চেয়ে ২২.৭৭% বেশি পাওয়া যায়।

উপসংহার (Conclusion)

থাই সরপুঁটি সকল শ্রেণির মানুষের কাছে একটি প্রিয় মাছ হিসেবে পরিচিত এবং বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে। বিশেষ করে মাছের ডিম শিশুদের কাছে একটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। আবার স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের তুলনায় কমপক্ষে ২০-৩০% বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মনোসেক্স স্ত্রী মাছের চাষ, পুরুষ–স্ত্রী মাছের মিশ্র চাষের চেয়ে অধিক লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়। তাই গাইনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে যদি বাণিজ্যিকভাবে গাইনোজেনেটিক মাছ উৎপাদন করা যায় এবং কৃষক পর্যায়ে এই গাইনোজেনেটিক মাছের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা যায় তবে মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণেও থাই সরপুঁটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

[১]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (ই-মেইল: rafiqulsarder@yahoo.com)
[২]প্রফেসর, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ইলিশ মাছের মজুদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি এবং সহনশীল ইলিশ আহরণে গবেষণার ফলাফল

Hilsa Stock Conservation, Growth and Research Outcome of Sustainable Harvest

মোঃ আনিছুর রহমান[১], মোঃ মেহেদী হাসান প্রামানিক[২] ও মোঃ মনজুরুল হাসান[৩]

Abstract

In this study gill-net selectivity for *Tenualosa ilisha* in the River Meghna was estimated. Traditional fishing was conducted by using gill-net with 5.5 cm, 6.5 cm and 7.5 cm mesh-size during August 2016 to October 2016. From the Meghna River estuary, a total of 660 specimens of *T. ilisha* were caught by gill-net during the study period. Mean total length were calculated as 24.7 ± 2.7 cm, 31.2 ± 2.78 cm and 34.33 ± 4.69 cm for 5.5 cm, 6.5 cm and 7.5 cm mesh sizes gill-net respectively. Selectivity analysis indicated an optimum catch length of 26.05 cm for the 5.5 cm mesh size, 32.83 cm for the 6.5 cm mesh size and 37.09 cm for the 7.5 cm mesh size gill-nets. The catch percentage of Hilsa by 5.5 cm, 6.5 cm and 7.5 cm mesh size gill-net were 38.78%, 39.10% and 22.12% respectively. The majority of fishes caught by these three-mesh size gill-net were found to be matured. Therefore, 6.5 cm mesh size was suitable for the sustainable fisheries of *T. ilisha* in the River Meghna in Bangladesh.

ইলিশ বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একক প্রজাতির মাছ। বাংলাদেশসহ ভারতের জনগণের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয় মৎস্য খাবার। এশিয়া মহাদেশের পার্সিয়ান উপসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত এই মাছের চলাচল। এটি বাংলাদেশের জাতীয় মাছ যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ এবং জিডিপিতে (GDP) শতকরা প্রায় ১ ভাগ অবদান রাখছে। সম্প্রতি জিআই (GI) স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ। বিশ্বে মোট ইলিশ আহরণের প্রায় ৭৫% বাংলাদেশ, ১৫% মায়ানমার ও ভারত এবং ৫% অন্যান্য দেশসমূহ (থাইল্যান্ড, ইরান, ইরাক, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তান) থেকে পাওয়া যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেকাংশে স্থান ভিন্নতায় অভিপ্রয়াণ ও প্রজননের সময়কালে জাটকা ও ব্রুড ইলিশ নির্বিচারে ধরা হচ্ছে। ইলিশ সম্পদের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার জন্য অনেকগুলো কারণ দায়ী করা হয়; যেমন ১. নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় প্রজনন এলাকায় মাছের প্রবেশন বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়া; ২. ইলিশের জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে অতি আহরণের চাপ; ৩. নদীর পানির দূষণের ফলে জলাশয়ের ভৌত রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তন; ৪. মাছের আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন; ৫. কোনো নিয়মনীতি না মেনে অবাধে মাছ শিকার; এবং ৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইলিশ মাছের চাহিদা বৃদ্ধি।

ফলাফলস্বরূপ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য 'হিলসা ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান' (HFMAP) এর প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যা ২০০৪ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইলিশ মাছের উৎপাদনের ধারাবাহিক হ্রাসের মাত্রা থামিয়ে দেয়। সাম্প্রতিককালে ইলিশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিত্য ব্যবহার্য খাবারে মাছের প্রোটিন চাহিদা ও দ্রুত সময়ে অধিক অর্থ উপার্জন প্রবণতাই মুলত ফাঁস জালে নির্বিচারে অধিকহারে ইলিশ ধরার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। অপরিকল্পিত ও অবাধভাবে ইলিশ মাছ ধরার কারণে বড় আকারের ইলিশ মাছের বদলে ছোট আকারের ইলিশের পরিমাণ বাড়ছে যার ফলে ইলিশের মোট মজুদের কাঠামো ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারে। অতএব ফাঁস জালের ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত সর্বোত্তম Mesh (ফাঁস) সাইজ নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে নির্ধারিত Mesh (ফাঁস) সাইজের ব্যবহার কার্যকর করার মাধ্যমেই নির্বিচারে অবাধভাবে জাটকা ও ব্রুড ইলিশ ধরা বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে যা বাংলাদেশের ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। সহনশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য জালের ফাঁস নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্দিষ্ট প্রজাতির সর্বোচ্চ উৎপাদনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ, আহরণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য নির্ধারিত জালের নির্দিষ্ট Mesh (ফাঁস) সাইজ খুবই প্রয়োজনীয়। সর্বোপরি ফাঁস জালের Mesh (ফাঁস) নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কৌশল যা ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষণা পরিচালনার স্থান, সময়কাল ও নমুনায়ন (Research area, study period and sampling)

EcoFish[BD] এর অর্থায়নে গবেষণা কাজটি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুরের ইলিশ গবেষণা দল কর্তৃক ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্র বিশেষত- ১. হাতিয়া (উপকূলীয় মোহনা এলাকা, নোয়াখালি); ২. রামগতি (মেঘনা নদীর মোহনা এলাকা, লক্ষ্মীপুর); ৩. মনপুরা (মেঘনা নদীর উপকূলীয় এলাকা, ভোলা) অঞ্চলসমূহে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় গবেষণা ভেসেল এমভি রূপালী ইলিশ (স্পীড বোটসহ) সহযোগে ২০১৬

সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। এ সময়কালে মেঘনা নদীতে ইলিশ মাছ ধরার পেশাদার জেলে নৌকায় বহুল ব্যবহৃত ফাঁসের আকার (Mesh Size)-এর ভিত্তিতে ৫.৫ সেমি, ৬.৫ সেমি ও ৭.৫ সেমি ফাঁস (Mesh Size)-এর জালে ধৃত মাছ ও ফাঁস জালের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল (Data analysis & Result)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ২৬ সেমি থেকে ৩৫ সেমি দৈর্ঘ্যের মাছ বেশি ধরা পড়ে ও বিপণন হয় এবং মেঘনা নদীর (আপার ও লোয়ার অংশ) তিনটি অঞ্চলে মাছ আহরণে ফাঁস (মনোফিলামেন্ট/নাইলন সুতা) জালের বিভিন্ন Mesh (ফাঁস) সাইজ (২.৫ সেমি থেকে ৯ সেমি দৈর্ঘ্য) লক্ষ্য করা যায় যাতে জাটকাসহ সকল আকারের মাছ ধরা পড়ে এবং জাটকার পরিমাণ বেশি থাকে। দ্বিতীয়ত, ইলিশ মাছ ধরার ফাঁস জালে ধৃত মোট ৬৬০টি মাছের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫.৫ সেমি Mesh এর ফাঁস জালে ৩৮.৭৮% (২০-৩৬ সেমি সাইজের মাছ), ৬.৫ সেমি Mesh এর ফাঁস জালে ৩৯.১০% (২৪-৩৮ সেমি সাইজের মাছ) ও ৭.৫ সেমি Mesh এর ফাঁস জালে ২২.১৮% (২৮-৪৪ সেমি সাইজের) মাছ ধরা পড়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১: মেঘনা নদীতে ইলিশ মাছ ধরার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মেসের ফাঁস জালে ধৃত মাছের সংখ্যা, শতকরা হার (%), দৈর্ঘ্য সীমা (সেমি) ও গড় দৈর্ঘ্য (সেমি)।

নং	মেস সাইজ (সেমি)	ধৃত মাছ (সংখ্যা)	ধৃত মাছ (%)	ধৃত মাছের দৈর্ঘ্য সীমা (সেমি)	গড় দৈর্ঘ্য (সেমি)
১	৫.৫	২৫৬	(৩৮.৭৮%)	২০-৩৬	২৪.৭±২.৭০
২	৬.৫	২৫৮	৩৯.১০%)	২৪-৩৮	৩১.২±২.৭৮
৩	৭.৫	১৪৬	(২২.১২%)	২৮-৪৪	৩৪.৩৩±৪.৬৯

তৃতীয়ত লেংথ্ ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেশনের পর হল্ট মডেল (Sparre & Venema 1998 and Sparre *et. al.* 1989) ব্যবহার করে চূড়ান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ সীমার সর্বোত্তম বাঁক রেখা (Optimum Curve Line) পাওয়া যায়; যথা: ৫.৫ সেমি Mesh এর ফাঁস জালের নির্ধারণী মৎস্য দৈর্ঘ্য ২৬ সেমি, ৬.৫ সেন্টিমিটার Mesh এর ফাঁস জালের নির্ধারণী মৎস্য দৈর্ঘ্য ৩২.৮ সেমি ও ৭.৫ সেমি Mesh এর ফাঁস জালের নির্ধারণী মৎস্য দৈর্ঘ্য ৩৭ সেমি (সারণি ২)।

সারণি ২: তথ্য বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ইলিশ মাছ ধরার তিনটি ভিন্ন Mesh এর ফাঁস জালের নির্ধারিত Optimum length (সর্বোত্তম দৈর্ঘ্য) (L_m) (সেমি)।

ফাঁসের আকার (Mesh Size) সেমি	সর্বোত্তম দৈর্ঘ্য (L_m) সেমি
৫.৫	২৬
৬.৫	৩২.৮
৭.৫	৩৭

তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Discussion)

BOBLEME (2011) রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রথম ধৃত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য (Size at first capture) ছিল ৩৫ সেমি, ৩০ সেমি, ৩০.৩৪ সেমি, ৩০.২৫ সেমি, ২৭.০৬ সেমি, ২২.৮০ সেমি, ১৩.১২ সেমি, ১৯.৮৭ সেমি এবং ২১.২১ সেমি। Amin *et al.* (2004) এর তথ্যানুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালে প্রথম ধৃত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য Size at first capture ছিল ২৯.৮১ সেমি, ২২.৮০ সেমি এবং ২৭.০৬ সেমি। Rahman and Cowx (2008) এর মতে ৩২.৯ সেমি ছিল। BOBLEME (2014) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৩ সালে ছিল প্রথম ধৃত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য (Size at first capture) ছিল ২৬.৯ সেমি। উল্লেখিত সকল গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, (Size at first capture) এর পরিসীমা ১৩.২ সেমি থেকে ৩৫ সেমি পর্যন্ত। গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী ৬.৫ সেমি সাইজের Mesh (ফাঁস)-এর জাল ব্যবহার করা যথার্থ হবে।

সুপারিশ (Recommendation)

ইলিশের জন্য প্রচলিত ফাঁস জালের Mesh (ফাঁস) সাইজ বর্তমানে নির্ধারিত ৪.৫ সেমি থেকে বাড়িয়ে ৬.৫ সেমি সাইজের Mesh (ফাঁস) সাইজ নির্ধারণ করা।

উপসংহার (Conclusion)

বর্ণিত সকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার কথা ও ধৃত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে ৬.৫ সেমি সাইজের Mesh সাইজ বিবেচনা করলে নদীতে ইলিশ মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সহনশীল মৎস্য উৎপাদন ও 'হিলশা ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান' (HFMAP) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাবে। সর্বোপরি নদীতে ইলিশ মাছ ধরার ফাঁস জাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক সর্বোত্তম মান পাওয়া যাবে।

[১]প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর (ই-মেইল: anisur2002@yahoo.com)
[২]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর
[৩]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর

বায়োফ্লক প্রযুক্তি ঃ মৎস্যচাষে সম্ভাবনার নবদিগন্ত

Biofloc Technology : A Potential Window to Aquaculture

ড. মোঃ আমজাদ হোসেন[১] ও ড. রাজু আহমেদ[১]

Abstract

The rapid growth of aquaculture and projections of continued expansion necessary to meet future protein demands depends upon increasing productivity without overburdening land and water resources. To do this, the industry will need to apply sustainable technologies which minimize environmental effects, and develop cost effective production systems which support economic and social sustainability. Biofloc technologies can provide a major contribution towards meeting these goals while producing high quality, safe, attractive and socially acceptable products. Biofloc technologies facilitate intensive culture while reducing investment and maintenance costs and incorporating the potential to recycle feed. The technology is based upon zero or minimal water exchange to maximize bio-security while minimizing external environmental effects. Using artificial aeration to meet oxygen demand and suspend organic particles, development of a heterotrophic microbial community is encouraged in the pond. This diverse microbial community functions to mineralize wastes, improve protein utilization and reduce opportunities for dominance of pathogenic strains. This technology can increase as much as 10-20 times higher production than the existing culture practice. In the country like Bangladesh, where land and water are very scarce, biofloc technology can open a new window in aquaculture.

ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন কৃষিজ জমি ও পানির ওপর চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিজ জমি সুরক্ষা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে সরকারের নীতি এখন বেশ রক্ষণশীল। এমতাবস্থায় দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষে বিদ্যমান উন্নত-সনাতন বা আধা-নিবিড় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে আরও নিবিড় চাষের দিকে যাওয়ার বিকল্প নেই। প্রচলিত নিবিড় চাষে নিয়মিত খামারের পানি পরিবর্তন করায় প্রচুর বর্জ্য পরিবেশে চলে আসে। অধিকন্তু, নিবিড় চাষে চাষিরা নির্বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উচ্চ ঘনত্বে নিবিড় চাষে প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মৎস্যখাদ্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি মৎস্যচাষের খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার, ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাৎস্যচাষের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব। বাংলাদেশ একটি জনবহুল রাষ্ট্র বিধায় ভূমি ও পানির সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বায়োফ্লক প্রযুক্তি মৎস্যচাষে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

বায়োফ্লক কী? (What is Biofloc?)

বায়োফ্লক হলো প্রোটিনসমৃদ্ধ জৈব পদার্থ ও অণুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম, প্রোটোজোয়া, এ্যালজি, অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের মল এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী ও মৃত প্রাণী) এর দলা (Aggregation) (চিত্র ১)। এটি মূলত প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, হিউমিক পদার্থ, নিউক্লিক এসিড ও লিপিড এর সমন্বয়ে গঠিত। শুষ্ক বায়োফ্লকে প্রায় ৫০% প্রোটিন, ৩৬% শর্করা, ১.১৫% চর্বি, ১৩.৪% অ্যাশ, ১২.৬% ক্রুড ফাইবার, ১.২৮% ক্যালসিয়াম, ১.৩% ফসফরাস, ১.২৭% সোডিয়াম, ০.৭৫% পটাশিয়াম ও ০.৪১% ম্যাগনেশিয়াম থাকে (Kuhn *et. al.*, 2009)। বায়োফ্লককে ফিশমিলের বিকল্প হিসেবে মৎস্য খাদ্যের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির মূলনীতি (Principle of Biofloc Technology) : নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে প্রচুর খাদ্য

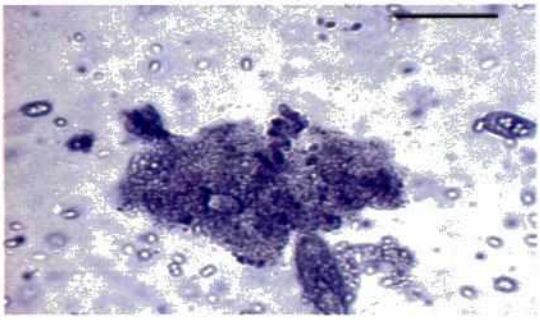

চিত্র ১ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে বায়োফ্লকের বর্ধিত রূপ

প্রয়োগ করা হয়। এসব খাদ্য উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন ও কার্বনসমৃদ্ধ। প্রয়োগকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ মাছ খায় না। খাদ্যে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেন এর যথাক্রমে মাত্র ১৫ ও ২৫ ভাগ মাছের শরীরে কাজে লাগে (এসিমিলেট হয়)। বাকী অংশ অব্যবহৃত খাদ্য ও মাছের মলের সাথে পানিতে থেকে যায়, যা পচে মাছের জন্য ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে। পানিতে বিদ্যমান হেটারোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়া পানির জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেনকে (অ্যামোনিয়া অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য) গ্রহণ করে নিজেদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য তাদের নাইট্রোজেনের পাশাপাশি কার্বনেরও প্রয়োজন হয়।পানিতে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত পনের এর বেশি বজায় থাকলে হেটারোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এই অনুপাত বজায় রাখার জন্য পানিতে বাহির থেকে কার্বোহাইড্রেট (যেমন- স্টার্চ, ময়দা, মোলাসেস, কাসাভা প্রভৃতি) সরবরাহ করা হয়। প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য ও উচ্চ ঘনত্বে মাছ থাকায় পুকুরে ব্যাপক মাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এজন্য পর্যাপ্ত অ্যারেটর স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই প্রযুক্তিতে কোন পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, এই প্রযুক্তিতে হেটারোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য গ্রহণ করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর করে (চিত্র: ২)। প্রোটিন হলো খাবারের সবচেয়ে দামী উপাদান। স্বাভাবিকভাবে খাবারের মাত্র ২৫% প্রোটিন মাছের দেহে কাজে লাগে। বাকী অংশ পানিতে অব্যবহৃত থেকে যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে এই অব্যবহৃত প্রোটিন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর হওয়ায় প্রোটিন রিকভারি দ্বিগুণ হয়ে যায়। বায়োফিল্টার পদ্ধতিতে নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াকে নিষ্পাপ নাইট্রেটে রূপান্তর করে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বায়োফ্লক পদ্ধতিতে হেটারোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়ার দশগুণ দ্রুতগতিতে অ্যামোনিয়া হ্রাস করে। ফলে এই পদ্ধতিতে পুকুরে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত থাকে ও উচ্চমূল্যের মৎস্য খাদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ইতিহাস (History of Biofloc Technology)

নব্বই এর দশকের গোড়ার দিকে ইসরাইলে প্রথম বায়োফ্লক প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে মধ্য আমেরিকার দেশ বেলিজের 'বেলিজ অ্যাকোয়াকালচার ফার্মে' প্রথম বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধতিতে সফলভাবে চিংড়ি চাষ করা হয়। বর্তমানে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দ্রোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে বায়োফ্লক পদ্ধতির চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি (Suitable Species for Biofloc Technology)

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক প্রজাতি নির্বাচন। যেসব মাছ মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে ও উচ্চমাত্রায় কঠিন পদার্থ (suspended solid) সহ্য করতে পারে সেসব প্রজাতি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযোগী। চিংড়ি ও তেলাপিয়া মাছ এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য উপযুক্ত। চিংড়ি ও তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০-৩০% খাদ্য সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। কার্পিও ও রুই মাছের ক্ষেত্রেও ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের উচ্চ মূল্য ও চাহিদাসম্পন্ন মাছ যেমন-শিং, পাবদা, গুলশাসহ অন্যান্য মাছ বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে জানতে হবে।

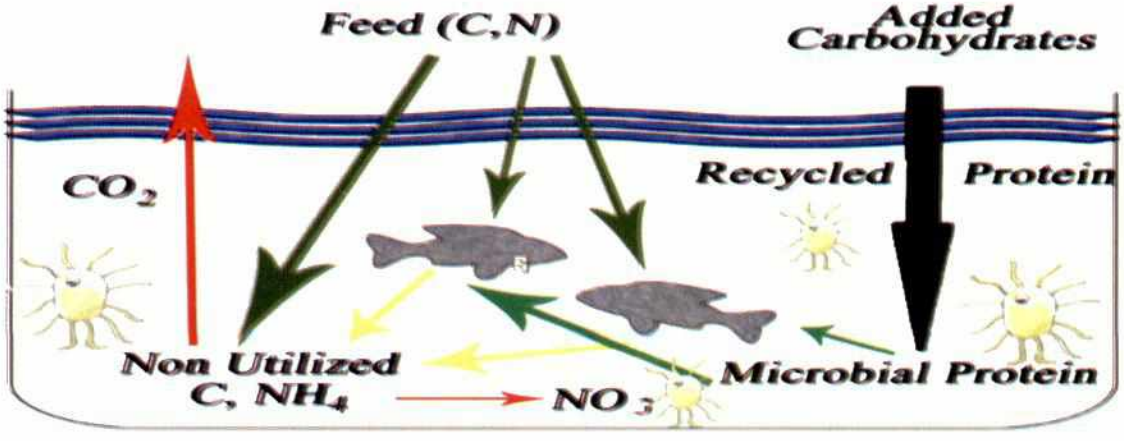

চিত্র ২: একটি পুকুরের বায়োফ্লক ইকোসিস্টেম।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছচাষের সুবিধা (Advantages of Biofloc Technology)

১. অনেক বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। ফলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

২. এফসিআর কম, বিধায় খাদ্য খরচ কম হয়। খাদ্যের ক্রুড প্রোটিনের ৩৭% মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন পুকুরে ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ দৈনিক ১০০ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করলে সেখানে দৈনিক ১১ কেজি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. যেহেতু বিভিন্ন ধরণের উপকারী অণুজীব ব্যাপক মাত্রায় মাছের পুকুরে বিদ্যমান থাকে সেহেতু ক্ষতিকর রোগজীবাণু মাছকে আক্রমণ করতে পারে না।

৪. পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না বা খুবই স্বল্প পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে চাষ করা যায়। ফলে দূষণের মাত্রা একেবারেই কম।

৫. বায়োফ্লকে পানি পরিবর্তন না করে অ্যারেশান দেয়া হয় ফলে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

৬. ভূমি ও পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৭. সামুদ্রিক মাছকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে যেখানে ভূমির মূল্য কম বা অন্যান্য সুবিধা বিদ্যমান সেরকম স্থানে চাষ করা যায়।

৮. বায়োফ্লক ব্যবহার করে বাজারের নিকটবর্তী স্বল্প স্থানে খামার স্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা বছর মাছ/চিংড়ি সরবরাহ করা যায়।

৯. মাছচাষের বিভিন্ন ধাপে যেমন- নার্সারি, লালন ও পালন পর্যায়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

১০. অধিক জৈব নিরাপত্তা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ এ যাবত কোনো বায়োফ্লক প্রযুক্তির চিংড়ি খামারে হোয়াইট স্পট সিনড্রম দেখা যায়নি।

১১. অধিক পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় টেকসই পদ্ধতি।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Biofloc Technology)

১. বিদ্যুৎ খরচ বেশি। প্যাডেল হুইল লাগে ২৮ হর্সপাওয়ার/হেক্টর।

২. নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। এজন্য বিকল্প একাধিক ব্যাকআপ জেনারেটর রাখতে হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ এর বাণিজ্যিক হার কৃষির চেয়ে বেশি হওয়ায় খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।

৩. মাটির পুকুরের পাড়সহ তলা মোটা পলিথিন (এইচডিপিই) দিয়ে ঢেকে দিতে হয় ফলে উৎপাদন খরচ বেশি হয়।

৪. দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন হয়।

বায়োফ্লক অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management of biofloc aquacullture)

বেশির-ভাগ বাণিজ্যিক বায়োফ্লক চিংড়ি পুকুরের আয়তন ০.১ হতে ২.০ হেক্টর হয়ে থাকে, তেলাপিয়া পুকুরের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট ০.০১ হতে ০.২ হেক্টর হয়ে থাকে। কনক্রিটের তৈরি ট্যাংকেও এই পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে। মাটির পুকুরের ক্ষেত্রে তলা ও পাড় মোটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে এইচডিপিই (হাই ডেনসিটি পলিইথিলিন) বেশ ভাল ও টেকসই। পুকুরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য প্রতি হেক্টরে ২৮-৩২ হর্সপাওয়ার অ্যারেটর প্রয়োজন হবে। অ্যারেটরগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমস্ত পুকুরের পানি সমভাবে মিশ্রিত হয় ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। বায়োফ্লকগুলো সর্বদা ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। কোনোভাবে যেন পুকুরের তলায় জমা না হয়। এজন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অ্যারেটরগুলো চালু রাখতে হবে। প্রাথমিকভাবে পানিতে মাছের খাদ্য ও পরিমাণমত কার্বোহাইড্রেট দিয়ে অ্যারেটর চালু করতে হবে। অতঃপর বায়োফ্লকের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বায়োফ্লক এর পরিমাণ ১৫-২০ মিলি/লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত হবে। চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১৩০-১৫০টি পিএল অবমুক্ত করা যাবে। নিয়মিত ৩০% প্রোটিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখার জন্য বাইরে হতে জৈব কার্বন সরবরাহ করতে হবে। বায়োফ্লক এর পুকুরে অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, পিএইচ, বায়োফ্লক এর পরিমাণ ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদন (Production)

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে তলায় পলিথিন বিছানো পুকুরে মাছচাষ করে প্রতি বর্গমিটারে প্রতি চাষে ১-২ কেজি (৪-৮ মে. টন/একর) চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া গেছে। সিমেন্টের ট্যাংকে চাষ করে প্রতি বর্গমিটারে ১০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রতি বর্গমিটারে ২০-৩০ কেজি (একরে ৮০-১২০ টন) পাওয়া গেছে।

কাঙ্ক্ষিত কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা (Maintaining Desired Carbon-Nitrogen Ratio)

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা। একটি ৩০-৩৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত থাকে ৯-১০ঃ১। এই অনুপাত যদি ১৫ঃ১ রাখা যায় তবে হেটারোট্রেপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ও

পুকুরে মাছের মজুদ ঘনত্ব: ১০ কেজি/ঘনমিটার

প্রতিদিন মাছের ওজনের ২০% খাদ্য প্রয়োগ)
খাদ্যের পরিমাণ: ২০০ গ্রাম/দিন/ঘনমিটার

ধরা যাক, ৩০% প্রোটিনযুক্ত খাবার) প্রোটিনের
পরিমাণ: ৬০ গ্রাম/দিন/ঘনমিটার

(প্রোটিনে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে) নাইট্রোজেনের
পরিমাণ: ৯.৬ গ্রাম/দিন/ঘনমিটার

মোট নাইট্রোজেনের ২৫% মাছের দেহে জমা হয়;
বাকী ৭৫% পানিতে মেশে পানিতে নাইট্রোজেন
আসে: ৭.২ গ্রাম/দিন/ঘনমিটার

পানিতে কার্বন : নাইট্রোজেন ১৫ বজায় রাখা
বাঞ্ছনীয়। অতএব প্রতিদিন জৈব কার্বন প্রয়োজন
১০৮ গ্রাম/ঘনমিটার

প্রয়োগকৃত ২০০ গ্রাম খাদ্য থেকে পানিতে কার্বন
আসে ০২X০.৮৫ (১৫% মাছে জমা হয় X ০.৫
(জৈব পদার্থে ৫০% কার্বন থাকে)=৮৫ গ্রাম

বাহির থেকে প্রতিদিন কার্বন সরবরাহের প্রয়োজন
(১০৮-৮৫)= ২৩ গ্রাম। এই পরিমাণ কার্বনের
জন্য প্রতিদিন জৈব পদার্থ (মোলাসেস/
গ্লিসারল/স্টার্চ/ময়দা) প্রয়োজন = ১১.৫

চিত্র : বায়োফ্লক পুকুরে প্রতিদিন নাইট্রোজেন সৃষ্টি ও কার্বন সরবরাহের কল্পিত হিসাব (Schryver *et. al.*, ২০০৮)

অ্যামোনিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। তাছাড়া পানিতে সরাসরি কার্বোহাইড্রেট (কার্বন উৎস) সরবরাহের মাধ্যমেও কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের কার্বোহাইড্রেট যেমন-মোলাসেস, আটা, ময়দা, চালের কুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি পুকুরে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কার্বনের পরিমাণ তাত্ত্বিকভাবে হিসাব করে বের করা যায় (চিত্র ৩)।

উপসংহার (Conclusion)

বায়োফ্লক প্রযুক্তি একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতি। পানি পরিবর্তন করতে হয় না বিধায় এই পদ্ধতি পানি সাশ্রয়ী এবং এতে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পুকুর বা ট্যাংকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় বিধায় এই পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব। তাছাড়া বর্জ্য থেকে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হয় বলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করেই কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায়। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির চেয়ে এতে উৎপাদনও অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে যেহেতু ভূমি ও পানির সংকট রয়েছে, সেহেতু এই পদ্ধতিতে মাছচাষ খুবই উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত প্রজাতির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উন্নয়নের যথাযথ গবেষণার প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে যথাযথ গবেষণা তথ্য ছাড়াই এই প্রযুক্তিতে দেশে মাছ চাষের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যথাযথ গবেষণালব্ধ জ্ঞান ছাড়াই এ প্রযুক্তিতে মাছচাষ করে ব্যর্থ হলে প্রযুক্তিটি সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম হতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই প্রযুক্তিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। কৃষির মতো মৎস্যখাতে সুলভে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা গেলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। অতএব একটি টেকসই লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হিসেবে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মৎস্যচাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

---

[১]প্রফেসর, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জলজ পরিবেশ ও মৎস্যচাষে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঃ খাদ্য নিরাপদতায় ঝুঁকি ও করণীয়

Microplastic in Aquatic Environment and Aquaculture: Risk and Measures in Food Safety

সুজিত কুমার চাটার্জী[১] ও মোঃ বরকতুল আলম[২]

Abstract

Plastic production has increased substantially since large scale industrial manufacture started in the early 1950s. Almost all aspects of daily life involve plastics. One of the most appreciated qualities of plastic products is their durability. However, this quality when combined with improper waste management leads to environmental contamination on land, in freshwater and in marine environments. Plastic products will degrade slowly over time, particularly when exposed to sunlight (ultraviolet radiation) and high temperatures. This degradation will lead to the breakdown of the material into smaller sizes ranging from the macroscopic to the microscopic and eventually to presently undetectable dimensions, the nanoplastics. They come from a variety of sources, including cosmetics, clothing and industrial processes. Two classifications of microplastics currently exist: primary microplastics and secondary microplastics. Both types are recognized to persist in the environment at high levels, particularly in aquatic and marine ecosystems. Because plastics do not break down for many years, they can be ingested and incorporated into, and accumulated in the bodies and tissues of aquatic organisms. The entire cycle and movement of microplastics in the environment is not yet known, but research is currently underway to investigate this issue.

১৯৫০ এর গোড়ার দিকে বৃহদাকার শিল্প উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকেই প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজেই প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম প্যাকেজিং, বিল্ডিং ও নির্মাণ সামগ্রী, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি নির্ভর শিল্প, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, কৃষি এবং গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ক্রীড়া সামগ্রী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম।

প্লাস্টিক পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও স্বল্প ওজনই এর বহুল ব্যবহারের অন্যতম কারণ। অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্লাস্টিক পণ্যের এই গুণগুলো মাটি, পানি এবং পরিবেশ দূষণের অন্যতম নিয়ামক। সূর্যালোক, অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ ও উচ্চ তাপমাত্রায় প্লাস্টিক পণ্যগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ম্যাক্রোস্কোপিক থেকে মাইক্রোস্কোপিক এবং অবশেষে অজ্ঞাত পরিমাপের ন্যানোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। প্লাস্টিকের ছোট কণা এবং এর আঁশই হলো মাইক্রোপ্লাস্টিক। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন আদর্শ মান না থাকলেও সাধারণত ৫ মিলিমিটার বা তদাপেক্ষা ছোট ব্যাসের প্লাস্টিকের কণাই মাইক্রোপ্লাস্টিক হিসেবে পরিচিত। মাইক্রোপ্লাস্টিককে সাধারণত আকার, আকৃতি ও রঙের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে এবং আকারের ভিত্তিতেই কোন ধরণের প্রাণী প্রভাবিত হতে পারে তা নির্ধারিত হয়। প্রাইমারি মাইক্রোপ্লাস্টিক মূলত মানুষ এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য ও পণ্যের উপাদান (যেমন: টুথপেস্ট, ফেসওয়াশ, ফেসিয়াল স্ক্রাব এবং এয়ার ব্লাস্টিং টেকনোলজি) হিসেবে ব্যবহারের জন্য সরাসরি উৎপাদন করা হয়। পক্ষান্তরে সেকেন্ডারি মাইক্রোপ্লস্টিক বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্যের ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। উভয় ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক উচ্চ পরিমাণে পরিবেশে বিশেষ করে জলজ বাস্তুতন্ত্রে বিদ্যমান। মাইক্রোপ্লাস্টিকে বিভিন্ন ধরনের এডিটিভস (রাসায়নিকের মিশ্রণ) বিদ্যমান থাকে যা জলজ পরিবেশে নিষ্কাশিত হয়। এছাড়াও জৈবিকভাবে জমাকৃত বিষাক্ত দূষণকারি (Persistent Bioaccumulative and Toxic Contaminants-PBTs), স্থায়ী জৈবিক দূষণকারী (Persistant Organic Pollutant-POP) হিসেবে জলজ পরিবেশে মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকের অনুসঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। উপরন্তু, এসব মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকস বিভিন্ন জলজ প্রাণী যেমন- ক্ষুদ্র শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ভাইরাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে এবং কখনও কখনও খাবার হিসেবে মাছ বা জলজ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে।

প্রাইমারি মাইক্রোপ্লাস্টিক (Primary microplastic)

প্রাইমারি মাইক্রোপ্লাস্টিক মূলত উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট আকারের প্লাস্টিক যা পিলেট, পাউডার ও অ্যাব্রাসিভ হিসেবে গৃহস্থালি এবং শিল্পে ব্যবহৃত হয়। টুথপেস্ট, ফেসওয়াশ, ফেসিয়াল স্ক্রাব, অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী এবং এয়ার ব্লাস্টিং টেকনোলজিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়। পেইন্টিং ও মরিচারোধক হিসেবে ব্যবহৃত

এক্রাইলিক, মেলামাইন বা পলিয়েস্টার প্রাইমারি মাইক্রোপ্লাস্টিকের অন্তর্গত।

সেকেন্ডারি মাইক্রোপ্লাস্টিক (Secondary microplastic)

সময়ের সাথে সাথে ভৌতিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৃহৎ প্লাস্টিকের পরিবর্তিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত অংশই সেকেন্ডারি মাইক্রোপ্লাস্টিক। প্লাস্টিক ব্যাগ, খাদ্যদ্রব্যের মোড়কসামগ্রী, প্লাস্টিকের দড়ি, গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত আঁশ বা টুকরা এর অন্তর্গত। এই মাইক্রোপ্লাস্টিকসগুলি পরবর্তীতে আরো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অংশে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে জলজ পরিবেশে শনাক্তকৃত ক্ষুদ্রতম মাইক্রোপ্লাস্টিকটির ব্যাস ১.৬ মাইক্রোমিটার।

পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উৎস (Microplastic sources in water)

প্রাথমিকভাবে প্লাস্টিকের উৎপাদন ও এর ব্যবহার, ফেব্রিকেশন এবং রিসাইক্লিংয়ে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের ঘর্ষণ, ক্ষয়সাধন এবং পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের ভৌতিক ভাঙনের মাধ্যমে মাইক্রোপ্লাস্টিক উৎপন্ন হয়। এছাড়া সেক্টোরাল কনজিউমার (কৃষি, মৎস্য ও মৎস্যচাষ, নির্মাণ শিল্প, স্থলজ পরিবহন শিল্প, শিপিং এবং অফশোর শিল্প, পর্যটন শিল্প), ব্যক্তি কনজিউমার (খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় এর মোড়ক, ব্যক্তিগত প্রসাধনী, টেক্সটাইল), ম্যাক্রো, মাইক্রো ও ন্যানো লেভেলে প্লাস্টিক উৎপাদন এবং পরিবেশে এদের উপস্থিতি সম্ভাব্য ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মৎস্য এবং মৎস্যচাষে প্লাস্টিকের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে মাছ ধরার জাল/গিয়ার বা সরঞ্জামাদি, খাঁচা, বয়া, প্লাস্টিকের নৌকা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ। সম্প্রতি মৎস্য পরিবহন এবং বিতরণে প্লাস্টিকের পাত্র এবং মোড়কের ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরিত্যক্ত বা বাতিলকৃত এবং হারানো মাছ ধরার জাল/গিয়ার বা সরঞ্জামাদির উত্তম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার অভাব জলাশয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

জলজ প্রাণীর সাথে মাইক্রোপ্লাস্টিকের মিথস্ক্রিয়া ও খাদ্যচক্রে স্থানান্তর (Interaction between aquatic organisms, microplastics & trophic transfer)

মাইক্রোপ্লাস্টিক জলজ এবং স্থলজ পরিবেশে বিদ্যমান থাকায় খাদ্যশিকলের বিভিন্ন পর্যায় ও খাদ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রাণিকূলের সংস্পর্শে আসে এবং মিথস্ক্রিয়া ঘটে। কখনও কখনও প্রাণিকূলসমূহ সরাসরি মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করে থাকে এবং তা আড়সংক্রমণ (cross contamination) এর মাধ্যমে খাদ্যচক্রের স্তর বা পর্যায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এক প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে পরোক্ষ

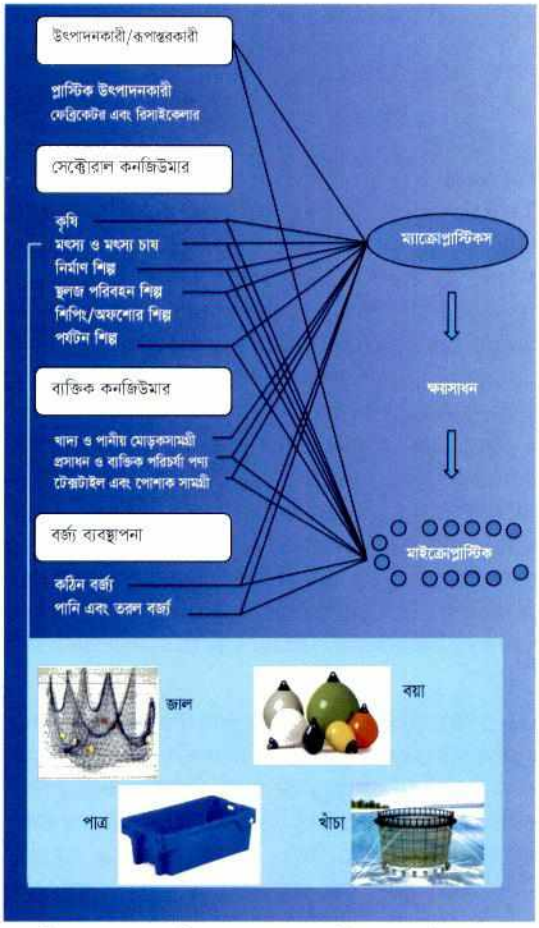

চিত্র ১: জলজ পরিবেশে মাইক্রোপ্লাস্টিকের পরিক্রমা

প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। মানুষের খাদ্য তালিকায় সী-ফুড মাইক্রোপ্লাস্টিকের একটি সম্ভাব্য উৎস। তবে ফিনফিস ও চিংড়ি প্রধানতম সী-ফুড হলেও এটি মানুষের জন্য মাইক্রোপ্লাস্টিকের উৎস নয়, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাছের নাড়িভুড়ি ও চিংড়ির খোসা অপসারণ করেই তা গ্রহণ হয়ে থাকে।

মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ঝুঁকি প্রোফাইলিং (Risk profiling of microplastics in fish and fishery products)

ঝুঁকি বিশ্লেষণ হলো মানব স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপদতায় কোন পণ্য কতটুকু ঝুঁকির কারণ তা নির্ণয় করে নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত উপায় এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি স্টেকহোল্ডারগণকে অবহিত করা। আদর্শমান উন্নতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতার ঝুঁকি মোকাবেলায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ইহা উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণাদি সরবরাহের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে কার্যকর সিদ্ধান্ত

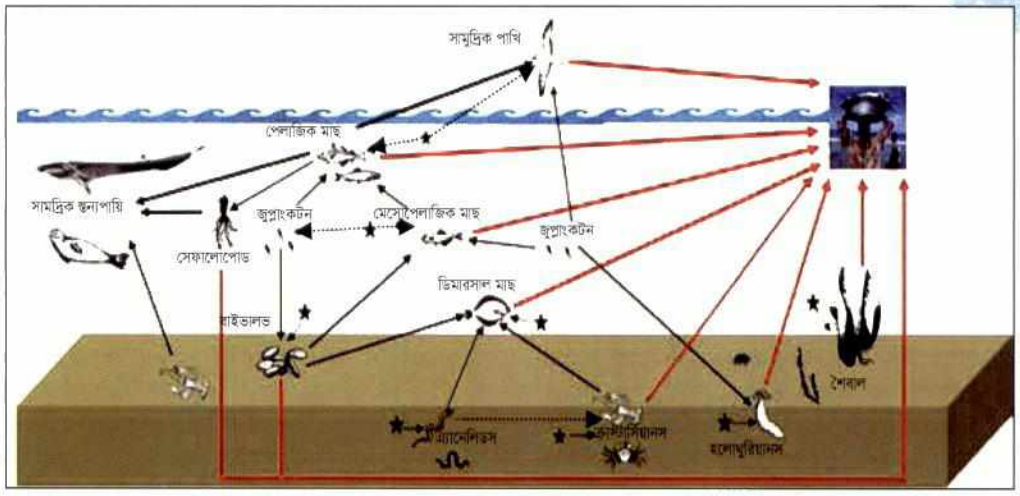

চিত্র ২: কালো তারকা দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিকস ও এর উপাদান, কালোবিন্দুযুক্ত তীর দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিক ও প্রাণীকূলের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া, কালো তীর দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরোক্ষ আত্তীয়করণ, লাল তীর দ্বারা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মাইক্রোপ্লাস্টিকের মানুষের মধ্যে স্থানান্তরের সম্ভাব্য পথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তীরের পুরত্ব দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিকস ও এর উপাদানের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে সম্ভাব্য বায়োএ্যাকুমুলেশন নির্দেশিত (সূত্র: এফএও টেকনিক্যাল পেপার, ২০১৭)।

গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত খাদ্য নিরাপদতা এবং জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে কার্যকরি টুলস হিসেবে ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ঝুঁকি প্রোফাইলকরণে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও এর নির্দিষ্ট মনোমার এবং সংশ্লিষ্ট প্লাস্টিক দূষণকারী ও এর এডিটিভসের তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রয়োজন যা ঝুঁকি বিশ্লেষণে প্রাথমিক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এই প্রাথমিক তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং এক্সপোজার এসেসমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকির ব্যাপ্তি নির্ধারিত হবে। ঝুঁকি মূল্যায়ণ, বিকল্প নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং ও রিভিউ এর মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ যা স্টেকহোল্ডারগণের পারস্পরিক তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে অবহিতকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণে সুপারিশমালা
(Recommendations for microplastis control)

১. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সেক্টর (শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি) এবং ভোক্তাদের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক বিষয়ক (প্রভাব, উৎস ও নিয়ন্ত্রণ) সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

২. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যানে বাণিজ্যিক মৎস্য খামারে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের মাত্রা নির্ণয়ে মনিটরিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩. মাইক্রো এবং ন্যানোপ্লাস্টিক শনাক্তকরণ এবং পরিমাণ নির্ধারণে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৪. মৎস্য, মৎস্যচাষ এবং মৎস্যপণ্য সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে মাইক্রো ও ন্যানোপ্লাস্টিকের দূষণ এবং দূষণের মাত্রা ও প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।

৫. সম্ভাব্যক্ষেত্রে মৎস্য সেক্টরে প্লাস্টিক ব্যবহারের বিকল্প খুজে বের করা এবং জলজ পরিবেশে প্লাস্টিক ব্যবহার্য সামগ্রী (মাছ ধরার জাল/গিয়ার, দড়ি, দস্তানা, স্টাইরোফোমের মাছ রাখার পাত্র, বয়া ইত্যাদি) ব্যবহারের মাত্রা কমানো।

উপসংহার (Conclusion)

মাইক্রোপ্লাস্টিক সব পরিবেশেই বিদ্যমান এবং এর পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। জলজ পরিবেশে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক জানাসহ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে মাইক্রোপ্লাস্টিক মনিটরিং ও টেস্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: sujit_llac24@yahoo.com)
[২]মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

আরভি ড ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন ঃ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ও গবেষণায় অর্জিত মাইলফলক

RV Dr Fridtjof Nansen : A Milestone in Marine Fisheries Resources Survey & Research

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন[১], ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন[২] ও সাইদুর রহমান চৌধুরী[৩]

Abstract

The recent verdict of the International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS) and PCA of the UNCLOS regarding Bangladesh and Myanmar-India maritime boundary has given Bangladesh the exclusive rights to explore, exploit, preserve and manage the maritime resources over a huge area of the Bay of Bengal of 1,18,813 sq. km. A new horizon for enhancing blue economy needs to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources in the coming years for the economic developement of Bangladesh, realizing the goals of SDG-14. Research Vessel Dr Fridtjof Nansen has made a new scope for marine fisheries survey and ecosystem research in Bangladesh waterbody (Leg-3.3) as part of the EAF-Nansen Programme (2017-2021). During the 15 days survey, main emphasis has been given on small pelagic resources (around 20-200m water depth). Besides this, it also covered ecosystem survey on the continental shelf of Bangladesh EEZ and extending offshore into deeper waters (around 2,200m) for a mesopelagic transects to cover hydrographic conditions, phyto-zoo and ichthyoplankton, abundance of pelagic resources, biodiversity from trawl catches, pollution (micro plastics and food safety) and nutritional value of fish. The survey design prepared by the Bangladesh Marine Fisheries Survey Design Working Group was provided prior to the survey to the Department of Fisheries. Under the leadership of Dr Erik Olsen total 30 national and International scientists joined at the survey program where eighteen were from different institutions of Bangladesh.

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সূচনালগ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। ১৯৭২ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'মাছ হবে দেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ'। সে বছরই সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক জাতির পিতাকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০ (দশ)টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে সাগর থেকে মৎস্য আহরণ শুরু করে। এর আগে আমাদের সমুদ্রে কোনো বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ছিল না। এরপর ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ও জাপান সরকার এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন সহায়োগী সংস্থা ইউএনডিপি'র অনুদানে সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে প্রকল্পটি সংশোধিত সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প নামে দুই বছর মেয়াদের জন্য ২য় পর্যায়ে অনুমোদিত হয় এবং ১৯৯১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯৮০-৮৩ সালে গবেষণা জাহাজ আরভি অনুসন্ধানী যোগে স্থানীয় গবেষকগণের দ্বারা এবং ১৯৮৪-৮৭ সালে বিদেশি বিশেষজ্ঞবৃন্দের সাথে যৌথভাবে তলদেশীয় (demersal) ও চিংড়ি (shrimp) সম্পদের জরিপ এবং সমুদ্রতাত্ত্বিক (oceanographic) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপকভাবে জরিপ ও গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯৮০ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে আরভি অনুসন্ধানী কর্তৃক ৮৪টি এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আরভি মাছরাঙ্গা কর্তৃক ২১টি জরিপ ক্রুজ সম্পন্ন করা হয়। গবেষণা জাহাজদ্বয় পুরাতন হয়ে মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় বঙ্গোপসাগরে জরিপ ক্রুজ পরিচালনা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন জাতীয় গবেষণা জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী ২০১৬ সাল হতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য জরিপ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন-৩ কর্তৃক ২০১৮ সালের ০৩ হতে ১৭ আগস্ট বঙ্গোপসাগরের উপরিস্তরের ছোট মাছ (small pelagics), তলদেশীয় মাছ (bottom), ৩০০-৫০০ মিটার গভীরতার মধ্যস্তরীয় মাছ (মেসো পেলাজিক)-এর জরিপ এবং সমুদ্রতাত্ত্বিক ও ইকোসিস্টেম সার্ভে সম্পন্ন করা হয়।

এক নজরে জরিপ ও গবেষণা জাহাজ 'আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন' (RV Dr Fridtjof Nansen - at a glance)

আরভি ড ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন" হলো বর্তমান পৃথিবীর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ এবং ওশেনোগ্রাফিক গবেষণা জাহাজ। নরওয়ে সরকারের উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা নোরাড (Norweigian Agency for Development Cooperation, NORAD) এর মালিকানায় জাহাজটি নির্মিত হয়েছে। FAO এর

EAF-Nansen program (Ecosystem Approach to Fisheries)-এর নিয়ন্ত্রণে এবং নরওয়ের সমুদ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান IMR (Institute of Marine Research) এবং UIB (University of Bergen)-এর যৌথ কারিগরি সহযোগিতায় জাহাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা করে আসছে। সম্প্রতি ২০১৭ সালে জাহাজটির অত্যাধুনিক সংস্করণ আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন-৩ আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। জাতিসংঘের পতাকাবাহী এ জাহাজের নামকরণ করা হয়েছে এমন একজন বিজ্ঞানী ও মানবতা কর্মীর নামে যিনি সমুদ্রবিজ্ঞানী হিসেবে সমুদ্র

চিত্র: সাগরে ভাসমান আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন

গবেষণায় বিশেষ করে ফিজিক্যাল ওশানোগ্রাফিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মানবতা কর্মী হিসেবে এ মহান বিজ্ঞানীর অবদান তাঁর বিজ্ঞানী পরিচয়কেও ছাড়িয়ে যায়। যার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২২ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। নিচের সারণিতে জাহাজটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।

জাহাজের নাম	আরভি ড ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন
দৈর্ঘ্য	৭৪.৫ মিটার
প্রস্থ	১৭.৪০ মিটার
ড্রাফট	৬.৪ মিটার
গ্রস ডিসপ্লেসমেন্ট	৩৮৫৩ টন
ইঞ্জিন পাওয়ার	৪৫০০ কিলোওয়াট
স্বাভাবিক গতিবেগ	১১ নটিক্যাল মাইল
গবেষণাগার	৭ টি
একুস্টিক গবেষণাগার	০১ টি
কনফারেন্স রুম	০১ টি
পাঠাগার	০১ টি
জনবল ধারণ ক্ষমতা	৪৫ জন
নির্মাণকাল	২০১৬

জরিপ ও গবেষণা কাজে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি (Modern equipments in survey and research activities):

ওশেনোগ্রাফিক	হাইড্রো একুস্টিক্স এবং মৎস্য জরিপ	প্লাঙ্কটন এবং বেনথোস	ব্যাথিমেট্রিক ম্যাপিং
CTD winch, 4500 m-ø8,18 mm, SWL 3,0 t.	Echo sounders (EK 80)	Phytoplankton-net	Multibeamecosounders (EM710, EM302)
CTD/Sonde/podwinch, 4000 m-ø18,5 mm, SWL 4,1 t.	Omni-directional Fisheries sonar (SH 90, SU 90)	Water samples from Niskin bottles	subsurface bottom profiler (SBP 300)
Multipurpose el/opt. winch, 3000 m-ø13,6 mm, SWL 4,1 t	Scientific sonars (MS70, ME 70)	Multinet medium (HYDROBIOS, 180mμ)	Dynamic position system
General purpose winch, 2500 m-ø12,7 mm, SWL 4,2 t.	LSSS Post Processing System	Van Veen gra	High precision Acoustic position system
Plankton netwinch, 4500 m, ø8 mm, 3,0 t.	2 Trawl winches, 4500 m-ø26 mm, SWL 41,7 t.	WP2 (180mμ), Juday (90mμ)	Video Assisted MultiSampler (VAMS): 5 grabs,still cameras, video camera, Remote operated vehicle (ROV)

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন কর্তৃক বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম (Survey and research activities in the Bay of Bengal by Dr Fridtjof Nansen)

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন কর্তৃক জরিপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- উপরস্তরীয় ছোট আকারের (small pelagics) ও ৩০০-৫০০ মিটার গভীরতার মধ্যস্তরীয় (meso-pelagic) সামুদ্রিক মাছের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য নির্ণয়;
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক (মহীসোপান) এলাকার হাইড্রোগ্রাফিক অবস্থা নিরুপণ। এক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা (temperature), লবণাক্ততা (salinity), দ্রবীভূত অক্সিজেন (dissolved oxygen), প্রতিপ্রভা (fluorescense), সবুজ উদ্ভিদ রঞ্জক (chlorophyll), উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানসমূহ (nutrients), অম্লতা (pH) এবং ক্ষারত্ব (total alkalinity) এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক ভাসমান উদ্ভিদ (phytoplankton), ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাসমান প্রাণী (zooplankton), বিভিন্ন মাছের রেণুপোনা (ichthyoplankton) ও জেলিফিসের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য নির্ণয়;
- সামুদ্রিক মাছের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ;

- নির্বাচিত মাছের প্রজাতিসমূহের জেনেটিক বিশ্লেষণ;
- সামুদ্রিক মাছের পাকস্থলীর নমুনাসমূহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের অস্তিত্ব নির্ণয় ও বিশ্লেষণ;
- সংগৃহীত মাছে উপস্থিত দূষক পদার্থের (contaminants) মাত্রা এবং পুষ্টিগুণ (nutritional value) নির্ণয়;
- সংগৃহীত মাছে পরজীবীর (parasites) উপস্থিতি ও মাত্রা নির্ণয়।

জরিপ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি এবং অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানী (Duration and engaged scientists for survey activities)

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন কর্তৃক ২০১৮ সালের ০৩ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অব মেরিন বিসার্চ, নরওয়ের ৯ জন, জুয়োলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ৩ জন, মৎস্য অধিদপ্তরের ১১ জন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ১ জন, ও ওয়ার্ল্ডফিসের ১ জনসহ মোট ৩০ জন বিজ্ঞানী কর্তৃক বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্যসম্পদ, সমুদ্রতাত্ত্বিক ও ইকোসিস্টেম জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: জরিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী গবেষক দল

জরিপ কার্যক্রমের ডিজাইন (Design of survey activities)

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন কর্তৃক সার্ভে অব রিজিওনাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভে অফ দ্য বে অব বেঙ্গল (Survey of Regional Resources and Ecosystem of the Bay of Bengal) ২০১৮-কে মোট ৫টি খন্ডে (Leg) ভাগ করা হয়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় লেগ-৩.৩ এর অন্তর্ভুক্ত; যেখানে ২০ হতে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অ্যাকুস্টিক সার্ভের মাধ্যমে উপরিস্তরের (small pelagics) মাছের মজুদ নিরূপণ ও মধ্যস্তরীয় (meso-pelagic) মাছের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য নির্ণয়, প্ল্যাংকটন এবং বিভিন্ন প্রকার ওশেনোগ্রাফিক ডাটা ও নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

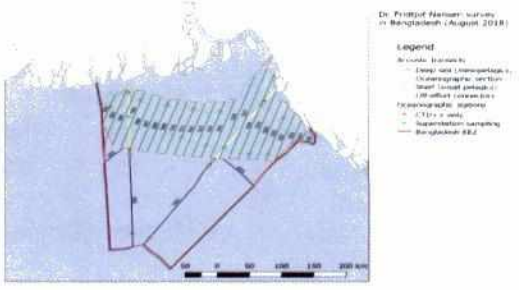

চিত্র : সার্ভে এলাকা লেগ-৩.৩

আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম (Survey operation by RV Dr Fridtjof Nansen)

ক. উপরিস্তরের (small pelagics) মাছের মজুদ নিরূপণ এবং মেসোপেলাজিক মাছের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার লক্ষ্যে অ্যাকুস্টিক সার্ভে পরিচালনা বাংলাদেশর সমুদ্রসীমায় ২০ হতে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপরস্তরীয় ছোট আকারের (small pelagics) মাছের মজুদ নিরূপণ ও গভীর সমুদ্র এলাকায় প্রায় ২২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মেসো-পেলাজিক মাছের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যের প্রাথমিক ধারণার লক্ষ্যে অ্যাকুস্টিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়। উপরিস্তরের ছোট পেলাজিক মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য মাছের প্রজাতি ভেদে তিনটি ভাগে (সার্ডিন, পেলাজিক-১ ও পেলাজিক-২) বিভক্ত করা হয়। পেলাজিক-১ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত Sardinella, Engraulidae, Chirocentridae ও Dussumeridae ব্যতীত অন্যান্য Clupeid গোত্রভুক্ত মাছ, পেলাজিক-২ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত Carangidae, Scombridae, Sphyraenidae এবং Trichiuridae গোত্রভুক্ত মাছ। জাহাজে Simrad EK80 Scientific Split Beam Echo Sounder এর মাধ্যমে একুস্টিক ডাটা সংগ্রহের পর Large-Scale Survey System (LSSS) নামক বিশেষায়িত সফটওয়্যারের সাহায্য ডাটা বিশ্লেষণ করে উপরিস্তরের ছোট পেলাজিক মাছের মজুদ নিরুপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, অ্যাকুস্টিক ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছোট পেলাজিক মাছের মজুদ নিরূপণ করা হলেও মেসোপেলাজিক মাছের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নিম্নের চিত্রে ছোট আকারের (small pelagics) এবং মেসোপেলাজিক মাছের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হলো।

খ. সামুদ্রিক মাছের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ জরিপকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ২০ হতে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এলাকাকে মোট ২৪টি ট্রানজেক্টে ভাগ করা হয়। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,০৩৭ কিমি এবং এর মাধ্যমে প্রায় ৩৭,৮৩০ বর্গ কিমি আয়তন এলাকায় অ্যাকুস্টিক সার্ভে পরিচালিত হয়। সার্ভে চলাকালে ৩৬টি পেলাজিক এবং ৫টি বটম ট্রলিংসহ মোট ৪১টি ট্রলিং

চিত্র: সার্ভে চলাকালীন প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির নমুনা

সম্পন্ন করা হয় এবং ১৩৬ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির ক্রাস্টাশিয়ান, ১০ প্রজাতির মোলাস্ক এবং ৩ প্রজাতির সাপসহ মোট ১৭২ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১৬টি বিভিন্ন প্রজাতি শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ফরমালডিহাইডে নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। সামুদ্রিক মাছের পাকস্থলীর নমুনা বিশ্লেষণের জন্য মোট ৪৪টি বিভিন্ন প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাকস্থলীর নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য ০৯টি প্রজাতির মেসোপেলাজিক মাছের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

গ. ওশেনোগ্রাফিক (Oceanographic) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক (মহীসোপান) এলাকার সামুদ্রিক পরিবেশের সার্বিক অবস্থা নিরূপণে বিভিন্ন ওশেনোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, Fluorescence, Chlorophyll-A, Nutrients, pH ও Total Alkalinity এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গবেষণা জাহাজ আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন-এ সকল ধরনের অত্যাধুনিক ওশেনোগ্রাফিক উপাত্ত সংগ্রহকারী যন্ত্রপাতি থাকার সুবাদে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ পরিমাণ ওশেনোগ্রাফিক ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

পেলাজিক জোনের মাছ ও পানির রাসায়নিক ও বায়োলজিকাল বিন্যাস ও সম্পর্ক নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রত্যেক পেলাজিক নমুনা স্টেশন হতে হাইড্রলোজি ও বায়োলজিক্যাল নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় সুপার স্টেশন (CTD, PH, Zooplankton, Phytoplankton, Nutrient, Egg ও Larvea, Microplastic ইত্যাদি) এবং শুধুমাত্র CTD station হতে নমুনা সংগ্রহ (চিত্র ৩) তুলে ধরা হলো। সার্ভে চলাকালে মোট ৩৬টি স্টেশন হতে পানির নমুনা ও সিটিডি ডাটা সংগ্রহ, ২০১টি pH ও অ্যালকালিনিটি, ২০১টি সমুদ্রের পানির নিউট্রিয়েন্ট, ১৭৩টি ক্লোরোফিল-এ, ০৯টি দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং ১৫টি স্যালাইনিটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। চিত্রে বিভিন্ন নমুনা স্টেশনসমূহ দেখানো হলো। জাহাজে (On board) ওশেনোগ্রাফিক ডাটা বিশ্লেষণে temperature, salinity, oxygen oncentrations and chlorophyll (fluorescence)-এর প্রাথমিক অবস্থা চিত্রে দেখানো হলো।

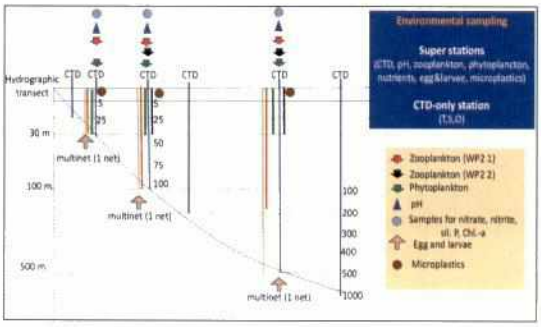

চিত্র: সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় নমুনা সংগ্রহ

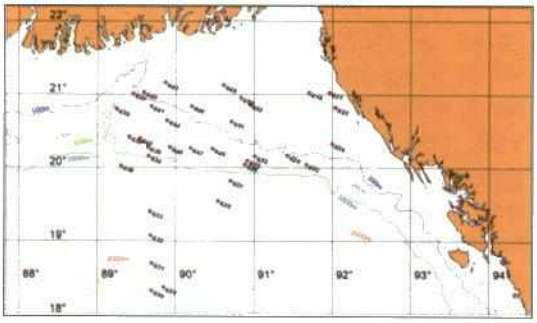

চিত্র: সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় নমুনা স্টেশান

উল্লেখ্য, সংগৃহীত এসকল ওশেনোগ্রাফিক নমুনা এবং তথ্য উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের জন্য আই.এম.আর এবং ইউনিভার্সিটি অব বার্গেন, নরওয়েসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. সমুদ্রের পানি ও মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিকের অস্তিত্ব নির্ণয় ও বিশ্লেষণ

প্রত্যেক সুপার স্টেশন হতে ৩৩৫ মাইক্রো মিটারের মান্টা ট্রলের মাধ্যমে ৩০টি স্থানে পানির উপরিস্তর হতে ভাসমান মাইক্রোপ্লাস্টিক নমুনা সংগ্রহ করা হয় যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিসারিজ এর গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র: জরিপে প্রাপ্ত কতিপয় নমুনা

ঙ. সামুদ্রিক প্ল্যাংকটন এর নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

সমুদ্রের ২০ মিটার হতে প্রায় ২,১০০ মি. গভীরতার পানিতে বিভিন্ন প্ল্যাংকটনের বিস্তৃতি, প্রাচুর্য ও আনুপাতিক অবস্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যে ফাইটোপ্ল্যাংকটন নেট ব্যবহার করে ৩১টি, জুপ্ল্যাংকটন নেট ($\leq$ ৩০ M) ব্যবহার করে ৩২ টি, জুপ্লাংকটন নেট ($>$ ৩০ M) ব্যবহার করে ৩০টি নমুনা এবং মেমোথ মাল্টিনেট এর মাধ্যমে ২২টি ইকথায়োপ্ল্যাংকটন ও জেলিফিসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সার্ভে চলাকালে জাহাজে অতি সামান্য পরিসরে বিশ্লেষণ শেষে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কক্সবাজার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র ৬: FAO কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট হস্তান্তর

উপসংহার (Conclusion)

সমুদ্রে জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। দেশের নিজস্ব জরিপ ও গবেষণা জাহাজ আরভি মীনসন্ধানীর মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমের সাথে স্টেট অব দা আর্থ আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেনের সংযুক্তি মৎস্যসম্পদ জরিপ ও ওশেনোগ্রাফিক গবেষণায় নিঃসন্দেহে একটি নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেছে। সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এ জাতীয় জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ২০২১ সালে জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে আগমনের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় পুনরায় সার্ভে পরিচালনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ২০১৮ সালের ১৭ আগস্ট সম্পাদিত জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমের চূড়ান্ত রিপোর্ট ১২ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে এফএও কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পরেই সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

[২]মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (mamunbau09@yahoo.com)
[৩]ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৪]সাইদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ঃ মৎস্যচাষে নতুন বিপ্লব

Fish Farm Mechanization : Revolution in Aquaculture

ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী[১] ও মোঃ আসাদুজ্জামান[২]

Abstract

According to FAO report, Bangladesh is the 5th largest aquaculture producing country in the world. Fisheries is the most important sector for Bangladesh economy, providing 3.50% of total GDP and 25.71% of Agricultural GDP and 57% of the fish production comes from aquaculture. Fish farms are the most extensive aquaculture production unit in Bangladesh. Active and proper fish farm management is essential to maintain maximum aquaculture production level and to ensure the world demand based quality aquaculture products. Fish farm mechanization is the new concept for enhancing the aquaculture production. Long term vision of government is to increase the electricity production which can create the opportunity of electrification in the rural area of Bangladesh. This rural electrification can create a new opportunity for mechanization of fish farm. Mechanization of fish farm is mainly fish feed delivery system, water distribution and exchange system, aeration system, water quality monitoring system and other activities such as electric equipment operation, security camera, office management, etc. Mechanization of a fish farm reduces the fish farm labour and feed cost and increases the fish farm productivity along with reducing the water pollution through effective fish farm management and create another aquaculture revolution.

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্যচাষে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় অর্থাৎ চীন ও ভারতের পরই আমাদের অবস্থান। বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম (FAO, ২০১৮)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভোক্তাদের মাছ খাওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। বিবিএস-এর তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ জনপ্রতি দৈনিক গড়ে ৬২.৫৮ গ্রাম মাছ গ্রহণ করে। জিডিপি'র ৩.৫০% এবং মোট কৃষিজ আয়ের ২৫.৭১% আসে মৎস্যখাত হতে। বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউয়ের তথ্যমতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৬৯ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন-জীবিকার জন্য মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল। এ নীরব মৎস্য বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মাছচাষে ব্যাপকহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মাছচাষ একটি লাভজনক খাত হওয়ায় বড় বড় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা মৎস্যখাতে বিনিয়োগ করছে। আবাসন ও শিল্প কারখানা বৃদ্ধির কারণে দিন দিন আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই একই পুকুরে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই। মাছচাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চাষিদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সাথে অযাচিত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনামের মতো আমাদের মৎস্য খামারগুলো যান্ত্রিকীকরণ করে অধিক ঘনত্বে মাছচাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি খাত হচ্ছে কৃষিখাত। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে 'আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা-লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ' নামে একটি নতুন দফা সংযোজিত হয়েছে। সবার জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের জোগান, দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সময়মতো মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের ওপর সরকার ভর্তুকি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে এ খাতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে আজও সনাতন অদক্ষ শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে দক্ষ শ্রমিকের অভাব, তাদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং বিভিন্ন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অভাবে পরিবেশ দূষণ, মাছের রোগের বিস্তার ও মৎস্য উৎপাদন হ্রাসের

পাশাপাশি মৎস্য চাষিদের লাভের পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে বিগত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য খামারের উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে করে মৎস্য খামারিরা একদিকে যেমন লাভবান হবে তেমনি অপরদিকে দেশও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলোতে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য, পানি সঞ্চালন, অ্যারেশন, পানির গুণগতমান পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি (যেমন সিসিটিভি), অন্যান্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি (যেমন জেনারেটর, আলোর উৎস, পশুপাখি তাড়ানোর যন্ত্র) ও কর্মী ব্যবস্থাপনা মোবাইল ও ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি প্লাটফরমের মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনা সম্ভব। বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলোর যান্ত্রিকীকরণের কৌশল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ
(Mechanization of fish feed application)

মাছ চাষের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয় হলো মাছের কৃত্রিম খাবার (ভাসমান বা ডুবন্ত), যা মাছচাষের মোট খরচের প্রায় ৬০-৭০ ভাগ। প্রতিদিন নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার প্রয়োগের কথা থাকলেও চাষিরা উপযুক্ত সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অনুমান করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম কমানোর জন্য অনেক সময় এক জায়গায় খাবার প্রয়োগ করে থাকে। ফলে কখনও খাবারের স্বল্পতা আবার কখনও অধিক খাবার প্রয়োগের কারণে তা নষ্ট হয়ে পুকুরের পানি দূষিত করে এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার একটি প্রোগ্রামকৃত যন্ত্র, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এতে সকল মাছের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তবে এ প্রযুক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামও ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অটোমেটিক ফিস ফিডার মৎস্য খামারগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যবহার সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শেরপুর, ময়মনসিংহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মাদারীপুর, যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, নাটোরসহ বিভিন্ন জেলার মাছ চাষিরা এই মেশিন ব্যবহার করছে। বিভিন্ন মৎস্য খামারে এ অটোমেটিক ফিস ফিডার স্থাপন করে চাষিরা একদিকে যেমন মাছের খাদ্য প্রয়োগের হার কমাতে সক্ষম হয়েছেন, অন্যদিকে খামারে সঠিক পরিমাণে মাছের খাবার ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণের পরিমাণ হ্রাসের ফলে পুকুরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

চিত্র ১: অটোমেটিক ফিস ফিডার (বাংলাদেশ টেকনোলজি)

চিত্র২: অটোমেটিক ফিস ফিডার (চাইনিজ টেকনোলজি)

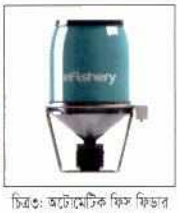

চিত্র৩: অটোমেটিক ফিস ফিডার (ইন্দোনেশিয়ান টেকনোলজি)

অটোমেটিক ফিসফিডার ব্যবহারের সুবিধা

- এ যন্ত্রটি ২-১৮ মিটার দূরত্বে ১৩০° কোণ পর্যন্ত খাবার ছড়িয়ে দিতে সক্ষম;
- যন্ত্রটি প্রয়োজনীয় বিরতিতে ও সমহারে খাবার প্রয়োগ করে, ফলে সকল মাছ সমানভাবে খেতে পারে ও তাদের মধ্যে খাবার গ্রহণের প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং মাছের আকারের তারতম্য (size variation) কম হয়;
- খাবারের অপচয় দূর করে এবং শ্রমিক নির্ভরতা কমায়;
- অতিরিক্ত খাবার পানিতে পচে নষ্ট হয় না ফলে পুকুরের পানি দূষণমুক্ত থাকে;
- পুকুরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকায় মাছ ও চিংড়ি রোগ হতে মুক্ত থাকে এবং
- অধিক ঘনত্বে মাছচাষ ও মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

অ্যারেশন ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ
(Mechanization of aeration system)

মাছ চাষের ফলে মাছের খাবার, মলমূত্রসহ বিভিন্ন জৈব পদার্থ পুকুরের তলদেশে জমা হয়, যা পঁচে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টি করে। অ্যারেশনের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে উপকারী অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ক্ষতিকর জৈব পদার্থগুলোকে ভেঙ্গে নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে পুকুরের পানিতে ছেড়ে দেয়। এতে পুকুরের পরিবেশ মাছ চাষের উপযোগী হয়। তাই অ্যারেশন মাছ চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারেশন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে অ্যানোরোবিক ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাবে এবং তা পুকুরের তলদেশের

জমা হওয়া জৈব পদার্থ ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করে যার ফলে পুকুরে খারাপ পরিবেশ সৃষ্টিসহ মাছ মারা যেতে পারে। অ্যারেশনের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন, পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ উন্নয়ন, ক্ষতিকারক অ্যালজি ব্লুম নিয়ন্ত্রণ, পানির দুর্গন্ধ দূর, মাছের রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস এবং সর্বোপরি পুকুরের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে যখন মাছ ভেসে উঠে, তখন সাধারণত চাষিরা পুকুরে নেমে সাঁতার কাটে বা বাঁশ দিয়ে পানি আন্দোলিত করে অক্সিজেন বাড়ানোর চেষ্টা করে বা অক্সিজেনের উৎস হিসেবে চাষিরা বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ (Aqua Chemicals) ব্যবহার করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগস্ত হচ্ছে। এটি পরিবেশবান্ধব এবং এতে চাষিদের ব্যয় অনেকখানিই লাঘব হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অ্যারেটর পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্যাডেল হুইল অ্যারেটর, সার্জ অ্যারেটর, সুপার অ্যারেটর, ভেনচুরি অ্যারেটর, টারবাইন অ্যারেটর, সাবমারসিবল টারবাইন অ্যারেটর, জেট অ্যারেটর ও লং আর্ম অ্যারেটর।

চিত্র ৪: বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার অ্যারেটর

প্রাথমিকভাবে একক অ্যারেটর ব্যবহার করা হলেও ানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্যাডেল হুইল ও রুট র সমন্বিত অ্যারেশনকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের সবচেয়ে কার্যকরি সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অ্যারেটর ব্যবহারের ফলে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ এর ওপর নির্ভর করে প্যাডেল হুইল অ্যারেটর এবং রুট ব্লোয়ার সাধারণত দুই ধরনের হয়; যেমন সিঙ্গেল ফেইজ (১৮০-২৪০ ভোল্ট) এবং থ্রি ফেইজ (৩৮০-৪৪০ ভোল্ট)। তবে বাংলাদেশের প্রায় ৯৫% খামারে সিঙ্গেল ফেইজ (১৮০-২৪০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকায় সিঙ্গেল ফেইজ অ্যারেটর মেশিনের চাহিদা বেশি। তাছাড়া বর্তমানে বিদ্যুৎ বিহীন এলাকায় সোলার অ্যারেটরের ব্যবহারও চালু হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সোলার অ্যারেটর ব্যয়বহুল মনে হলেও বিদ্যুৎ বিল ও অবকাঠামোগত খরচ হিসেব করলে তা দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়সাশ্রয়ী। মৎস্যচাষ যান্ত্রিকীকরণের অংশ হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদের মাঝে প্রায় ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ)টি প্যাডেল হুইল এ্যারেটর বিতরণ করা হয়। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)'-এর আওতায় যশোর ও খুলনা জেলায় মাছ চাষিদের পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু এ্যারেটর ও ফিস ফিডার স্থাপন করা হয়েছে।

অ্যারেটর ব্যবহারের উপকারিতা

- পুকুরের সংখ্যা না বাড়িয়ে একই জায়গায় অধিক ঘনত্বে মাছচাষ এবং মাছের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে;
- পুকুরের ক্ষতিকারক জৈব পদার্থ ভেঙ্গে তা পুষ্টি উপাদানে পরিণত করার পরিবেশ তৈরি এবং অ্যালগ্যাল ব্লুম নিয়ন্ত্রণ করে;
- রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ থেকে মাছ ও চিংড়িকে রক্ষা করে;
- পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস দূর করে;
- অ্যারেটর ব্যবহার করলে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও মাছ খাবার গ্রহণ করে; এবং
- অল্প সময়ে মাছের অধিক বৃদ্ধি হয়, তাই মাছচাষের সময়কাল কমে আসে।

কেইস স্টাডি-০১

৩ (তিন) একর বিশিষ্ট একটি তেলাপিয়া চাষের মৎস্য খামারে ফিস ফিডার ও অ্যারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খাবারের পরিমাণ ও ব্যয়, শ্রমিক ব্যয় সাশ্রয় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের চিত্র

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি থোক	৯০,০০০
পোনা (শতাংশে ৩০০ টি হারে) ১ টাকা হারে বছরে ২টি চক্র	১,৮০,০০০
শ্রমিক ২ জন ১২০০০ টাকা হারে ১ বছর	২,৮৮,০০০
অন্যান্য (জালটানা, বাজারজাতকরণ)	৫০,০০০
মাছের খাবার (এফসিআর ১.৪ হারে) প্রতিকেজি খাবার ৫০ টাকা হারে মোট ৮৩.৯১৬ মে.টন খাবার লাগবে যার দাম	৪১,৯৫,৮০০
মোট খরচ	৪৮,০৩,৮০০
মাছ বিক্রি (প্রতিটি মাছ ৩৩৩ গ্রাম হারে) ১১০ টাকা/কেজি দরে মোট ৫৯.৯৪ মে.টন	৬৫,৯৩,৪০০
মোট লাভ	**১৭,৯০,০০০**

যান্ত্রিকীকরণের ফলে ১ম বছর আয় ও ব্যয়

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি (থোক)	৯০,০০০
পোনা (শতাংশে ৩০০ টি হারে) ১ টাকা হারে বছরে ২টি চক্র	১,৮০,০০০
শ্রমিক ১ জন ১২০০০ টাকা হারে ১ বৎসর (যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে শ্রমিক হ্রাস)	১,৪৪,০০০
অন্যান্য (জালটানা, বাজারজাতকরণ)	৫০,০০০
মাছের খাবার (২০% কম লাগবে ফিডার ও অ্যারেটর ব্যবহারের ফলে) প্রতি কেজি খাবার ৫০ টাকা হারে মোট ৬৭.১৩৮ মে.টন খাবার লাগবে যার দাম	৩৩,৫৬,৬৪০
২ টি ফিডার মেশিনের দাম (৩০০০০ টাকা হারে)	৬০,০০০
২ টি ফিডার মেশিনের ১ বৎসরের বিদ্যুৎ খরচ (২ ঘন্টা X ৩৩০দিন X ০.১২ কিলোওয়াট X ৬ টাকা প্রতি কিলোওয়াট হারে X ২ টি মেশিন)	১,৯০০
২ টি অ্যারেটর মেশিনের দাম (৩৫০০০ টাকা হারে)	৭০,০০০
২ টি অ্যারেটর মেশিনের ১ বৎসরের বিদ্যুৎ খরচ (৮ ঘন্টা X ৩৩০দিন X ১.৫ কিলোওয়াট X ৬ টাকা প্রতি কিলোওয়াট হারে X ২ টি মেশিন)	৪৭,৫২০
মোট খরচ	৪০,০০,০৬০
মাছ বিক্রি (প্রতিটি মাছ ৩৩৩ গ্রাম হারে) ১১০ টাকা/কেজি দরে মোট ৫৯.৯৪ মে. টন	৬৫,৯৩,৪০০
মোট লাভ (১ম বছর)	**২৫,৯৩,৩৪০**

- যান্ত্রিকীকরণের ফলে ১ম বৎসর ২০% উৎপাদন খরচ কমানো যায়
- যান্ত্রিকীকরণের ফলে ২য় বৎসর ২৪% উৎপাদন খরচ কমানো যায়

কেইস স্টাডি-০২

সিরাজগঞ্জ জেলার মাছচাষি জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পাভেল তার পুকুরে অ্যারেটর, রুটস ব্লোয়ার এবং অটোমেটিক ফিসফিডার ব্যবহার করে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করে লাভবান হচ্ছেন। তাকে দেখে অনেকেই খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মাছচাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তিনি আড়াই বিঘা (৮২.৫ শতাংশ) পুকুরে ২৬ হাজার রুইজাতীয় মাছের পোনা দিয়েছেন অর্থাৎ প্রতি শতাংশে তিনি ৩১৬টি পোনা ছেড়েছেন। তিনি ইতোমধ্যে

যান্ত্রিকীকরণের ফলে ২য় বছরের আয় ও ব্যয়

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি (থোক)	৯০,০০০
পোনা (শতাংশে ৩০০ টি হারে) ১ টাকা হারে বছরে ২টি চক্র	১,৮০,০০০
শ্রমিক ১ জন ১২০০০ টাকা হারে ১ বৎসর (যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে শ্রমিক হ্রাস)	১,৪৪,০০০
অন্যান্য (জালটানা, বাজারজাতকরণ)	৫০,০০০
মাছের খাবার (২০% কম লাগবে ফিডার ও অ্যারেটর ব্যবহারের ফলে) প্রতি কেজি খাবার ৫০ টাকা হারে মোট ৬৭.১৩৮ মে.টন খাবার লাগবে যার দাম	৩৩,৫৬,৬৪০
২ টি ফিডার মেশিনের ১ বছরের বিদ্যুৎ খরচ (২ ঘন্টা X ৩৩০দিন X ০.১২ কিলোওয়াট X ৬ টাকা প্রতি কিলোওয়াট হারে X ২ টি মেশিন)	১,৯০০
২ টি অ্যারেটর মেশিনের ১ বছরের বিদ্যুৎ খরচ (৮ ঘন্টা X ৩৩০দিন X ১.৫ কিলোওয়াট X ৬ টাকা প্রতি কিলোওয়াট হারে X ২ টি মেশিন)	৪৭,৫২০
মেশিনগুলোর মেরামত ও সংরক্ষণ	১৫,০০০
মোট খরচ	৩৮,৮৫,০৬০
মাছ বিক্রি (প্রতিটি মাছ ৩৩৩ গ্রাম হারে) ১১০ টাকা/কেজি দরে মোট ৫৯.৯৪ মে.টন	৬৫,৯৩,৪০০
মোট লাভ (২য় বছর)	**২৭,০৮,৩৪০**

তার পুকুর হতে ১০,১২০ কেজি মাছ বিক্রি করেছেন। তার পুকুর হতে হেক্টর প্রতি কার্প মাছের উৎপাদন ৩০ টন। তিনি তার পুকুর যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই সফলতা অর্জন করেছেন।

পানির গুণাগুণ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি
(Water analysis test kits)

সাফল্যজনক মাছচাষের পূর্বশর্ত হলো মাছের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু নিবিড় বা আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষ করার ফলে যে দূষক পদার্থ তৈরি হয় তা পানির গুণাগুণের অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন-pH, অক্সিজেন, তাপমাত্রা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট ডিজিটাল মেশিনের মাধ্যমে শনাক্তকরণ এবং পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। একইভাবে এ সেন্সর হতে প্রাপ্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হয়। ফলে চাষিরা বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। পানির এসব গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন অ্যারেটর এবং ব্লোয়ার ব্যবহার করে পানির গুণাগুণ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং মৎস্য খামারের জৈব নিরাপত্তা (bio-safety) নিশ্চিত করা যায় এবং সেন্সরসমূহ অটোমেশন করে দূর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যায়।

পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা ও চুন প্রয়োগের যান্ত্রিকীকরণ
(Automation of water exchange system and liming)

নিবিড় ও আধা-নিবিড় মাছচাষে পানি পরিবর্তন প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতির

মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন প্রয়োগ ও পানি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের ফলে সৃষ্ট দূষক পদার্থসমূহ দুর করে পুকুরের পানির পরিবেশগত গুণাগুণ উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের রোগের প্রাদুর্ভাবও কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের মৎস্য খামারের পুকুরগুলোতে সাধারণত পাম্পের মাধ্যমে পানি পরিবর্তন করা হয়। এই পানি উত্তোলন ও নিষ্কাশনের পাম্পগুলোকে ডিজিটাল টাইমারের সহায়তায় অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব। চুন প্রয়োগের সনাতন পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক পদ্ধতিতে অল্প সময়ে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে সহজেই এই কাজটি করা সম্ভব। এর ফলে মৎস্যচাষে শ্রমিক নির্ভরতা কমে আসবে।

ছোট আকারের ডুবন্ত ও ভাসমান খাবার তৈরির পিলেট মেশিন ব্যবহার

মাছ চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম খাবারের পরিমাণ ও খরচ অনেক বেশি। মোট খরচের সিংহভাগই খাবার খরচ এবং বিভিন্ন কোম্পানির মানহীন খাবারের কারণে বিভিন্ন সময় মৎস্য চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই চাষিরা যদি ক্ষুদ্র পরিসরে এই মেশিন ব্যবহার করে ডুবন্ত ও ভাসমান মৎস্য খাদ্য উৎপাদন করে তাহলে একদিকে যেমন খাবার খরচ বাঁচবে অন্যদিকে খাবারের মান ভালো হবে।

অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাকুয়া মেডিসিন, অ্যাকোয়া কেমিক্যাল ও প্রোবায়োটিকের ক্ষতিকর ব্যবহার থেকে উত্তরণের জন্য যান্ত্রিকীকরণ

মাছচাষে ব্যবহৃত কেমিক্যাল পরিবেশ ও মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এর ব্যবহার যত কম করা যায় ততই মঙ্গল। কেমিক্যাল মিশ্রিত এই পানি পরিবেশে মিশে দূষণের পাশাপাশি উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া অধিক মুনাফা লাভের আশায় এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে ঔষধ কোম্পানি ও চাষিরা মৎস্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নিয়ে অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করছে যা এই সেক্টরের জন্য হুমকিস্বরূপ। সম্প্রতিকালে অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে চাষি পর্যায়ে প্রোবায়োটিক এর ব্যবহার শুরু করা হয়। কিন্তু যুক্তরাজ্যের স্টারলিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণায় দেশে ব্যবহৃত বেশ কিছু ভেজাল প্রোবায়োটিকস শনাক্ত করা হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক পরিবেশ ও মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক হওয়ায় প্রোবায়োটিক ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং এতেও ভেজাল থাকায় সামগ্রিক মাছচাষ হুমকির মুখে পড়ার আশংকা রয়েছে। গবেষক দল বাজারে প্রাপ্ত প্রোবায়োটিকে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু পেয়েছেন যা দেশের মাছচাষের জন্য হুমকিস্বরূপ। যথাযথ মনিটর না থাকায় প্রোবায়োটিকসের নামে অনেক ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া আমাদের দেশে প্রবেশ করছে যা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। তাই আমাদেরকে আধুনিক পুকুর ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হবে এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পুকুরের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অ্যাকোয়াপনিক্স টেকনোলজি

অ্যাকোয়াপনিক্স হলো মাছ ও সবজির সমন্বয়ে একটি আধুনিক চাষাবাদ ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব। এটিও এক ধরনের Recirculating Aquaculture System-RAS। এ প্রক্রিয়ায় মাছের ময়লাযুক্ত পানি গাছের জন্য জৈব সার হিসেবে কাজ করে যা পানি হতে পুষ্টি উপাদান অপসারণ করে তা পুনরায় মাছ চাষের উপযোগী করে তোলে।

অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ যান্ত্রিকীকরণ (Mechanization of other equipment)

মৎস্য খামারের ব্যবস্থাপনা যেমন ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, কর্মী ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি যেমন: সিসিটিভি (CCTV) ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অটোমেশন করে মৎস্য খামারের সার্বক্ষণিক তথ্য ও চিত্র খামার উদ্যোক্তা তথা মালিক পেতে পারেন, যা খামারে তার বিনিয়োগ ফেরতের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ ছাড়া নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে GAP (Good Aquaculture Practice) ও Fish Value Chain অনুসরণ ও ডাটা সংরক্ষণ তথা ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণসহ মাছের e-marketing প্রবর্তনে অটোমেশন কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনায় বর্তমানে বাংলাদেশের সব প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে। এই বিদ্যুৎ সহজলভ্যতায় বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলোকে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব তথা ব্যয়সাশ্রয়ী, সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের (Real Time Monitoring) মাধ্যমে মৎস্য খামারের জীব নিরাপত্তা (bio-safety) নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব মৎস্য উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে মৎস্য উৎপাদন খরচ কমানো যায়। সর্বোপরি মাছের উৎপাদন উল্লম্বভাবে (vertical) বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছচাষে এক নতুন বিপ্লব ঘটানো যেতে পারে।

---

[১]উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: tanvir_h1998@yahoo.com)
[২]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় OIE কর্তৃক প্রকাশিত 'Aquatic Code' এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ

Importance and Application of 'Aquatic Code' Published by OIE on Aquatic Animal Health Management

ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান[১], নুসরাত জাহান পুনম[২] ও মোছাঃ খাদিজা বেগম[৩]

Abstract

Aquaculture continues to be the world's fastest growing food production sector. But with intensification of aquaculture, disease outbreaks increases with accidental introduction of pathogens due to movement of live aquatic animals which have caused significant losses to aquaculture production and revenues. To minimize risk of disease outbreaks and safeguard the international trade, effective measures should be in place to optimize sustainable aquaculture development. The World Organization for Animal Health (OIE- Oficina Internacional de Epizootias) has developed 'Aquatic Animal Health Code' (The Aquatic Code) that sets out standards (recommendations & protocols) for the improvement of aquatic animal health, welfare and for safe international trade of aquatic animals (amphibians, crustaceans, fish and mollusks) and their products. This code should be used for early detection, reporting, notification, control and prevention of pathogens to aquatic animals. OIE standards are based on the most recent scientific and technical information to protect animal health during production and trade. Moreover, the World Trade Organization (WTO) formally recognizes OIE as the international standard setting organization for animal health and zoonotic diseases. The Aquatic Code may be viewed and downloaded from the OIE website (www.oie.int) which is published annually.

খাদ্য উৎপাদনে জড়িত সেক্টরগুলোর মধ্যে অ্যাকোয়াকালচার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে। তাই একোয়াকালচার সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহামারী আকারে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে ও অবাধ বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সঠিকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিশ্ব সংস্থা OIE (Oficina Internacional de Epizootias) কর্তৃক 'Aquatic Animal Health Code' (সংক্ষেপে 'Aquatic Code') প্রকাশ করা হয়। এই Code জলজ প্রাণীর (যেমন ব্যাঙ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও মাছ) স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানের আদর্শ (Standards) সুপারিশমালা ও কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করে। দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, রোগের আবির্ভাব সবাইকে অবহিতকরণ, রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার জন্য এই Code প্রয়োজনীয় guideline প্রদান করে থাকে। OIE (Aquatic Animal Health Standards Commission) সবচেয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা 'স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি করে থাকে এবং প্রতিবছর তা পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংস্কার করে থাকে যাতে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তদুপরি প্রাণিস্বাস্থ্য ও জুনোটিক (zoonotic) রোগসংক্রান্ত 'স্ট্যান্ডার্ড' প্রণয়নে OIE কর্তৃক প্রকাশিত 'Aquatic Code' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এই Code প্রতিবছর www.oie.int ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় এবং প্রাণিস্বাস্থ্য সচেতন সকলের জন্য তা দেখা ও download করার ব্যবস্থা থাকে।

Aquatic Code এর সেকশন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (Different sections of Aquatic Code and its importance)

শব্দসম্ভার (glossary): শুরুতেই কোড এ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা রয়েছে যেমন Aquatic Animal (জলজ প্রাণী) বলতে বুঝায়- অ্যাকোয়াকালচার খামার বা প্রাকৃতিক উৎসের মাছ, মোলাস্ক, ক্রাস্টাসিয়া ও অ্যাম্ফিবিয়ান এর ডিম ও গ্যামেটসহ জীবনচক্রের যেকোনো ধাপ। কোডটিতে ১১ (এগার)টি সেকশন রয়েছে; প্রতিটি সেকশনে আবার কয়েকটি করে অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে প্রতিটি সেকশন এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

সেকশন ১: OIE কর্তৃক তালিকাভুক্ত জলজ প্রাণীর রোগসমূহ, তাদের নজরদারি ও অবহিতকরণ

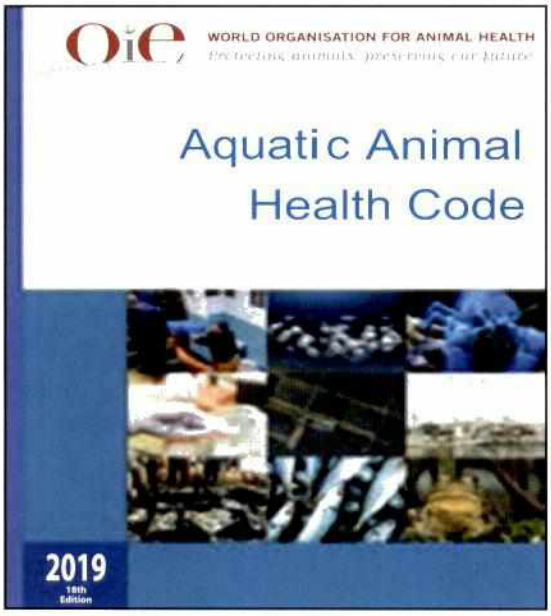

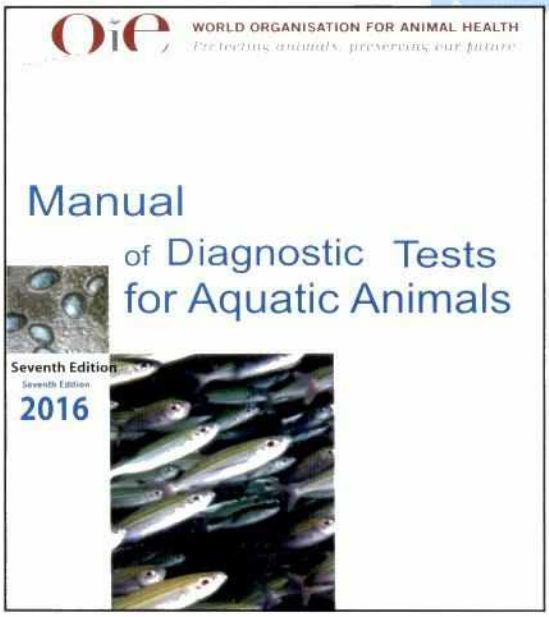

(Notification, diseases listed by the OIE and surveillance for Aquatic Animals)

জলজ প্রাণীর নানা ধরনের রোগ হয়ে থাকে কিন্তু সব রোগ সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে OIE রোগের একটি তালিকা তৈরি করে যা OIE Listed Diseases নামে পরিচিত। একটি রোগ OIE তালিকায় স্থান পেতে হলে কি কি মানদণ্ডের মধ্যে পড়তে হবে তা এ সেকশনে উল্লেখ করা আছে। অধিকন্তু নির্দিষ্ট কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে জলজ প্রাণীর তালিকা তৈরির মানদণ্ডও এ সেকশনে আছে। মূলত OIE তালিকাভুক্ত রোগসমূহের নজরদারি ও তা অবহিতকরণ (notification) এর উপায়সমূহ এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত রোগসমূহ কোনো সদস্য দেশে দেখা দিলে তা OIE-কে অবহিতকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে; যা World Animal Health Information System (WAHIS) ডাটাবেইজে প্রদর্শিত হবে। এই অবহিতকরণের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ রোগটির প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ এখানে মাছ ও চিংড়ির OIE তালিকাভুক্ত রোগসমূহ উল্লেখ করা হলো।

OIE তালিকাভুক্ত মাছের রোগ:

- Infection with Epizootic
- Haematopoietic necrosis
- Infection with *Aphanomyces invadans* (Epizootic ulcerative syndrome)
- Infection with *Gyrodactylus salaris*
- Infection with infectious salmon anaemia virus
- Infection with salmonid alphavirus
- Infectious haematopoietic necrosis
- Infection with Koi herpesvirus disease
- Infection with Red sea bream iridovirus
- Infection with Spring viraemia of carp virus
- Infection with Viral haemorrhagic septicaemia virus

OIE তালিকাভুক্ত ক্রাস্টাসিয়া/চিংড়ির রোগ:

- Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)
- Infection with *Aphanomyces astaci* (Cray fish plague)
- Infection with *Hepatobacter penaei*

(Necrotising hepatopancreatitis)

- Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus
- Infection with infectious myonecrosis virus
- Infection with *Macrobrachium rosenbergii* nodavirus (White tail disease)
- Infection with Taura syndrome virus
- Infection with white spot syndrome virus (WSSV)
- Infection with yellow head virus genotype -1 কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চল, কোনো একটি নির্দিষ্ট রোগমুক্ত (free from disease)- এই ঘোষণা (declaration) দেয়ার জন্য যেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় তাও এ সেকশনে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেকশন ২: ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk analysis)

জলজ প্রাণী এবং প্রাণিজাত দ্রব্যের আমদানিকারক দেশ বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর প্রবেশ ও ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় আমদানি ঝুঁকি বিশ্লেষণ (import risk analysis) করতে হয়। 'Aquatic code' -এর সেকশন-২ এ কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে হবে তার বর্ণনা দেওয়া আছে, যা মূলত নিম্নবর্ণিত চারটি উপাদানে বিভক্ত:

১. ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;
২. ঝুঁকি যাচাইকরণ;
৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; ও
৪. ঝুঁকি অবহিতকরণ।

সেকশন ৩: জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্যসেবাসমূহের মানদণ্ড (Quality of aquatic animal health services)

জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবাসমূহ চালুকরণ, চলমান রাখা ও মানদণ্ড নিরূপণ করে তা সকল স্টেকহোল্ডাররেদর মধ্যে অবহিতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সদস্য দেশসমূহের 'Competent Authority' কর্তৃক স্বাস্থ্যসনদ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবাসমূহের এই মানদণ্ড সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সদস্য দেশসমূহের অনুরোধে OIE-এর বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবাসমূহের মান যাচাই করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ ও দ্বি-পক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানিকারক দেশ কর্তৃক রপ্তানিকারক দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান যাচাই করতে পারে।

সেকশন ৪: রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার (Disease prevention and control)

রোগজীবাণু প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য OIE কর্তৃক বিভিন্ন 'Standards' প্রণয়ন করা হয়েছে। উপায়সমূহের মধ্যে রয়েছে-

- জোনিং (Zoning);

  কম্পার্টমেন্টালাইজেশন(Compartmentalization);
- জীবাণুমুক্তকরণ (Disinfection of aquaculture establishments, equipment and eggs);
- কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা (Contingency planning);
- ফ্যালোইং (Fallowing in aquaculture);
- জলজ প্রাণীর বর্জ্য নিষ্কাশন (Handling, disposal and treatment of aquatic animal waste); এবং
- খাদ্যে জীবাণুর উপস্থিতি প্রতিরোধকরণ (Control of pathogenic agents in aquatic animal feed)।

সেকশন ৫: আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রক্রিয়া ও স্বাস্থ্যসনদ প্রদান (Trade measures, import/ export procedures and health certification)

আমদানি-রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্যসনদ প্রদানের প্রক্রিয়া ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ এই সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে। সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক একই ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য স্বাস্থ্য সনদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্যসনদ যতটা সম্ভব সবার বোধগম্য করে তৈরি করতে হবে (as

simple as possible); যাতে ভুল ব্যাখ্যার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত না হয়। আমদানি-রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আমদানিকারক দেশের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে রপ্তানিকারক দেশের 'Competent Authority' কর্তৃক অনুমোদিত অফিসিয়াল স্বাস্থ্যসনদ ইস্যু ও স্বাক্ষর করবেন। নির্দিষ্ট প্রাণী ও প্রাণিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে OIE তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট রোগজীবাণুকে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যসনদ প্রদান করতে হবে।

সেকশন ৬: জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এর ব্যবহার (Antimicrobial use in Aquatic Animals)

জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দায়িত্বশীল ও সঠিকমাত্রার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় 'Standards' এ সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে। সঠিক মাত্রার এ ধরনের এজেন্ট ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR- antimicrobial resistance) জীবাণু যাতে তৈরি হতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। AMR এখন বিশ্বব্যাপী একটি আতংকের বিষয় যা জলজ প্রাণী এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। OIE কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা প্রয়োগের মাধ্যমে AMR প্রতিরোধে অ্যাকোয়াকালচার সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সেকশন ৭: খামারের চাষকৃত মাছের সুস্থতা/কল্যাণ (Welfare of farmed fish)

প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ আহরণ অথবা অ্যাকোয়াকালচারের মাধ্যমে মাছ চাষ, যা বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তার (food security) অন্যতম অনুষঙ্গ; পক্ষান্তরে মানব কল্যাণেই নিয়োজিত। মানব কল্যাণের পাশাপাশি আমাদেরকে চাষকৃত মাছেরও সুস্থতা/কল্যাণ (welfare) নিশ্চিত করতে হবে। চাষকৃত মাছের সুস্থতা/কল্যাণের মাধ্যমেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব যা পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করে। Aquatic code এর সেকশন-৭ এ চাষকৃত মাছের সুস্থতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। পরিবহনের সময়, পরিবহনপরবর্তী পর্যায়ে, এমনকি কিভাবে মানুষের খাবারের জন্য অথবা রোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাছ মারার ক্ষেত্রে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে, তা এ সেকশনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নৈতিক অবস্থান (ethical responsibility) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেকশন ৮-১১: অ্যাম্ফিবিয়ান, ক্রাস্টাসিয়ান, মাছ ও মোলাস্ক এর রোগসমুহ (Diseases of amphibians, crustaceans, fish and mollusks)

OIE কর্তৃক তালিকাভুক্ত অ্যাম্ফিবিয়ান, ক্রাস্টাসিয়ান, মাছ ও মোলাস্ক-এর রোগসমূহের ক্ষেত্রে Aquatic code কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। তবে প্রতিটি রোগ শনাক্তকরণের প্রথাগত ও আধুনিক মলিকুলার পদ্ধতির বর্ণনা OIE কর্তৃক প্রকাশিত Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals শিরোনামের ম্যানুয়ালে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে এবং তা www.oie.int website থেকে download-এর জন্য উন্মুক্ত। OIE তালিকাভুক্ত জলজ প্রাণীর রোগজীবাণুসমূহ যাতে আমদানিকারক দেশে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়সমূহের বর্ণনা ৮ থেকে ১১ নং সেকশনগুলোতে দেয়া আছে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশসহ OIE এর সকল সদস্য দেশসমূহ এই Aquatic code নিজ নিজ দেশের জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবহার করতে পারে। উপরন্তু জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকার এই Aquatic code কে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত সকলের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে Aquatic code এর প্রয়োগে মৎস্য উৎপাদনের বিশ্বে বাংলাদেশ তার বর্তমান অবস্থান ধরে রেখে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

[২] সহযোগী অধ্যাপক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৩] প্রভাষক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৩] প্রভাষক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের অ্যাকোয়াকালচারে সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজাতিসমূহ ঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

Potential Fish Species in Bangladesh Aquaculture : Present Status and Future Initiatives

ড. কাজি ইকবাল আজম[১], শহিদুল ইসলাম ভূঞা[২] ও মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির[৩]

Abstract

Although aquaculture contributes significantly behind self-sufficiency in fish production and Bangladesh secured 5th position in world aquaculture production but still huge untapped resources like inclusion of potential fish species in Bangladesh aquaculture need to take into consideration. Potential fish species includes shoal (*Channa striatus*), cuchia (*Monopterus cuchia*), koi (*Anabas testudineus*), gang magur (*Hemibagrus menoda*), Rita (*Rita rita*), Mohashol (*Tor tor*), Vetki (*Lates calcarifer*), Parse (*Chelon subviridis*) and nuna tengra (*Mystus gulio*). An analysis on secondary data explored clearly that are present status, future challenges or initiatives and the actions of stakeholders. Present development in breeding to culture protocol of these species is in trial but resonable success have been enlisted in above all species except Mohashol. In case of feed development, no significant success was reported. Considering the potential especially consumer demand, national and international market price and overall contribution to our aquaculture fish production, inclusion of these species is urgent issue in Bangladesh. Finally, for successful inclusion, complete breeding to culture protocol should be developed mainly by active participation of DoF, research and institutional organization and signing MoUs between and among successful countries.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে মৎস্যখাত অন্যতম প্রধান অংশীদার। কেননা স্বপ্নের সোনার বাংলায় নিরাপদ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সবার জন্য কর্মসংস্থান ও সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে এ খাত সরাসরি সম্পৃক্ত। আর উল্লেখিত সূচকগুলোর কাঙ্ক্ষিতমান অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজন এখাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জলজসম্পদ ও প্রজাতির বহুমাত্রিকতার যুগোপযোগী সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ। বাংলাদেশের জলজ সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেখানে জলবায়ুগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্ভব। তাছাড়া সম্পদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মৎস্যচাষের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিগত তিন দশকে বেড়েছে ৪ গুণ (চিত্র ১); যা স্থায়িত্বশীল করতে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি এর কার্যকরি সম্প্রসারণ অপরিহার্য। আশির দশকের শেষভাগে মৎস্য অধিদপ্তরের হাত ধরে বাংলাদেশে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রুপালি বিপ্লবের যে গোড়াপত্তন ঘটে সেটি পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিম মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ অ্যাকোয়াকালচার এক্সটেনশন প্রকল্প, সেকেন্ড এডিপি, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে একটি শক্ত ভিত্তি লাভ করে এবং যার ধারাবাহিকতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে স্বংয়সম্পূর্ণতা। তখনকার মৎস্যচাষের সাথে

চিত্র ১: মৎস্যচাষের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন চিত্র (১৯৮৩-৮৪ হতে ২০১৭-১৮)

আজকের মৎস্যচাষের মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, প্রজাতি বহুমাত্রিকতা, প্রশিক্ষিত মৎস্য খামারি ও একদল দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর সম্প্রসারণ তৎপরতা। শুরুতে বাংলাদেশের মৎস্যচাষ কেবল কার্প মাছ নির্ভর হলেও সময়ের সাথে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, শিং, মাগুর এতে যুক্ত হয়। আর এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংযোজন হলো পাবদা, গুলশা, ভিয়েতনামি কৈ, ভিয়েতনামি শোলসহ আধা-লবণাক্ত পানির বেশ কিছু প্রজাতি। যদিও বেশ কিছু দেশীয় ও বৈদেশিক মৎস্য প্রজাতি অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তবুও মৎস্যচাষিরা বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। কারণ উৎপাদন কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়েই উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, অন্তঃপ্রজনন সর্বোপরি আন্তঃপ্রজনন সমস্যা বাড়ছে। তাই উৎপাদন খরচ কমানোর কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এবং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সম্ভাবনাময় নতুন প্রজাতি চাষে সম্পৃক্ত না করতে পারলে এদেশের মৎস্যচাষ শিল্পের অগ্রগতিতে ভাটা পড়বে সন্দেহ নেই। নিম্নের সারণি-১ এ প্রদর্শিত মাছগুলোকে সম্ভাবনাময় প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মৎস্যচাষে সম্ভাবনাময় প্রজাতিসমূহের তালিকা (List of potential fish species in aquaculture)

সারণি ১: পানির ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের মৎস্যচাষে সম্ভাবনাময় প্রজাতিসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পানির ধরন	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্বাদু পানি	শোল	*Channa striatus*
	কুঁচিয়া	*Monopterus cuchia*
	কৈ	*Anabas testudineus*
	গাং মাগুর	*Hemibagrus menoda*
	রিটা	*Rita rita*
	মহাশোল	*Tor tor*
আধা-লবণাক্ত পানি	ভেটকি	*Lates calcarifer*
	পারশে	*Chelon subviridis*
	নোনা ট্যাংরা	*Mystus gulio*

বর্তমান অবস্থা (Present status)

শোল (*Channa striatus*)

শোল বাংলাদেশের একটি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজাতি। শোল মাছের ম্যাক্রো পুষ্টি উপাদান এর মধ্যে কম চর্বি (২.০৮%), উচ্চমাত্রার আমিষ (৩৮.৩২%) ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খনিজ লবণ (০.০২৬৫%) রয়েছে। উল্লেখিত পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ যেমন-অস্টিওআথ্রাইটিসজনিত ব্যথা উপশম ও ক্ষত শুকানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকাসহ নানাবিধ কারণে এটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য (Mat *et al.*, ১৯৯৪)। উচ্চ বাজারমূল্য, অনন্য স্বাদ ও ঔষধি চাহিদার কারণে মাছটি বাংলাদেশের মৎস্যচাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হওয়ার দাবিদার। কিন্তু মাছটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে না থাকায় এর স্থান দখল করেছে ভিয়েতনামি শোল। চাহিদা ও বাজারমূল্যের কথা মাথায় রেখেই কিছু বাণিজ্যিক হ্যাচারি মালিক ভিয়েতনামি শোল

মাছ আমদানির পর কৃত্রিম প্রজননেও সফল হয়েছেন। কিন্তু শোল মাছ জীবিত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল, আর জীবিত খাদ্য অপ্রতুল এবং ব্যয় সাপেক্ষ। তাই দ্রুত দেশি শোল মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন এবং সুষম পুষ্টিসম্পন্ন কৃত্রিম বাণিজ্যিক খাদ্য উৎপাদন করতে পারলেই কেবল নিশ্চিত হবে চাষিবান্ধব শোল মাছ চাষ পদ্ধতি।

রিটা (*Rita rita*)

রিটা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। আবাসস্থল ধ্বংস, প্রজনন ও লালনক্ষেত্র নষ্ট হওয়া, অতিআহরণ ও আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে এ মাছের প্রাচুর্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে মাছটি IUCN কর্তৃক সংকটাপন্ন ঘোষিত হয়েছে। কম চর্বি (১.০১-২.৭০%), উচ্চমাত্রার আমিষ (১৭.২২-১৯.৫৫%) ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খনিজ লবণ (০.৮৯-১.০৭%) সমৃদ্ধ মাছটির অনন্য স্বাদ ও উচ্চ

বাজার মূল্যের কারণে এটি বাংলাদেশের মৎস্যচাষে উজ্জ্বল সম্ভবনাময় একটি প্রজাতি। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছটির প্রাচুর্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে বিধায় এই মুহূর্তে বদ্ধ পানিতে মাছটিকে অভ্যস্তকরণ এবং কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন অপরিহার্য। আশার কথা মাছটির কৃত্রিম প্রজনন, রেণু লালন ও পোনার বেঁচে থাকার ওপর বিভিন্ন খাদ্যের প্রভাব বিষয়ে গবেষণায় প্রাথমিক সফলতা

পাওয়া গেছে। তবে চাষিবান্ধব চাষ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনে অধিকতর গবেষণার পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তরের অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োজন।

কৈ *(Anabas testudineus)*

উচ্চ বাজারমূল্য ও অনন্য স্বাদের লোভনীয় কৈ অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির মাছ যা বৈরী পরিবেশ যেমন কম অক্সিজেন, তাপমাত্রার পরিবর্তন ও অধিকতর দূষিত পানিতেও টিকে থাকতে পারে। মাছটির কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হওয়ায় ব্যাপক ভোক্তা চাহিদাসম্পন্ন এই মাছটিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

দেশি কৈ মাছের পোনা না পাওয়া গেলেও মাছটির উল্লেখিত গুণাগুণ, উচ্চ বাজারমূল্য ও অনন্য স্বাদের কারণে বিগত এক যুগেরও বেশি সময় থাই কৈ ও পরবর্তীতে ভিয়েতনামি কৈ আমাদের দেশের মৎস্যচাষে অন্যতম প্রধান প্রজাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু চাষিদের অতি মুনাফা প্রবণতা, চাষের পুকুরসমূহের পরিবেশগত অবক্ষয়, যত্রতত্র অন্তঃপ্রজননের কারণে ভোক্তা পর্যায়ে জনপ্রিয় থাই কৈ বাংলাদেশের মৎস্যচাষ থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে থাই কৈ মাছের স্থান ভিয়েতনামি কৈ দ্বারা পূরণের চেষ্টা করলেও এর আকার ও পরিবহণের সময় আঁইশ উঠে ক্ষত দৃশ্যমান হওয়ার কারণে তা থাই কৈ এর স্থান দখল করতে ব্যর্থ হয়। তাই গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয় এই মাছটির দেশীয় প্রজাতিটি মৎস্যচাষে নিয়ে আসা সময়ের দাবী। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে মাছটির পোনার প্রাপ্যতা।

গাং মাগুর *(Hamibagrus menoda)*

ঈষৎ হলুদাভ এই মাছটির স্থানীয় নাম রাম ট্যাংরা, ঘাগলা, কাউন মাগুর অথবা গাং মাগুর। বাংলাদেশের হাওর অধ্যুষিত জেলার বিভিন্ন নদীতে এ

মাছের বিস্তৃতি। জলমহালসমূহের স্বল্পমেয়াদি ইজারা প্রথার কারণে এই মাছের প্রাচুর্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে মাছটি IUCN কর্তৃক সংকটাপন্ন ঘোষিত না হলেও প্রাপ্যতা খুবই কম। স্বাদ ও উচ্চ বাজার মূল্য বিবেচনায় বাংলাদেশের মৎস্যচাষে গাং মাগুর একটি সম্ভাবনাময় প্রজাতি হতে পারে এবং এর জন্য প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে মাছটিকে বদ্ধ পানিতে অভ্যস্তকরণ, কৃত্রিম প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন। ইতোমধ্যেই মাছটির প্রজননবিদ্যা ও বদ্ধ পানিতে অভ্যস্তকরণোর ওপর গবেষণা হয়েছে (Jega *et al.*, 2018) এবং প্রজননে প্রাথমিক সফলতাও পাওয়া গেছে।

মহাশোল *(Tor tor)*

বাংলাদেশের Cyprinidae পরিবারভূক্ত মাছসমূহের মধ্যে অনন্য স্বাদের মাছ হচ্ছে মহাশোল। এর দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর ঐতিহ্যের কারণে মাছটি সাধারণ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। অতীতে

মহাশোল সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও দিনাজপুর জেলার পাহাড়ী নদীতে এবং কাপ্তাই হ্রদে পাওয়া যেত। কিন্তু ইদানিং মাছটি কেবল নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী নদীতেই সীমিত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। তাই মাছটিকে সংরক্ষণের উদ্যোগ হিসেবে দ্রুত কৃত্রিম প্রজননের আওতায় এনে চাষের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আশার কথা অতিসম্প্রতি গবেষণায় মাছটিকে বদ্ধ পানিতে অভ্যস্ত করা, প্রজননকাল নির্ধারণ ও শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন সম্ভব হয়েছে যা মাছটির চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কুঁচিয়া *(Monopterus cuchia)*

খাবার মাছ হিসেবে কুঁচিয়া বাংলাদেশে স্বীকৃত না হলেও সীমিত পরিসরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিকট বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও চাহিদা রয়েছে। রোগীর পথ্য হিসেবেও কুঁচিয়ার ব্যবহার সমাদৃত। মুক্ত জলাশয় থেকে আহরণের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে বিক্রয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় প্রজাতি হিসেবে মৎস্যচাষে কুঁচিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই 'বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুঁচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পিএইচডি গবেষকদলও ব্রিডিং ও নার্সিং পর্যায়ে অনেক সফলতা পেয়েছেন। তবে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদনের লক্ষ্যে

কৃত্রিম খাদ্যে অভ্যস্তকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভেটকি *(Lates calcarifer)*

বিশ্বব্যাপী অন্যতম বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ এ প্রজাতি বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্যচাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। চাষের ক্ষেত্রে নতুন হলেও পুষ্টিমান, স্বাদ ও ঘ্রাণ, কম কাঁটাযুক্ত, দ্রুত বর্ধনশীল অধিক মাংসযুক্ত, উচ্চ বাজারমূল্য ও সুস্বাদু হওয়ায় ভোক্তা সাধারণের কাছে এর চাহিদা ব্যাপক। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডে ভেটকির কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবিত হয় এবং পরবর্তীতে ফিলিপাইন, হংকং, সিংগাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাছটির কৃত্রিম প্রজনন কৌশল অধিকতর উন্নত হয়। বাংলাদেশে শুধুমাত্র কিছু নার্সারিতে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত নিষিক্ত ডিম ও রেণু লালন করে আঙ্গুলে পোনা উৎপাদন করা হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত পোনা মজুদ করে সনাতন ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে ভেটকি চাষ শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দেশের বাজারে ভেটকির সুষম খাবার। চাষিকে স্থানীয়ভাবে জীবন্ত খাবার (তেলাপিয়া/সিলভার কার্প জাতীয় পোনা) এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

নোনা ট্যাংরা *(Mystus gulio)*

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলাশয়ে বেড়ে ওঠা নোনা ট্যাংরার লবণাক্ততার সহনশীলতার পরিসর ব্যাপক। মাছটি উপকূলীয় অঞ্চলের নদী বিশেষ করে বরিশাল ও চাঁদপুরের বিভিন্ন নদী, শাখা নদী ও সংযুক্ত খালে পাওয়া যায়। স্থানীয় ভোক্তা সাধারণের চাহিদা পূরণ ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র বিবেচনায় প্রজাতিটি উপকূলীয় মৎস্যখাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশার কথা মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাছটির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মাছটির কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

করেছে যা মাছটি চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। তবে মাছটি প্লাংকটন জাতীয় খাবার হতে অন্য খাবারে অভ্যস্ত হতে একটি জটিল সময় পার করে বিধায় কুসুম (Yolk) নিঃশেষিত রেণু পোনার নার্সিং খুবই স্পর্শকাতর। লবণাক্ততা সহনশীলতার পরিসর ব্যাপক হওয়ায় নোনা ট্যাংরা আধা-লবণাক্ত পানির পাশাপাশি স্বাদু পানিতেও চাষ করা সম্ভব।

পারসে *(Chelon subviridis)*

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলাশয়, মোহনা ও ম্যানগ্রোভ সোয়াম্পে বাস করা Mugillidae পরিবারের লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা সহিষ্ণু মাছটির স্থানীয় নাম পারসে বা বাটা। উন্নত গুণের আঁশ, উচ্চ বাজার মূল্য এবং অধিক পরিসরে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা সহিষ্ণু হওয়ায় আন্তঃজোয়ারীয় পুকুরসমূহে চাষের ক্ষেত্রে মাছটি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে চাষিরা ঘেরে পোনা মজুদের

জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল। উপকূলীয় মৎস্যচাষে সম্ভাবনাময় এই প্রজাতিটিকে সংরক্ষণ ও এর উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। অতীতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কেবল প্রাকৃতিক উৎসের পোনা দিয়ে চিংড়ির সাথে এর উৎপাদন সম্ভাব্যতার ওপর গবেষণা করেছিল। সম্প্রতি বদ্ধ জলাশয়ে এই মাছটির কৃত্রিম প্রজননে প্রাথমিক সফলতা এসেছে বলে জানা যায় (Saha and Kabir, 2014)। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে আধা-লবণাক্ত পানির ঘের/পুকুরসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃত্রিম প্রজনন,

নার্সারি ব্যবস্থাপনা, চাষ পদ্ধতি নির্ধারণ ও চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণে আশু উদ্যোগ আবশ্যক।

ভবিষ্যৎ করণীয় (Future initiatives)

মৎস্যচাষে বাংলাদেশের সফলতার পেছনে রয়েছে একদল দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর দীর্ঘ সময়ের নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনভিত্তিক গবেষণা, চাষি কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা সর্বোপরি মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত মৎস্যচাষবান্ধব বিভিন্ন নীতি, আইন ও বিধি। তাই বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মৎস্যচাষের অর্জনকে স্থায়িত্বশীল করতে প্রয়োজন বিদ্যমান প্রজাতিসমূহের সঠিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সম্ভাবনাময় নতুন প্রজাতির সন্নিবেশ। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (চাষি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য অধিদপ্তর) সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক অ্যাকশন প্ল্যান। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে:

- **ব্রিডিং টু কালচার প্রোটোকল:** মৎস্যচাষে সম্ভাব্য প্রজাতিসমূহের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল থেকে শুরু করে চাষ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত চাষিবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রতিটি সম্ভাবনাময় প্রজাতির ব্রিডিং টু কালচার প্রোটোকল উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

- **প্রজাতিভিত্তিক হ্যাচারি স্থাপন:** মাছের প্রজনন আচরণের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে বিশেষায়িত হ্যাচারি নির্মাণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহের অবকাঠামোকে বিন্যাস করা যেতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রজাতির ব্রিডিং টু কালচার প্রোটোকল বিষয়ে প্যাকেজ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে।

- **প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন:** গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের জন্য উন্নত গবেষণাগার স্থাপনের ওপর নজর দিতে হবে।

- **প্রযুক্তি সম্প্রসারণে দক্ষ জনবল তৈরি:** প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরকে দক্ষ জনবল তৈরিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ সেলকে পূর্ণাঙ্গ সেলে রূপান্তরিত করে বিশেষায়িত মডিউল ও প্রশিক্ষক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক চুক্তির পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

- **সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়:** বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যচাষ সম্ভাব্যতা নিরূপণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মৎস্যখাতের সকল অংশীজনের সমন্বয় সাধন।

- **প্রজাতিভিত্তিক খাদ্য তৈরি:** মৎস্যচাষের প্রধান কয়েকটি নিয়ামকের অন্যতম হচ্ছে মৎস্য খাদ্য। মৎস্যচাষের স্থায়িত্বশীলতার জন্য প্রজাতিভিত্তিক অ্যামাইনো এসিড নির্ভর সুষম বাণিজ্যিক খাদ্য উৎপাদন সময়ের দাবী। মৎস্যখাদ্য কোম্পানিগুলোকে প্রজাতিভিত্তিক মাছের গ্রহণোপযোগী মৎস্য খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজনবোধে আইনানুগভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে ।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্যচাষে প্রজাতির বহুমাত্রিকতা, প্রজাতি সংরক্ষণ ও উৎপাদন জোরদার করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের যুগপোযোগী ও প্রয়োজন নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় প্রজাতিসমূহের ব্রিডিং টু কালচার প্রোটোকল উদ্ভাবন মৎস্যচাষে নতুন প্রজাতি অন্তর্ভূক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেহেতু ব্রিডিং টু কালচার প্রোটোকল উদ্ভাবন স্থান, কাল ও প্রজাতিভেদে ভিন্ন এবং বাংলাদেশে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। সেহেতু অচিরেই আমাদের মৎস্যচাষে সম্ভাবনাময় প্রজাতিসমূহের অন্তর্ভুক্তি ঘটবে বলে আশা করা যায়। তাই এসডিজি সূচকসমূহের ৩৯+১ কার্যক্রমে এলাকাভিত্তিক সম্ভাব্য প্রজাতিগুলোকে নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে মৎস্যখাত নাতিদীর্ঘ সময়েই একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

[১]উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (kaziiqbalazam@yahoo.com)
[২]সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
[৩]সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নেত্রকোনা

শীলা কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা
Mud Crab Hatchery and Nursery Management

মাসুদা খানম[২], সমীর কুমার সরকার[২] ও বিমল জ্যোতি চাকমা[৩]

Abstract

Bangladesh has widespread opportunities of mud crab culture in the coastal area. Culture of crab in the coastal communities can provide employment and export earning opportunities for the country. In Bangladesh, there are several species of mud crab in the coastal and mangrove area in which *Scylla olivacea* is the major species. Now a days crab farming is continuing by collecting lean crab or small crab from wild source. For this reason wild stock of crab population has been declining significantly. Hence, an integrated facility for growing mud crab from hatchery to nursery and then grow-out was established by DoF in Kolatoli, Cox's Bazar. Mud crab hatchery operation is followed by live food production, brood-stock management and larval rearing, feeding and nursery management. In every step of production bio-security and intensive care has been maintained. Documentation has been needed for the whole production procedure and it will take 25- 30 days for crablet production. For the crablet production suitable ranges of salinity 28 -32 ppt, temperature 27-30 °C, dissolved oxygen ≥5 ppm, pH 7.5-8.5 and treated sea water through cholorination and UV. In initial run maintaining all procedure in the mud crab hatchery about 1, 44,000 number of crablet is produced from the *S. olivacea* species. After refinement of the technology survival rate of crablet has been increased from 2% to 8%. The Department of Fisheries has planned to disseminate the technology after refinement based on the conditions in the site.

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারনে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় শীলা কাঁকড়া চাষ চাষিদের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এর ভূমিকা আশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশে শীলা কাঁকড়ার প্রধান প্রজাতির নাম হচ্ছে *Scylla olivacea* ।

বিগত কয়েক বছর ধরে উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্লাস্টিক খাঁচায় কাঁকড়ার সাথে তেলাপিয়া এবং নরম খোলসের (soft-shell) কাঁকড়া উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস (wild caught) হতে সংগৃহীত ছোট কাঁকড়া বা জুভেনাইল

চিত্র ১ : *Scylla olivacea*

মোটাতাজাকরণের প্রধান উৎস হওয়ায় কাঁকড়ার পর্যাপ্ততা ক্রমহ্রাসমান। ফলস্বরুপ দেশে কাঁকড়ার স্থায়িত্বশীল ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের জন্য কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন অত্যাবশ্যক। সরকারিভাবে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে একটি শীলা কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র ২)। উক্ত হ্যাচারিতে ক্র্যাবলেট উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সফলভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর উন্নততর লাগসই প্রযুক্তি কাঁকড়া চাষে আগ্রহী চাষি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কাঁকড়া হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কাঁকড়া হ্যাচারির মূল হ্যাচারি ইউনিট ও লাইভ ফুড প্রস্তুতকরণ ইউনিটে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কাঁকড়া হ্যাচারির মূল

চিত্র ২: কাঁকড়া হ্যাচারি, কলাতলী, কক্সবাজার।

হ্যাচারি ইউনিট ও লাইভ ফুড প্রস্তুতকরণ ইউনিটে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয় যাতে কোনো প্রকারের সংক্রমণ সংঘটিত হতে না পারে। কাঁকড়া হ্যাচারির কোনো এক পর্যায়েও যদি সংক্রমণ ঘটে তবে সম্পূর্ণ চক্রের উৎপাদন বিনষ্ট হতে পারে। কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এর বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. লবণ পানি ব্যবস্থাপনা;
২. প্রাকৃতিক খাদ্য ও আর্টেমিয়া চাষ;
৩. ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা; এবং
৪. লার্ভা প্রতিপালন।

১. লবণ পানি ব্যবস্থাপনা (Salt water management)

কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার জন্য লবণ পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাচারিতে জ্যাবলেট উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম ২৮-৩২ পিপিটি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত লবণাক্ত পানি প্রয়োজন। জোয়ারের সময় পাম্পের মাধ্যমে সাগরের পানি রিজার্ভার-১ এ মজুদ করা হয় (চিত্র ৩)। ১৮-২৪ ঘন্টা পর উপরিভাগের পরিষ্কার পানি রিজার্ভার-২ এ স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর পানি পাম্পের সাহায্যে বালি ও পাথর দিয়ে প্রস্তুতকৃত ফিল্টার (sand filter) দিয়ে ফিল্ট্রেশনের পর পরিষ্কার পানি রিজার্ভার-৩ এ রাখা হয়। এরপর রিজার্ভার-৩ এ পানি জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ক্লোরিনেশন (১৫-২০ গ্রাম/টন) করা হয়। পানি হতে ক্লোরিন দূরীকরণের জন্য ১৮-২৪ ঘন্টা তীব্র অ্যারেশন দেওয়া হয়। দ্রুত ক্লোরিন দূর করার জন্য ক্লোরিনের সমহারে (১৫-২০ গ্রাম/টন) সোডিয়াম থায়োসালফেট প্রয়োগ করা হয়। এরপর জীবাণুমুক্ত পানি পাম্পের সাহায্যে ওভারহেড ট্যাংকে উত্তোলন করা হয়। হ্যাচারির হ্যাচিং ইউনিট ও লাইভ ফুড ল্যাবরেটরিতে কার্টিজ ও ইউভি ফিল্টার (cartridge & UV) (চিত্র ৪) দিয়ে পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও হ্যাচারি ধৌতকরণের জন্য ওভারহেড ট্যাংক হতে স্বাদু পানি সরবরাহ করা হয়।

চিত্র ৩: রিজার্ভার ও ওভারহেড ট্যাংক

চিত্র ৪: Cartridge এবং UV ফিল্টার

২. প্রাকৃতিক খাদ্য ও আর্টেমিয়া চাষ (Live food and artemia culture)

ক. প্রাকৃতিক খাদ্য চাষ

কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন অত্যাবশ্যক। শীলা কাঁকড়ার জইয়া/লার্ভা এর প্রধান খাদ্য হলো রটিফার (*Brachionus* sp.)। কাঁকড়ার স্পনিং এর পর উৎপাদিত জইয়া-কে প্রথম খাদ্য হিসেবে রটিফার দেওয়া হয়। তাই হ্যাচারিতে কাঁকড়ার হ্যাচিং-এর পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণ রটিফার উৎপাদন করা অত্যাবশ্যক। রটিফার উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শৈবাল যেমন ন্যানোক্লোরাম (*Nanochlorum* sp.) এবং টেট্রাসেলমিস (*Tetraselmis* sp.) চাষ করা হয় যা, রটিফারের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে লাইভ ফুড ল্যাবরেটরিতে কনিক্যাল ফ্লাস্ক অথবা সাদা পাত্রে পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র শৈবাল যেমন ন্যানোক্লোরাম (*Nanochlorum*) এবং টেট্রাসেলমিস (*Tetraselmis*) চাষ করা হয়। এসময় ল্যাবরেটরির তাপমাত্রা ২০-২৫^0 সে. এর মধ্যে রাখা হয়। ল্যাবরেটেরিতে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত লবণাক্ত (২৫-৩০ পিপিটি) পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র শৈবালের খাবার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সার (অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। পাত্রে যখন শৈবালের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তখন ল্যাব থেকে বের করে হ্যাচারির লাইভ ফুড কালচার ইউনিটে স্থানান্তর করে বড় পাত্রে (৩০ লিটার) চাষ করা হয়। তারপর আবার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা অ্যালগাল ট্যাঙ্কে (২ টন) স্থানান্তর করা হয় (চিত্র ৫)। একইভাবে রটিফার চাষ করা হয়। ক্ষুদ্র শৈবাল ও রটিফার প্লাঙ্কটন নেট (৫০-৬৫ ক্রস) দিয়ে ছেকে সংগ্রহ করা হয় (চিত্র ৬)। কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইভ ফুড উৎপাদনের জন্য ১৮-২০ দিন সময় প্রয়োজন।

খ. আর্টিমিয়া চাষ

আর্টিমিয়া অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার যা ক্যানের মধ্যে সিস্ট (Cyst) আকারে বাজারজাত করা হয়। ৩-৪ গ্রাম সিস্ট/লিটার হারে জীবাণুমুক্ত লবণ পানিতে ১৮-২৪ ঘণ্টা তীব্র অ্যারেশনের মাধ্যমে সিস্ট হতে আর্টিমিয়া নপ্লি উৎপাদিত হয় (চিত্র ৭)। ক্ষুদ্র সাইজের নেট (১২০-১৫০ ক্রস) ব্যবহার করে আর্টিমিয়া নপ্লি সংগ্রহ করা হয়।

গ. ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা (Brood stock management)

১. ব্রুড নির্বাচন

প্রাকৃতিক উৎস হতে বড় সাইজের স্ত্রী কাঁকড়া ব্রুড হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। হ্যাচারিতে প্রতিটি ন্যূনতম ২০০ গ্রাম বা তার চেয়ে বড় আকারের সুস্থ-সবল পরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রতি ১২-১৬টি ব্রুড কাঁকড়া হতে ১টি কাঁকড়া ডিম ছাড়বে হিসেব করে প্রয়োজনীয় ব্রুড মজুদ করা হয়।

২. ব্রুড পরিবহন

নির্বাচিত ব্রুড হ্যাচারিতে পরিবহনের সময় সতর্কতা

চিত্র ৫: ল্যাবে ও হ্যাচারির ট্যাংকে ন্যানোক্লোরাম (*Nanochlorum*) এবং টেট্রাসেলমিস (*Tetraselmis*) এর চাষ

চিত্র ৬: প্লাঙ্কটন নেট দিয়ে প্রাকৃতিক খাবার সংগ্রহ

চিত্র ৭: আর্টিমিয়া চাষ

অবলম্বন করতে হয় যেন কোনোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। পা বাঁধা অবস্থায় কিছুক্ষণ পর পর লবণ পানি ছিটিয়ে ব্রুড পরিবহন করা হয়। যদি প্রকৃতি থেকে ফ্ল্যাপে ডিম বের হয়েছে এমন ব্রুড পাওয়া যায় তবে সেটি জীবাণুমুক্ত লবণাক্ত পানিতে অর্ধেক ডোবানো অবস্থায় হ্যাচারিতে পরিবহণ করা হয়।

৩. ব্রুড প্রতিপালন

সংগৃহীত স্ত্রী কাঁকড়া হ্যাচারিতে আনার পর হ্যাচারির পরিবেশের সাথে কিছুক্ষণ খাপ খাওয়ানো হয়, তারপর সেগুলো জীবাণুনাশক দ্রবণে (৩% ফরমালিন) ৩০ মিনিট গোসল করিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয় (চিত্র ৮)। পরিবহন জনিত পীড়ন হতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসার পর কাঁকড়ার ওজন ও আকার পরিমাপ করে প্রতিটি ব্রুড ট্যাগিং করে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র ৯)। প্রতিটি স্ত্রী কাঁকড়ার প্রজনন সক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য মূলত ট্যাগিং করা হয়। ব্রুড হিসেবে লালন-পালনের পর স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব কাঁকড়ার ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয় না সেসব কাঁকড়া উত্তপ্ত চিমটার সাহায্যে একপার্শ্বীয় চক্ষুবৃন্ত অ্যাবলেশন করে ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতা আনা হয় (চিত্র ১০)। ব্রুড কাঁকড়া ফ্ল্যাপে ডিম না আসা পর্যন্ত বালির স্তর বিছানো কংক্রীট ট্যাংকে অ্যারেশন দিয়ে লালন-পালন করা হয় (চিত্র ১১)। কংক্রীট ট্যাংকের তিন ভাগের দুই ভাগ জায়গায় ৫-৬ ইঞ্চি পুরুত্বে বালি থাকে এবং অবশিষ্ট জায়গা ফাঁকা থাকে। ৫

চিত্র ৮: ৩% ফরমালিন দ্রবণে জীবাণুমুক্তকরণ

চিত্র ৯: ব্রুড কাঁকড়া চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত ট্যাগিং

চিত্র ১০: একপার্শ্বীয় চক্ষুবৃন্ত অ্যাবলেশন করার পদ্ধতি

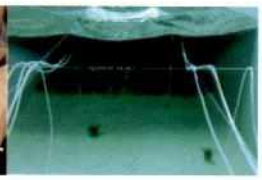

চিত্র ১১: বালির স্তর বিছানো ব্রুড কাঁকড়া মজুদ ট্যাংক

টন পানি ধারণ ক্ষমতার একটি ব্রুড ট্যাংকে ১২-১৫টি ব্রুড কাঁকড়া মজুদ করা যায়। কাঁকড়ার ব্রুডকে খাদ্য হিসেবে দেহ ওজনের ৫% হারে ছোট মাছ, স্কুইড বা শামুক- ঝিনুক এর মাংস ইত্যাদি দেওয়া হয়। ট্যাংকের খালি জায়গায় সকালে ৫০% এবং বিকেলে অবশিষ্ট ৫০% খাবার দেওয়া হয়। এছাড়াও কাঁকড়ার আত্মরক্ষা ও আশ্রয়স্থল হিসেবে ৩-৪ ইঞ্চি ব্যাসের পিভিসি পাইপ ছোট ছোট করে কেটে দেয়া হয়।

৪. হ্যাচিং

ফ্ল্যাপে ডিম আসার পর ব্রুড কাঁকড়াকে স্পনিং ট্যাংকে মজুদ করা হয়। পরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়ার ফ্ল্যাপে ডিম আসার পর হ্যাচিং পর্যন্ত ৯-১১ দিন সময় লাগে। ফ্ল্যাপের ডিমের রং প্রথমদিকে হলুদাভ হলেও পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে কালচে রং ধারণ করে (চিত্র ১২)। এ সময়ে ডিমগুলো ন্যূনতম ৩ বার নমুনায়ন করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডিমের হার্টবিট ২০০/মিনিট এর উপরে হলে হ্যাচিং এর জন্য উপযুক্ত হয়। *S. Oilivacea* কাঁকড়ার ডিম পরিস্ফুটনের আগ পর্যন্ত ৫টি পর্যায় অতিক্রম করে (চিত্র ১৩)। পরিপক্বতা ও সাইজের ওপর নির্ভর করে একটি ব্রুড কাঁকড়া হতে ৩-২০ লক্ষ জইয়া পাওয়া যায়। স্পনিং ট্যাংক হতে ছোট বাটি দিয়ে জইয়া সংগ্রহ করে বালতিতে অ্যারেশনসহ লবণ পানি দিয়ে রাখা হয় সাইফনিং এর মাধ্যমে ১৫০ মাইক্রন সাইজের জাল সমৃদ্ধ কাঠের বাক্সে করেও জইয়া সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলো গণনা করে লার্ভা পালন ট্যাংকে মজুদ করা হয় (চিত্র ১৪)।

ঘ. লার্ভা প্রতিপালন (Larval rearing)

হ্যাচারিতে কাঁকড়া পোনা উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো লার্ভা অবস্থায় প্রতিপালন। কাঁকড়ার লার্ভাকে জইয়া (zoea) বলা হয়। এ সময় একটি দশা হতে অন্য দশায় পরিবর্তনের সময় এবং খাদ্যর অভাবে প্রচুর পরিমাণ জইয়ার মৃত্যু ঘটে। জইয়া মোট ৫টি দশা অতিক্রম করে।

১. জইয়ার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো

প্রতিপালনের জন্য সংগৃহীত জইয়া ১০০-১৫০ জইয়া/লিটার ঘনত্বে প্লাস্টিকের ছোট গামলা বা বাটিতে করে ট্যাংকের পানিতে রাখা হয় (চিত্র ১৫)। মূলত

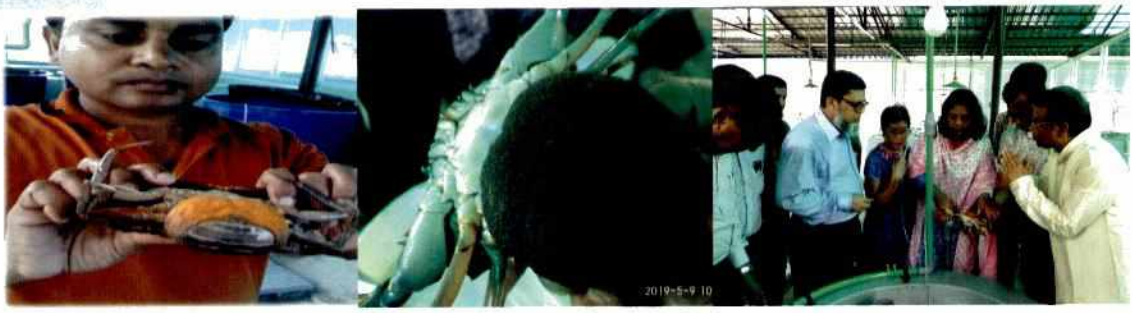

চিত্র ১২-১৪: ফ্ল্যাপে ডিম ধারণকারী পরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া

জইয়াগুলো যে ট্যাঙ্কে প্রতিপালন করা হয় তাতে ছাড়ার পূর্বে পানির তাপমাত্রার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য (acclimatize) এটি করা হয়। যখন প্লাস্টিকের ছোট গামলা বা বাটির পানি ও ট্যাঙ্কের পানির তাপমাত্রা সমান হয়, তখন জইয়াগুলোকে ট্যাংকে ছাড়া হয়।

চিত্র ১৫: লার্ভার তাপমাত্রার সাথে খাপ খাওয়ানো পদ্ধতি

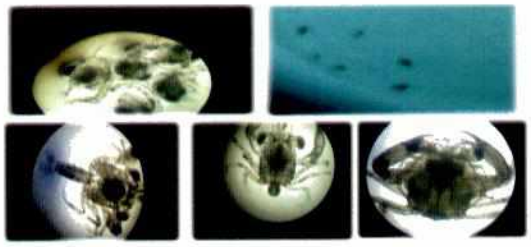

চিত্র ১৬: ক্রাবলেট উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ (জইয়া-১ হতে জইয়া-৫)

২. জইয়া এর বিভিন্ন দশা

জইয়া (zoea) (১-৫) এর ৫টি দশা অতিক্রম করার পর মেগালোপা (megalopa) দশায় উন্নীত হয়। একটি দশা হতে অন্য একটি দশায় পরিবর্তিত হতে জইয়ার গড়ে ৩দিন সময় লাগে। অর্থাৎ জইয়া-১ হতে জইয়া-৫ পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে ১৫-১৬ দিন সময় লাগে। অতঃপর জইয়া মেগালোপায় রুপান্তরিত হয় (চিত্র ১৬)। তারপর মেগালোপা (চিত্র ১৭) খোলোস পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রাব ইনস্টার (crab instar)/ ক্র্যাবলেট (Crablet) (চিত্র ১৮)-এ পরিণত হয়। হ্যাচারির পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে জইয়া-১ দশা হতে ক্র্যাবলেট এ পরিণত হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে।

৩. লার্ভা/জইয়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সদ্য হ্যাচিংকৃত জইয়ার প্রথমবার খাদ্য প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। জইয়াগুলোকে ছাড়ার পর পরই রটিফার (rotifers) খাওয়ানো হয়। রটিফার পর্যাপ্ত না পাওয়া গেলে Artemia এর নপ্লি জইয়ার খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা হয়। ট্যাঙ্কে কাঁকড়ার পোনা প্রতিপালনে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা চার্টে উপস্থাপন করা হলো। জইয়া-৫ বা মেগালোপা দশায় উপনিত হওয়ার পর পৃথক ট্যাঙ্কে স্থানান্তর করা হয়। এসময় এগুলোকে ৩-৫ দিন বয়সী বায়োমাস আর্টিমিয়া খাওয়ানো হয় এবং এর সাথে মাছের মাংস খুবই ছোট ছোট করে (Minced Fish) বা পিষে মেগালোপাগুলোকে খাওয়ানো হয় এবং এরা early crab inster বা ক্র্যাবলেট এ রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া হয়। লার্ভা অবস্থায় স্বজাতি ভক্ষণ (cannibalism) একটি বড় সমস্যা।

মাল্টি সেল পর্যায় নপলিয়ার পর্যায় চোখ সৃষ্টি পর্যায় থোরাসিক অ্যাবডোমিনাল পর্যায় বিট পর্যায় হ্যাচিং এর পূর্ব পর্যায়

চিত্র ১৩: *Scylla olivacea* ব্রুড কাঁকড়ার ডিম পরিস্ফুটন পর্যায়সমূহ

চিত্র ১৪: স্পনিং ট্যাংক হতে জইয়া সংগ্রহ এবং গণনাকরণ।

প্রতিপালন ট্যাঙ্কে জাল বা খড়ের আশ্রয় (সামুদ্রিক শৈবালের আকৃতিতে) স্থাপন করা হয়।

৪.৪ লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের পানি ব্যবস্থাপনা

লার্ভা প্রতিপালন ট্যাঙ্কের পানির গুণগতমানের ওপর নির্ভর করে প্রতি ২-৩ দিন পর পর ২০-৫০% পানি পরিবর্তন করা হয়। সম্পূর্ণ পরিশোধিত জীবাণুমুক্ত সামুদ্রিক পানি (৩০-৩২ পিপিটি) লার্ভা পালনের কাজে ব্যবহার করা হয়। লার্ভা পালনকালে পানির প্যারামিটারসমূহের কাঙ্ক্ষিত সীমা (range) সারণি ১ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১ : লার্ভা পালনকালে পানির প্যারামিটারসমূহের কাঙ্ক্ষিত সীমা

প্যারামিটার	কাঙ্ক্ষিত সীমা
তাপমাত্রা	২৭-৩০ ডিগ্রী সে.
লবণাক্ততা	২৮-৩২ পিপিটি
দ্রবীভূত অক্সিজেন	≤ ৫ পিপিএম
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
Unionized এমোনিয়া	≤ ১ পিপিএম
নাইট্রাইট	≤০.১ পিপিএম

নার্সারি ব্যবস্থাপনা (Nursery management)

হ্যাচারি এবং গ্রোআউট পর্যায়ের মধ্যবর্তী পর্যায় হল

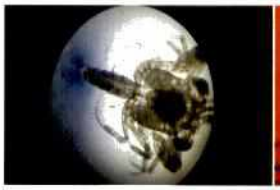

চিত্র ১৭: মেগালোপা (Megalopa)

চিত্র ১৮: প্রায় ১ সেমি আকারের ক্রাবলেট

নার্সারি। হ্যাচারি হতে প্রাপ্ত ক্রাবলেট, গ্রোআউট পুকুরে মজুদের পূর্বে কাঙ্ক্ষিত আকার ধারণ না করা পর্যন্ত নার্সারি পুকুরে স্থাপিত জালের হাপায় প্রতিপালন করা হয়। নার্সারি ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক. পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের তলা সমান করে রোদে শুকানো হয়। পাম্পের মাধ্যমে সাগরের পানি নার্সারি পুকুরে মজুদ করা হয়। এরপর রোদের সময় আগের দিন ভেজানো চুন আধা কেজি/শতাংশ হারে প্রয়োগ করা হয়। চুন প্রয়োগের দুই থেকে তিন দিন পর ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের কয়েক দিনের মধ্যে পানির রং এর পরিবর্তন না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করা হয়। পুকুরের পানির রং সবুজাভ হলে পুকুর নার্সারি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হয়।

ট্যাংকে কাঁকড়া প্রতিপালনে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা চার্ট

কার্যক্রম	দিন	০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ~ ৪৫
	পর্যায়	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 মেগালোপা ক্রাব ইন্সটার
খাবার		
রটিফার*		১৫-২০ টি/মিলি
আর্টিমিয়া*		০.৫-১. টি/মিলি নতুন হাচড আর্টিমিয়া
		০.৫ টি/মিলি ৩-৫ দিন বয়সী আর্টিমিয়া
তৈরি খাবার		২.২৫ গ্রাম/টন/দিন + ০.২৫ গ্রাম বৃদ্ধি/ধাপ
মাছ		পর্যন্ত খাবার দিনে ২বার
অতিরিক্ত ক্ষুদ্রকায় শৈবাল খাবারে যুক্তকরণ		১ ০০ ০০০-২ ০০ ০০০ কোষ/মিলি
পানি পরিবর্তন		২০-৫০% প্রতি ২-৩ দিন পরপর
Prophylaxis		জইয়া মজুদের পর এবং মেগালোপা পর্যায়ের আগ পর্যন্ত প্রতিবার পানি পরিবর্তনের পর

* যদি পর্যাপ্ত রটিফার না পাওয়া যায় তবে এর পরিবর্তে আর্টিমিয়া ছোট স্টেইন অথবা ছাতাকৃতি আর্টিমিয়া ব্যবহার করা যাবে।
** উচ্চমাত্রার অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের নির্যাস দিয়ে আর্টিমিয়া দ্রুত সমৃদ্ধ করা যায়।

খ. জাল দিয়ে নার্সারি প্রস্তুতকরণ

নার্সারি পুকুরে জাল দিয়ে হাপা প্রস্তুত করে নার্সারি ব্যবস্থাপনা করা হয়। ১ মি.মি. ফাঁস বিশিষ্ট জাল দ্বারা নির্মিত হাপাগুলো সাধারণত আয়তাকার বা বর্গাকৃতির হয়। এক্ষেত্রে হাপার তলার উপরিভাগের আয়তন ১২ বর্গমিটার (৪x৩ মি.) এবং গভীরতা কমপক্ষে ১-১.২ মিটার হয়। বাঁশের খুঁটি স্থাপন করে হাপার উপরে শেড নির্মাণ করলে রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং গরমের সময় পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

গ. ক্র্যাবলেট মজুদ

সাধারণত ৩০-৫০টি/বর্গমিটার হারে ক্র্যাবলেট (১ সেমি এর ছোট আকার) মজুদ করা হয় (চিত্র ১৯)। ক্র্যাবলেটগুলো সরাসরি নার্সারি পুকুরেও জালের হাপা ব্যতীত মজুদ করা যায়। ক্রাবলেটগুলোকে সরাসরি পুকুরে মজুদ করলে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

নার্সারিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ক্র্যাবলেটের মোট দেহের ওজনের ৩০% হারে কম মূল্যমানের মাছ বা খোলসযুক্ত যেকোন প্রাণির মাংসল অংশ (শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি) খাওয়ানো হয়। প্রতিটি খাঁচার ভেতরে খাবার ট্রে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে সহজে খাদ্য প্রদান করা যায় এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। দিনে দুই বার (সকালে ও বিকালে) খাবার প্রয়োগ করা হয়।

চিত্র ১৯: ক্র্যাবলেট মজুদ

নার্সারি পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনা

প্রতি সপ্তাহে ৩০% পানি পরিবর্তন করা আবশ্যক। বাষ্পীভবনের কারণে যে পরিমাণ পানি কমে যায় তা নিয়মিত পূরণ করা হয়। পানির গুণাগুণ (তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, স্বচ্ছতা ইত্যাদি) নিয়মিত পরীক্ষা করা

চিত্র ২০: ক্র্যাবলেট আহরণ

হয়। পানির গভীরতা সাধারণত ১ মিটার রাখা হয়। এভাবে ৩-৪ সপ্তাহ রাখার পরে উৎপাদিত ক্রাবলেট (২-৩ সেমি আকার) গ্রোআউট পুকুরে নেয়ার উপযোগী হয়।

আহরণ (Harvest)

আহরণের সময় প্রায় ৭০% পানি নিষ্কাশন করা হয়। জালের হাপাটিকে একদিক থেকে উপরে উঠানো হয় এবং অন্যদিকে গুটিয়ে আনা হয়। ক্রাবলেটসমূহ সাধারণত হাতে আহরণ করা হয় অথবা এক জায়গায় বেসিনের মত করে আহরণ করা হয় (চিত্র ২০)। এগুলোকে অগভীর বাক্সে অক্সিজেনেসন করে পরিবহন করা হয়।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলাশয় কাঁকড়া চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কক্সবাজার জেলার কলাতলিতে সরকারিভাবে নির্মিত কাঁকড়া হ্যাচারিতে বৈদেশিক পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালিয়ে ক্র্যাবলেট উৎপাদনে সফলতা পাওয়া গেছে। এর ফলে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করে উৎপাদিত কাঁকড়া রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির পরই কাঁকড়ার অবস্থান। সামুদ্রিক এ সম্পদকে সংরক্ষণ, অভ্যস্তকরণ (domestication) এবং টেকসইকরণ (sustainable)-এর লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী।

[১]মাসুদা খানম, উপ-প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই- মেইল: masuda1966@yahoo.com)
[২]সমীর কুমার সরকার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]বিমল জ্যোতি চাকমা, হ্যাচারি কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি ও খামারের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা

Biosecurity Management in Shrimp Hatchery and Farms

অমিতোষ সেন

Abstract

Biosecurity management is a very important factor to ensure healthy and safe commercial production of shrimp post larvae (PL) and shrimp in hatchery and farms. There are some protocols for biosecurity management systems in shrimp production industries, which deserve the pre-requisition to operate a shrimp hatchery and farm. International Organization for Animal Health (OIE- Oficina Internacionl de Epizootias) lists some specific pathogens to be excluded from the shrimp industries. However, there are some other pathogens to create serious problem in shrimp production system. To ensure safe commercial production, there is no way but to follow biosecurity protocol in shrimp hatcheries and grow-out farms.

কোন প্রাণীকে রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করার কৌশলকেই বায়োসিকিউরিটি বলা হয়। চিংড়ি চাষে বায়োসিকিউরিটির মাধ্যমে চিংড়িকে বিভিন্ন রোগজীবাণু, যেমন-ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণু থেকে রক্ষা করা হয়। চিংড়ি হ্যাচারি ও খামারে একটি কার্যকর বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও চাষ পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন; একইসাথে চাষ পরিবেশে রোগজীবাণু সংক্রমণ ও তার বিস্তার সম্পর্কিত বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য এর প্রতিটি ধাপ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কারণ যে কোন একটি ধাপ বাদ পড়লেই সমস্ত বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাই বিনষ্ট হয়।

বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও বর্তমানে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ এবং খাদ্যের গুণগতমানের কারণে চিংড়িচাষ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। চাষ পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান নিবিড়তার ফলে খামারে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটছে এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় খামারের চিংড়িকে রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করা এবং চাষিকে অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে খামারসমূহে বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

বায়োসিকিউরিটি কি (What is Biosecurity?)

ব্যবস্থাপনাধীন প্রাণী (মাদার চিংড়ি, লার্ভা বা পিএল এবং খামারের চিংড়ি) ও এর পরিবেশকে নির্ধারিত ক্ষতিকর রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ থেকে ব্যবস্থাপনাধীন পরিবেশে রোগজীবাণুর প্রবেশ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত সমন্বিত পদক্ষেপকে সামগ্রিকভাবে বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) বলা হয় (Hegngi *et. al.*, 2003)। বায়োসিকিউরিটি বলতে একক কোন কর্মকাণ্ড নয়, বরং কিছু সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সামগ্রিক অনুশীলনকে বুঝানো হয়, যার দ্বারা বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি বা খামারে যে কোনো অথবা বিশেষ কিছু রোগজীবাণুর প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা (Prevention on entry) বা উৎপাদন এলাকায় এসব রোগজীবাণুর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধপূর্বক ব্যবস্থাপনাধীন প্রাণির নিরাপত্তা বিধান করা যায়।

বায়োসিকিউরিটি প্রতিপালনের মূল ধাপ সমূহ (Key steps of bio-security):

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির উৎপাদন কার্যক্রমে বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়:

১. রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ (prevention);
২. রোগজীবাণুর সংক্রমণের প্রতিকার (control); এবং
৩. রোগজীবাণু পরিহার সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনা (contingency planning)।

এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত আটটি বিষয় বাগদা চিংড়ি উৎপাদন শিল্পে বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হ্যাচারি বা খামার পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত:

১. আবশ্যকীয় অবকাঠামো (physical infrastructure) নির্মাণ ও মেরামত;
২. অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ (facility maintenance);
৩. পানির গুণগতমান রক্ষা (water quality management);
৪. বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (waste water management);
৫. আদর্শ কর্ম পদ্ধতি (Standard Operation Procedure-SOP) অনুসরণ;

৬. হ্যাচারি বা খামারের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনায় হ্যাচাপ পদ্ধতি (HACCP apporoach) অনুশীলন;

৭. রাসায়নিক সামগ্রীর দায়িত্বশীল ব্যবহার (responsible use of chemicals); এবং

৮. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও হাইজিন (personal sanitation & hygiene) ব্যবস্থাপনা।

বাগদা চিংড়ি উৎপাদন শিল্পে হ্যাচারি এবং খামার পর্যায়ে ক্ষতিকর রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনাধীন প্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নানারকম কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. চিংড়ি হ্যাচারি পর্যায়ে মাদার চিংড়ি, লার্ভা ও পিএল'এর বায়োসিকিউরিটি বিধানের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Important biosecurity protocols for shrimp hatcheries)

১. উৎপাদনের কাজ শুরু করার পূর্বে হ্যাচারির সকল অবকাঠামো, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করতে হবে এবং শুকাতে হবে।

২. সংগৃহীত লবণাক্ত এবং স্বাদুপানির উত্তম গুণাবলি নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিকর রোগজীবাণুর উপস্থিতি নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সঠিক পদ্ধতিতে সমুদ্রের পানি এবং স্বাদুপানি শোধন করতে হবে।

৩. হ্যাচারির প্রধান ফটকে টায়ার-বাথ এবং প্রতিটি উৎপাদন ইউনিটের প্রবেশপথে ফুট-বাথ এবং হ্যান্ড-ওয়াশ এর ব্যবস্থা রাখা।

৪. বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিটের কর্মচারীগণের পারস্পরিক ইউনিট বদল না করা।

৫. হ্যাচারিতে অবাঞ্ছিত লোকজনের অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ ও ঘোরাঘুরি নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৬. ব্যবহার্য সকল সামগ্রী ব্যবহারের পূর্বে ও পরে জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করতে হবে এবং শুকাতে হবে।

৭. হ্যাচারিতে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. পিএল উৎপাদনের কাজে নির্ধারিত রোগজীবাণু থেকে মুক্ত (SPF) মাদার চিংড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৯. বাহির থেকে আগত মাদার চিংড়ি, ডিম, নপ্লি এবং পিএল হ্যাচারিতে প্রবেশ করার পূর্বে কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে PCR অথবা অনুরূপ কোন Immuno-diagnostic প্রযুক্তি অনুসরণ করতে হবে।

১০. প্রাকৃতিক উৎসের মাদার চিংড়ি সংগ্রহ, বাছাই, পরিবহন, গ্রহণ, খাপ-খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

১১. হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে মাদার চিংড়ি গ্রহণের পূর্বে, নপ্লি অবস্থায় এবং পিএল হওয়ার সাথে সাথে পিসিআর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে উৎপাদনাধীন প্রাণীর সাথে ভাইরাসের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

১২. প্রাকৃতিক এবং উন্নতমানের ফরমুলেটেড খাদ্য সরবরাহপূর্বক মাদার চিংড়ি, লার্ভা ও পিএল এর সঠিক পুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. পিসিআর দ্বারা পর্যবেক্ষণপূর্বক পিএল এর শরীরে ভাইরাসের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হ্যাচারি থেকে খামারে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল রাসায়নিক সামগ্রীর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. হ্যাচারি থেকে পরিত্যক্ত পানি ও অন্যান্য সকল ধরনের বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার পূর্বে যথাযথভাবে শোধন এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

১৬. হ্যাচারিতে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী জীবাণুঘটিত বিভিন্ন রোগের প্রকৃতি, উৎস, ঝুঁকি এবং এদের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও নির্মূল পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বিষয়ে হ্যাচারি পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. প্রতিটি কর্মকাণ্ডের তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র ১: চিংড়ি হ্যাচারির প্রবশপথে পা ধৌত করার ফুট-বাথ।

চিত্র ২: চিংড়ি হ্যাচারির প্রবশপথে গাড়ির চাকা ধৌত করার টায়ার-বাথ।

চিত্র ৩: চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করার ব্যবস্থা।

চিত্র ৪: আধানিবিড় চিংড়ি খামারের চারদিকে মশারী নেটের ঘেরা।

১৮. নির্ধারিত বিরতিতে হ্যাচারিতে উৎপাদন কর্মকাণ্ড স্থগিত (shut down) রাখতে হবে।

ঘ. খামার পর্যায়ে চিংড়ির বায়োসিকিউরিটি বিধানের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Important bio-security protocols for shrimp farms)

১. খামারের জন্য দূরদর্শিতার সাথে স্থান নির্বাচন করতে হবে।

২. রোগজীবাণুর বাহক এবং অবাঞ্ছিত প্রাণীর খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চারদিকে মশারি দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। প্রতিটি পুকুরের উপরে ভাইরাসবাহী পাখি প্রতিরোধের জন্য বার্ড-ফেন্সিং স্থাপন করতে হবে।

৩. খামারের প্রবেশপথে ফুট-বাথ এবং প্রধান ফটকে টায়ার-বাথ স্থাপন করতে হবে।

৪. খামারে ব্যবহার্য সকল সামগ্রী ব্যবহারের পূর্বে ও পরে জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করতে হবে এবং শুকাতে হবে।

৫. খামারে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. খামার এলাকায় অবাঞ্ছিত লোকজনের অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ ও ঘোরাঘুরি নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৭. খামারে মজুদ করার পূর্বে পিসিআর পর্যবেক্ষণের দ্বারা পিএল'এর শরীরে ভাইরাস ও অন্যান্য রোগজীবাণুর অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

চিত্র ৬ : আধানিবিড় চিংড়ি খামারের প্রবশপথে পা ধৌত করার ব্যবস্থা।

চিত্র ৫: আধানিবিড় চিংড়ি খামারে পুকুরের উপরে বার্ড-ফেন্সিং।

৮. মজুদ ঘনত্ব সঠিক রেখে এবং খামারের পানির সাথে উত্তমরূপে অভ্যস্ত করে পিএল মজুদ করতে হবে।

৯. মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে খামারের পানি এবং মাটি নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

১০. চিংড়ির শরীরে রোগজীবাণুর উপস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। খামারে ব্যবহার্য সকল রাসায়নিক সামগ্রীর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১১. হ্যাচারি থেকে পরিত্যক্ত পানি ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার পূর্বে যথাযথভাবে শোধন এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

১২. হ্যাচারিতে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী জীবাণুঘটিত বিভিন্ন রোগের প্রকৃতি, উৎস, ঝুঁকি এবং এদের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও নির্মূল পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বিষয়ে হ্যাচারি পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. প্রতিটি কর্মকাণ্ডের তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. উপযুক্ত প্রাকৃতিক এবং উন্নতমানের ফরমুলেটেড খাদ্য সরবরাহপূর্বক মাদার চিংড়ি, লার্ভা ও পিএল এর সঠিক পুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি বা খামারের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য বায়োসিকিউরিটি (biosecurity) ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাইরাস ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ফাংগাস ইত্যাদি ক্ষতিকর রোগজীবাণু চিংড়িসম্পদ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। তাই রোগজীবাণুমুক্ত চিংড়ি পিএল বা খামার পর্যায়ে চিংড়ি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হ্যাচারি ও খামার পর্যায়ে এসব রোগজীবাণু পরিহারপূর্বক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে হ্যাচারি ও খামারে উপযুক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে, কারণ এর কোনো বিকল্প নেই।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অব), মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

পঁয়ষট্টি দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম ঃ যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

Sixty Five Days Seasonal Fishing Ban : Justification and Its Importance

ড. মো: আবুল হাছানাত[১] ও সুমন বড়ুয়া[২]

Abstract

The advent of sophisticated under-water devices and technology, today's fishing practices show a global trend of stock depletion. Multispecies fisheries in tropical waters, particularly as found in South Asian waters, have complex dynamics and pose additional constraints for management of marine fishery resources. The imposition of season ban and/or areas to control fishing efforts is a basic management tool in fisheries dates back to centuries. Since the breeding season differs for different species, the season ban has to be calibrated at a certain critical time period that is of importance for conservation of key commercially important species. Such regulations may give rise to conflicts between different types of fishers such as industrial and artisanal as well as between different institutions governing resource use and allocation. This article presents the justification of season ban on fishing by drawing example of various countries and finally like to draw conclusions and recommendations based on fisheries management to have reasonably same ecosystem of neighboring countries.

বঙ্গোপসাগর হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র উপসাগর যেখানে সবচেয়ে বেশি নদী বিধৌত পানি প্রবেশ করে। ফলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্যসম্পদে বঙ্গোপসাগর সমৃদ্ধশালী। বাংলাদেশের দক্ষিণে টেকনাফ হতে সাতক্ষীরা পর্যন্ত ৭১০ কিমি উপকূলীয় তটরেখা এবং সমুদ্রের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone) যার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি। এদেশের সমুদ্রসীমায় প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির ছোট-বড় নানা আকারের মৎস্য ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতিরও অধিক কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবালসহ নানাবিধ জলজ সম্পদ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ক্রমাগতভাবে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা যথা- অতি আহরণজনিত কারণে সম্পদের ক্রমহ্রাসমানতা, ভূমি ও সমুদ্র হতে সৃষ্ট দূষণ সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মৎস্যকূলের প্রাচুর্য্য, বিস্তৃতি ও প্রজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদও এর বাইরে নয়। এ কারণে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকল সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে বিবেচনায় নিতে হয়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অসীম হলেও অফুরন্ত নয়। বিগত বছরগুলোর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রজাতির গুণগতমানে ক্রমশ অবনমন ঘটছে। এতে মৎস্য সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের মাঝে বিরাজ করছে সীমিত সম্পদ নিয়ে অসম প্রতিযোগিতা ও আয় বৈষম্য। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের মতো ক্রান্তিয় অঞ্চল যেখানে বিভিন্ন গিয়ার দ্বারা বহুবিধ প্রজাতির মৎস্য আহরণ করা হয় সেখানে প্রযোজ্য নয়। সেহেতু, দেশীয় বাস্তবতা ও পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। বিশাল এ জলরাশির মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করে বছরের পর বছর সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুণ্ন রাখা। মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুণ্ন রাখার পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্বিঘ্ন প্রজনন এবং তা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপযুক্ততার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করতে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ এবং বিভিন্ন সময়ে উক্ত রুলের সংশোধনী জারি করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ও বিধিমালার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি হচ্ছে মৎস্য আহরণকারী নৌযান ও গিয়ার নিয়ন্ত্রণ, জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ, ফিসিং এলাকা নির্ধারণ, মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা, ক্ষতিকর গিয়ার, বিস্ফোরক ও বিষ দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল, আইন অমান্যে দণ্ড প্রভৃতি। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নও হচ্ছে একটা কার্যকর কৌশল।

৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ সম্পর্কিত বিধি

(Legal basis of 65 days fishing ban)

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ এর ১৯ নং বিধি (এস. আর. ও নং ৯৭-আইন/২০১৫)

Rule 19. Banned Period.-In order to facilitate

spawning and the conservation of marine fisheries resources within the economic zone of Bangladesh, catch or cause to be caught of any kind or species of fish and crustaceans by all types of fishing vessels shall be banned from **20 May to 23 July each year.**

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয় হতে মৎস্য আহরণ প্রবৃদ্ধি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রতি বৎসর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন মৎস্য ও চিংড়ির প্রজনন প্রক্রিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিতকরণ নিমিত্ত সকল ধরনের বাণিজ্যিক ফিসিং ভেসেল কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় (Exclusive Economic Zone) সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়া আহরণ নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন জারি হলে তা ২০ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হয়। এছাড়া, দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১১-১২ সাল হতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রতিবছর বাংলা আশ্বিন মাসে (অক্টোবর) নির্ধারিত ১৫ দিন এবং ২০১৫ সাল হতে ২২ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ কার্যক্রম নিষিদ্ধ বলবৎ আছে।

মৎস্যের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মা মাছ রক্ষা ও নির্বিঘ্নে প্রজনন, ফিসিং এফোর্ট নিয়ন্ত্রণ এবং সমুদ্রের তলদেশীয় মাছসহ অন্যান্য জীবকূলকে অত্যধিক ট্রলিং থেকে সাময়িক রেহাই দেয়া মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম এর প্রধান উদ্দেশ্য। ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কার্যক্রমটি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলেও ২০১৯ থেকে সকল মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুরু থেকে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার এ উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের মাঝে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য মজুদ বৃদ্ধিতে মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুমের কার্যকারিতা নিয়ে তাদের মাঝে অনেক ভুল ধারণা থাকলে ও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের ফলে জেলেদের একটা বৃহৎ গ্রুপ সাময়িক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুত বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের পর থেকে অংশীজনদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং সবক্ষেত্রেই মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের উপকারিতা উঠে এসেছে। সঙ্গত কারণে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো "মৎস্য মজুদের ওপর মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের কি প্রভাব"? মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুমের প্রাসঙ্গিকতা এবং মৎস্য মজুদের ওপর বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের প্রভাব জানার লক্ষ্যে আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

বিভিন্ন দেশে মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম
(Season fishing ban in different countries)

পৃথিবীর অনেক দেশে সামুদ্রিক মৎস্যের মজুদ স্থিতিশীল রেখে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রথম বন্ধ মৌসুম শুরু হয় কেরালায় ১৯৮৮ সালে ১৫ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। অতঃপর গোয়া ও কর্ণাটকে ১৯৮৯ সালে ১০ জুন থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত, মহারাষ্ট্রে ১৯৯০ সালে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৫ সালে, গুজরাটে ১৯৯৮ সালে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িষ্যায় ২০০০ সালে এবং তামিলনাড়ুতে ২০০১ সালে শুরু হয়। ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নে সমতা আনয়নের জন্য ২০০০ সাল থেকে পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে ভারতের জলসীমায় ১৫ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এবং পশ্চিম উপকূলে অর্থাৎ আরব সাগরে ভারতের জলসীমায় ১৫ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। কিন্তু, ২০১৫ সালে এসে ভারতের পূর্ব উপকূলে তা ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মোট ৬১ দিন এবং পশ্চিম উপকূলে তা ১ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬১ দিন বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
- আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে মৎস্যের অতিআহরণ রোধে ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত মৎস্যআহরণ নিষিদ্ধ।
- চীনে বিগত ১৯৯৯ সাল থেকে দক্ষিণ চীন সাগরে ১৬ মে থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত ৭৮ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, চীনের ২য় দীর্ঘতম নদী হোয়াং হো (Yellow river) ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- শ্রীলংকায় লবস্টার এর প্রজনন সময়ে (ফেব্রুয়ারি, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর) মাসে লবস্টার আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- থাইল্যান্ড আন্দামান সাগরের নিজস্ব জলরাশিতে প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ০৩ মাস মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করেছে।
- ওমানে কিংফিসের প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ অক্টোবর মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিশ্বের অনেক মৎস্য আহরণকারী দেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রায় ১০০ বছর ধরে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের একটা চিত্র নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি ১: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বন্ধ মৌসুম

দেশ	সময়কাল	বন্ধ মৌসুম
ব্রাজিল	৩ মাস	১৫ অক্টোবর-১৫ জানুয়ারি
যুক্তরাষ্ট্র (টেক্সাস)	২ মাস	১৫ মে-১৫ জুলাই
যুক্তরাজ্য	৩ মাস	জানুয়ারি-মার্চ
নেদারল্যান্ড	২.৫ মাস	১৫ ফেব্রুয়ারি-৩০ এপ্রিল
কেনিয়া	৪ মাস	নভেম্বর-মার্চ
মাদাগাস্কার	৩ মাস	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি
গায়ানা	২ মাস	অক্টোবর-নভেম্বর
সিয়েরা লিওন	১ মাস	এপ্রিল
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪ মাস	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি
সৌদি আরব	৫ মাস	১৫ আগস্ট-১৫ জানুয়ারি
বাহরাইন	৪ মাস	১ মার্চ-৩১ জুলাই
নিউজিল্যান্ড	৯.৫ মাস	১ নভেম্বর-১৪ আগস্ট
অস্ট্রেলিয়া (কুইন্সল্যান্ড)	১৯৮৫ সাল থেকে এরিয়া ক্লোজার	সারা বছর
ইন্দোনেশিয়া (মালাক্কা ও জাভা)	১৯৮০-২০০৯ ট্রলিং বন্ধ	সারা বছর

বন্ধ মৌসুম নির্ধারণে প্রজনন ও প্রবেশনের গুরুত্ব: (Importance of spawning and recruitment in deciding the season of fishing ban)

এটা মনে করা হয় বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ মৎস্য প্রজাতি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এপ্রিল-জুন মাসে প্রজননে অংশগ্রহণ করে। এসময় ভারি বৃষ্টিপাত এবং পরিবেশ প্রজননের অনুকূলে থাকে বলে ধরা হয়। মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম নির্ধারণে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ভারতের পূর্ব উপকূল এবং বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূল যেহেতু বঙ্গোপসাগরের প্রায় একই ইকোসিস্টেম ধারণ করে সেহেতু ভারতের পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মাছের প্রজনন

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ মাছের প্রজনন সময় বছরে ছয় মাস বা তারও বেশি। গ্রীষ্মণ্ডলীয় অঞ্চলের মাছসমূহের এটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ প্রজনন সময়ের একটা নির্দিষ্ট সময় প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনা করলেও একেকটা মৎস্য প্রজাতির প্রধান প্রজনন মৌসুম আলাদা-আলাদা সময়েই হয়। সেহেতু, প্রজনন সময় ও প্রবেশন বন্ধ মৌসুম নির্ধারণে একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। তবে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বন্ধ মৌসুম নির্ধারণে মৎস্যের অতিআহরণ (Over fishing) নিয়ন্ত্রণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বন্ধ মৌসুম সময়কাল (The experience of coastal fishers in deciding the season of fishing ban)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী যারা ঠেলা জাল (push net) দিয়ে চিংড়ি পোনা ধরে এবং মোহনা বেহুন্দি জাল, খুঁটি জালসহ অন্যান্য জাল দিয়ে উপকূলের কাছাকাছি ও মোহনায় মাছ ধরে তাদের প্রায় ৩০০ জনের সাথে ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকার এবং মুঠোফোনে কথা বলে জানা যায় বাংলা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চিংড়ি পোনার সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাদা মাছের পোনা এবং ছোট মাছ বেশি ধরা পড়ে। অর্থাৎ, এপ্রিলের ৭/৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে জুন মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত। প্রতিবেশী দেশ ভারতের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের প্রায় একই ইকোসিস্টেমে মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন হচ্ছে এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে জুনের ১৪ তারিখ পর্যন্ত। যেহেতু, একেক মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম একেক সময়ে তাই বাংলাদেশের উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ, মৎস্যের অতি আহরণ রোধ এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের প্রায় সম-ইকোসিস্টেমে অবস্থিত ভারতের পূর্ব উপকূলের সাথে সমতা রেখে একই সময়ে অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন করলে তা এতদ্অঞ্চলে মৎস্য মজুদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মৎস্য মজুদের ওপর বন্ধ মৌসুমের প্রভাব (Impact of ban on fish stock)

সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ তথা উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্ধ মৌসুমের প্রভাব নিরূপণে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে অন্তত ১০-১২ বছর বন্ধ মৌসুম আরোপের পূর্বে ও পরে মৎস্য আহরণ জরিপ পরিচালনা করা। উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং এতদবিষয়ে গবেষণা ব্যতীত কোনরূপ উপসংহার বা বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রদান সমীচিন হবে না। তবে প্রথমবারের মত ২০১৫-১৬ সালে বন্ধ মৌসুম বাণিজ্যিক ট্রলারে কার্যকর হলেও ২০১৯-২০ সালে তা সকল সমুদ্রগামী মৎস্য নৌযান অর্থাৎ আর্টিসেনাল মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রেও পরিচালিত হচ্ছে। বন্ধ মৌসুম কার্যকর হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় বিগত বছরগুলোতে যেমন ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ট্রলারকর্তৃক আহরিত মৎস্যের ক্যাচ লগ পর্যালোচনায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে, এ বৃদ্ধির জন্যে উল্লেখিত বছরসমূহে ট্রলার সংখ্যা ও ফিসিং দিবস বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক ট্রলারে হাইটেক প্রযুক্তি তথা সোনার, ট্রল আই সংযোজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতে মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল হতে পরবর্তী ৪৫-৬০ দিনের জন্য মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের ফলে বন্ধ মৌসুমের অব্যবহিত পরবর্তী ২-৩ মাস তলদেশীয় মাছের রিক্রুটমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও দীর্ঘ মেয়াদে মজুদ পুনরুদ্ধারে এর প্রভাব এখনও নির্ণয় হয়নি। তবে নিষিদ্ধ

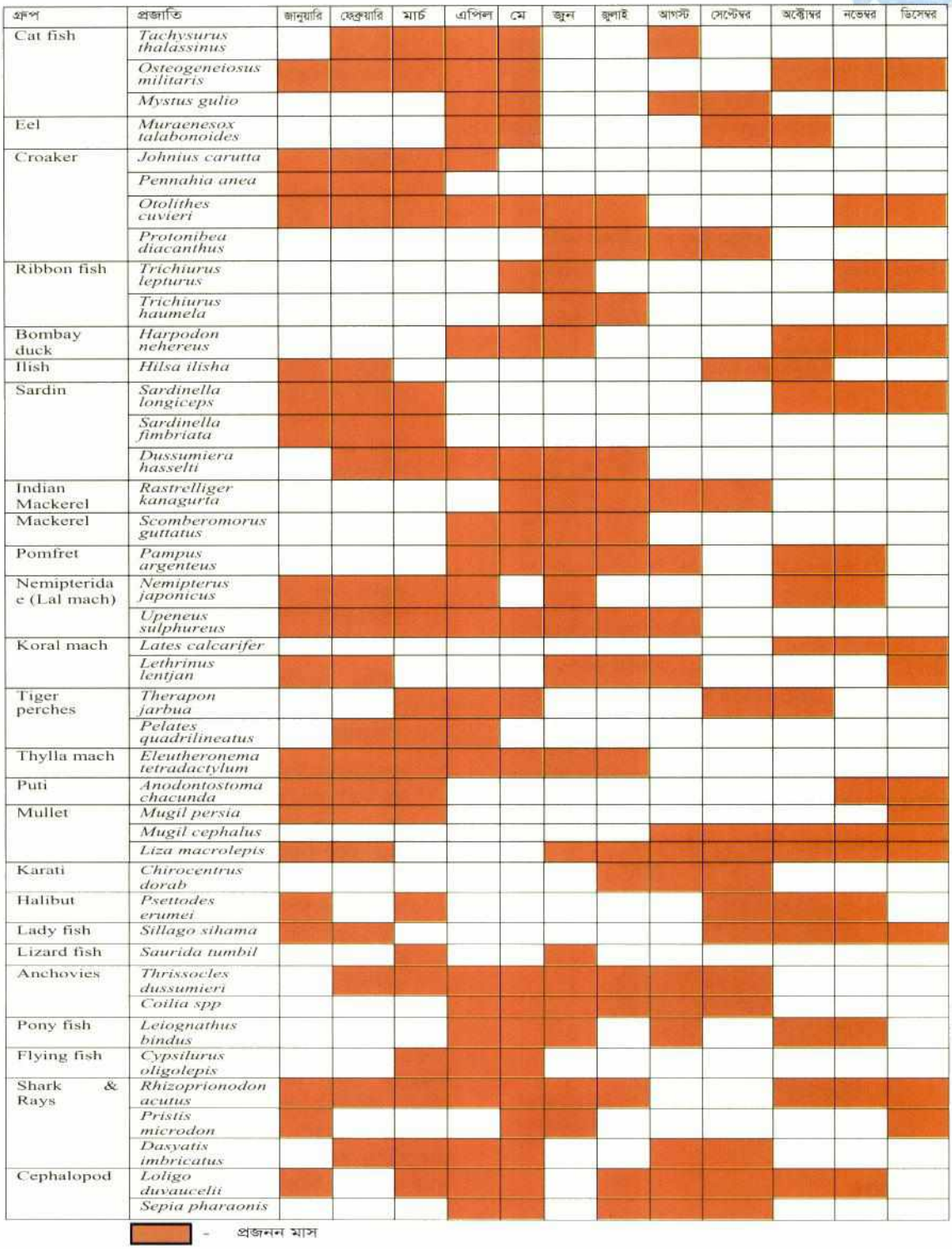

গ্রুপ	প্রজাতি	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
Cat fish	*Tachysurus thalassinus*		■	■	■	■			■				
	Osteogeneiosus militaris	■	■	■	■	■					■	■	■
	Mystus gulio				■	■			■	■			
Eel	*Muraenesox talabonoides*				■	■				■	■		
Croaker	*Johnius carutta*	■	■	■	■								
	Pennahia anea	■	■	■									
	Otolithes cuvieri	■	■	■	■	■	■	■				■	■
	Protonibea diacanthus						■	■	■	■			
Ribbon fish	*Trichiurus lepturus*					■	■					■	■
	Trichiurus haumela						■	■					
Bombay duck	*Harpodon nehereus*				■	■	■				■	■	■
Ilish	*Hilsa ilisha*	■	■							■	■		
Sardin	*Sardinella longiceps*	■	■	■							■	■	■
	Sardinella fimbriata	■	■	■									
	Dussumiera hasselti		■	■	■	■	■	■					
Indian Mackerel	*Rastrelliger kanagurta*					■	■	■	■	■			
Mackerel	*Scomberomorus guttatus*				■	■	■	■					
Pomfret	*Pampus argenteus*				■	■	■	■	■		■	■	
Nemipteridae (Lal mach)	*Nemipterus japonicus*	■	■	■	■		■				■	■	
	Upeneus sulphureus	■	■	■	■	■	■	■	■				
Koral mach	*Lates calcarifer*										■	■	■
	Lethrinus lentjan	■	■				■	■	■				■
Tiger perches	*Therapon jarbua*			■	■	■				■	■		
	Pelates quadrilineatus		■	■	■								
Thylla mach	*Eleutheronema tetradactylum*	■	■	■	■	■	■	■					
Puti	*Anodontostoma chacunda*	■	■	■								■	■
Mullet	*Mugil persia*	■	■	■									■
	Mugil cephalus								■	■	■	■	■
	Liza macrolepis	■	■				■	■	■	■	■	■	■
Karati	*Chirocentrus dorab*							■	■	■			
Halibut	*Psettodes erumei*	■		■						■	■	■	
Lady fish	*Sillago sihama*	■	■							■	■	■	■
Lizard fish	*Saurida tumbil*			■			■						
Anchovies	*Thrissocles dussumieri*		■	■	■	■	■	■	■	■			
	Coilia spp				■	■	■	■	■	■			
Pony fish	*Leiognathus bindus*				■	■	■		■		■	■	
Flying fish	*Cypsilurus oligolepis*			■	■	■							
Shark & Rays	*Rhizoprionodon acutus*	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■
	Pristis microdon	■				■	■						■
	Dasyatis imbricatus		■	■	■	■			■	■			
Cephalopod	*Loligo duvaucelii*	■		■	■	■		■	■	■	■	■	
	Sepia pharaonis				■	■		■	■	■			

■ - প্রজনন মাস

চিত্রঃ বঙ্গোপসাগরে ভারতের পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির প্রজনন সময় (বিভিন্ন প্রকাশিত উৎস থেকে সন্নিবেশিত)।

মৌসুম বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত ফিসিং এফোর্ট নিয়ন্ত্রিত থাকায় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যের রিক্রুটমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রলার সংস্থা এবং স্কীপারবৃন্দ নিষিদ্ধ মৌসুমে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এ আইনটি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও আহরণে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ট্রলার সংস্থাগুলো তাদের ট্রলারগুলোর বার্ষিক মেরামত, ডকিং সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

৬৫ দিন বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন বিষয়ে অংশীজন অভিমত:
(Stakeholder's opinion on 65 days fishing ban)

পঁয়ষট্টি দিন (২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত) মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন যেমন

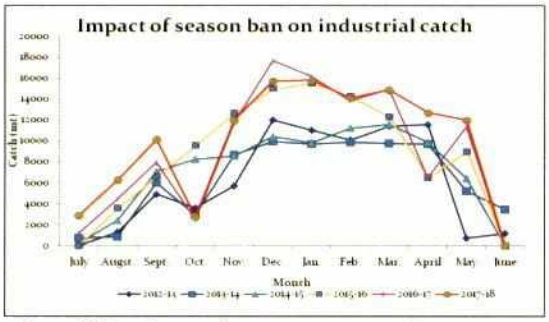

চিত্র: বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুমের প্রভাব

ট্রলার মালিক, স্কীপার, নাবিক, এসোসিয়েশন, নৌযান মালিক, জেলে, চিংড়ি হ্যাচারি মালিক, ম্যানেজার, টেকনি-সয়ান, বাগদা চিংড়ি চাষি, রপ্তানিকারক, সাধারণ নাগরিক, জনপ্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী এবং অন্যান্যসহ সর্বমোট ৪২৯ জনকে নিয়ে বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিচালিত এক সমীক্ষায় যে মতামত প্রদান করেন যা নিম্নরূপ :

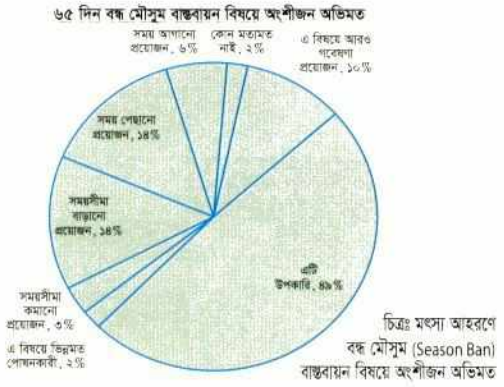

চিত্র: মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম (Season Ban) বাস্তবায়ন বিষয়ে অংশীজন অভিমত

সুপারিশমালা
(Recommendations)

* বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও আধুনিক ডিভাইস সংযোজনের মাধ্যমে ফিশিং এফোর্ট বৃদ্ধি ও ফিশিং দিবস বৃদ্ধির কারণে মৎস্যের পরিমাণগত বৃদ্ধি হলেও গুনগতমানের অবনমন মৎস্যের অতিআহরণ নির্দেশ করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিশিং বন্ধ তাই বার্ষিক ফিশিং এফোর্ট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে;
* প্রজননের পাশাপাশি মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম মৎস্যের গুণগতমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে বিধায় সমসংখ্যক আহরণে অধিক মূল্য সংযোজন হয়;
* সামুদ্রিক মৎস্য মজুদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় বন্ধ মৌসুম এককভাবে কোন কার্যকর ব্যবস্থা না হলেও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাপনা যেমন মৎস্য নৌযান নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং, জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ, ফিশিং এফোর্ট এবং ট্রলারের ধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের সংখ্যা ও ক্যাপাসিটি নিয়ন্ত্রণ, আহরণে মৎস্য প্রজাতিসমূহের সর্বনিম্ন আকার নির্ধারণ প্রভৃতি বিধিবিধান সম্বলিত মৎস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ;
* আর্টিসেনাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল উভয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত গভীরতায় ফিশিং এবং অনুমোদিত ফাঁস অপেক্ষা ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিতকরণে মেরিটাইম সংস্থাসমূহের মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স (MCS) কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
* বিভিন অংশীজনের মধ্যে সমতা আনয়নে কো-ম্যানেজমেন্ট, ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (EAFM) প্রবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে;
* বাংলাদেশের উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ আমলে নিয়ে অধিক সংখ্যক মাছের প্রধান প্রজনন সময় বিবেচনায়, মৎস্যের অতিআহরণ রোধ এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের প্রায় সম-ইকো-সিস্টেমে অবস্থিত ভারতের পূর্ব উপকূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্ধ মৌসুম বর্তমান সময় থেকে এগিয়ে অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত করলে তা মৎস্য আহরণে বন্ধ মৌসুম আরোপের উদ্দেশ্যকে আরো কার্যকর করবে।

উপসংহার (Conclusion)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন একটা কার্যকর কৌশল। মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে তলদেশীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। এটি জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট সময় ধরে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কার্যকরি ব্যবস্থাপনায় একটি সহজ ও অত্যন্ত ফলদায়ক পদ্ধতি, যা অন্যান্য অনেক দেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

[১]পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: hasanatabul@yahoo.com)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মাছের ভ্যাকসিন ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

Fish Vaccines: Present Status and Future Prospects

ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক[১] ও ইশরাত জাহান আঁকা[২]

Abstract

Aquaculture fish production has increased significantly over the past few decades along with the incidence of disease outbreaks. Fish diseases cause substantial economic losses to the aquaculture industry. Although antibiotics and chemotherapeutics are extensively used to control disease, the concern is increasing about the use of these substances in aquaculture. The situation is becoming complex due to the drug residues in food, the development of antimicrobial drug resistance and aquatic environmental populations. More attention is now being given to disease prevention as a means of controlling disease outbreaks based on improved husbandry and biological control methods such as vaccination. Vaccination is a powerful tool for disease control in modern day fish farming and plays an important role particularly in large-scale commercial farming. Fish vaccination has developed as a standard operating procedure in many countries of Europe and North America. But in most of the Asian countries, apart from Japan, vaccines are not commonly used for fish disease control. Commercial vaccines are now available for a number of fishes including salmon, trout, channel catfish, European seabass and seabream, Japanese amberjack and yellowtail, tilapia, carps and Atlantic cod against a few bacterial and viral fish pathogens. No parasite vaccines for fish exist so far. This article provides an overview of the aquaculture vaccines, their development and delivery strategies. It has also highlighted the constraints and prospects of the aquaculture vaccines in Bangladesh.

বিশ্বব্যাপী একোয়াকালচার বা চাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন গত কয়েক দশকে অনেক গুণ বেড়েছে এবং বর্তমানে একোয়াকালচার হচ্ছে বিশ্বের সবচাইতে দ্রুত বর্ধনশীল খাদ্য উৎপাদনের একটি ক্ষেত্র। বাংলাদেশেও মাছচাষ অতি দ্রুত সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাণিজ্যিকীকরণ এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ৫৬ শতাংশ আসছে চাষকৃত মাছ থেকে। নতুন নতুন কলাকৌশলের উদ্ভাবন এবং প্রজাতি সংযোজনের ফলে মাছ চাষে এসেছে বৈচিত্র্য। আর এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব যা এই শিল্পের প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থলজ প্রাণীর তুলনায় মাছের রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণ অনেক জটিল। মাছের রোগের চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিকসহ বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এসব ঔষধ অনিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক ও পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার না করার কারণে বিভিন্ন প্রকার বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়; যেমন এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট তৈরি হওয়া, জলজ পরিবেশের দূষণ, খাবারে ড্রাগ রেসিডিউ থেকে যাওয়া। কাজেই বর্তমানে মাছের রোগ চিকিৎসার চাইতে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মাছে ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

ভ্যাকসিন কি এবং কিভাবে কাজ করে?

(What is Vaccine and how it works?)

ভ্যাকসিন হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এন্টিজেন বা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকে তৈরি এক ধরনের এন্টিজেনিক মেটেরিয়াল যা প্রাণীর দেহে প্রয়োগ করে প্রাণীর ইমিউনিটিকে উদ্দীপ্ত করে সেই জীবাণুর সংক্রমণ থেকে প্রাণীটিকে দীর্ঘ সময় সুরক্ষা প্রদান করে। কোন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রাণীর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাই হচ্ছে ইমিউনিটি। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত এই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বলে ইনেট ইমিউনিটি (innate immunity)। আর কিছু প্রতিরোধ ক্ষমতা সময়ের সাথে সাথে জীবাণুর সংস্পর্শে এসে প্রাণী অর্জন করে যেটাকে বলে অর্জিত ইমিউনিটি। এই অর্জিত ইমিউনিটির বৈশিষ্ট্য হল, প্রথমবার কোন জীবাণু বা এন্টিজেন শরীরে প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক ধরনের পদার্থ রক্তে তৈরি হয় যেটাকে এন্টিবডি বলে। এই এন্টিবডি ওই জীবাণুর সাথে বিক্রিয়া করে তাকে শরীর থেকে বের করে দেয়। অর্জিত ইমিউনিটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এন্টিবডি তৈরির সাথে সাথে কিছু মেমরী কোষ প্রাণীর রক্তের সিরামে থেকে যায়। যদি দ্বিতীয়বার একই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে সেই মেমরী কোষ অতি দ্রুত এন্টিবডি তৈরি করে ওই জীবাণুকে শরীর থেকে বের করে দেয়। মূলত অর্জিত ইমিউনিটির

এ বৈশিষ্ট্যটিই ভ্যাকসিন তৈরির মূল ভিত্তি। একটি ভ্যাকসিন শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধেই সুরক্ষা প্রদান করতে পারে যেমন, মাছে *Aeromonas hydrophila* জনিত রোগের বিরুদ্ধে প্রদানকারী ভ্যাকসিনটি মাছকে শুধুমাত্র *Aeromonas hydrophila* জনিত রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে কিন্তু এটা *Streptococcus iniae* জনিত সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে না।

মাছের ভ্যাকসিনের অতীত ও বর্তমান
(Past and Present of Fish Vaccine)

কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে মাছ এন্টিবডি তৈরির ক্ষমতা রাখে এবং সেই এন্টিবডি যে মাছকে জীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে এ বিষয়টি জানা যায় ১৯৩৫ সনের দিকে। তারপর থেকে আরও প্রায় ৩০ বছর লেগে যায় মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন তৈরি ও ব্যবহার শুরু করতে। একোয়াকালচারে ব্যবহারের জন্য প্রথম ভ্যাকসিনগুলো লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে রেইনবো ট্রাউট মাছের Enteric Red Mouth (ERM) নামক রোগ এবং স্যামন মাছের Vibriosis ও Furunculosis নামক রোগের প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানে চাষকৃত মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাকসিন এখন নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমুদ্রে খাঁচায় চাষকৃত স্যামন ও ট্রাউট মাছে সাফল্যের সাথে এবং সাশ্রয়ীভাবে এখন নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হচ্ছে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৪১৮ মিলিয়ন স্যামন এবং ৯০ মিলিয়ন ট্রাউট মাছে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র স্কটল্যান্ডেই সে সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ মিলিয়ন এবং ২০ মিলিয়ন। স্যামন ও ট্রাউট ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে এখন চ্যানেল ক্যাটফিশ, ইউরোপিয়ান সিবাস, সিব্রিম, ইয়োলো টেইল, আটলান্টিক কড, কার্প এবং তেলাপিয়া মাছকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে অ্যাকোয়াকালচারে প্রায় ২৭টি ভ্যাকসিন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আরো অনেক ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অ্যাকোয়াকালচারে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনগুলো যে সমস্ত প্যাথোজেন, তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং যে মাছে ব্যাবহার করা হচ্ছে,তার একটি তালিকা সারণি ১ এবং সারণি ২ এ দেয়া হল।

সারণি ১: অ্যাকোয়াকালচারে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাকসিন

ব্যাকটেরিয়া	রোগের নাম	মাছ
Aeromonas salmonicida	Furunculosis	Salmonids
Vibrio anguillarum	Vibriosis	Salmonids, Cod
Vibrio ordalli	Vibriosis	Salmonids
Vibrio salmonicida	Cold water vibriosis	Salmonids
Edwardsiella ictaluri	Enteric septiciaemia	Catfish
Yersinia ruckeri	Enteric redmouth disease	Salmonids
Streptococcus agalactiae	Streptococcosis	Tilapia
Streptococcus iniae	Streptococciosis	Tilapia
Photobacterium damselae	Pasteurellosis	Seabass, seabream, yellowtail
Moritella viscosa	Winter ulcer	Salmonids
Flavobacterium columnare	Columnaris diseases	Salmonids, channel catfish
Flavobacterium psychrophilum	Cold water disease	Salmonids
Renibacterium salmoninarum	Bacterial kidney diseases	Salmonid
Piscirickettsia salmonis	Piscirickettsiosis	Salmonids
Lactococcus garvieae	Lactococcosis	Rainbow trout, yellowtail
Aeromonas hydrophila	Motile aeromonas septicemia	Salmonids

সারণি ২: অ্যাকোয়াকালচারে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভাইরাল ভ্যাকসিন

ভাইরাস	রোগের নাম	মাছ
Infectious pancreatic necrosis virus	Infectious pancreatic necrosis	Salmonids
Viral haemporrhagic septarmia virus	Viral haemporrhagic septarmia	Trout, flounder
Infectious salmon anemia vrus	Infectious salmon anemia	Salmon
Salmonid pancreas disease virus	Pancreas disease	Salmon
Infectious hematopoietic necrosis Virus	Infectious hematopoietic necrosis	Salmon
Irridovirus	Irridoviral disease	Salmon
Spring viremia of carp virus	Spring viremia of carp	Carp species
Koi herpes virus	Koi herpes virus disease	Koi carp
Grass carp hemorrhage disease virus	Grass carp hemorrhage disease	Grass carp

মাছের ভ্যাকসিন তৈরির কিছু বিবেচ্য বিষয়
(Consideration for preparation of fish vaccine)

মাছের ভ্যাকসিন তৈরি একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, তাই ভ্যাকসিন তৈরির আগেই নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হয়:

- রোগের বিস্তার বা এপিডেমিওলজী সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান;
- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সঠিক আইডেন্টিফিকেশন, ক্যারেকটারাইজেশন এবং তাদের সেরোটাইপ;
- জীবাণুর প্রোটেক্টিভ এন্টিজেন বা যে এন্টিজেন রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতার জন্য দায়ী সেটি নির্ণয়;
- প্রোটেক্টিভ এন্টিজেন জানা গেলে সেটি বেশি পরিমাণ উৎপাদন পদ্ধতি বের করা;
- মাছের ইমিউন সিস্টেম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা;
- মাছের প্রজাতি, তাঁর উৎপাদন কৌশল এবং কোন সময় মাছ রোগাক্রান্ত হয় সেটা জানা;
- ভ্যাকসিন প্রদানের কৌশল, তার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা; এবং
- লাভ-ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

মাছে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনের প্রকারভেদ
(Classification of fish vaccine)

ক. ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন

ফরমালিন বা তাপের মাধ্যমে জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে এই ধরনের ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। প্রচলিত বেশিরভাগ মাছের ভ্যাকসিনই এভাবে তৈরি করা হয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়াকে ফরমালিনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে প্রস্তুতকৃত Vibriosis এবং ERM নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের ভ্যাকসিন অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ. এটিনুয়েটেড ভ্যাকসিন

এ ধরনের ভ্যাকসিন তৈরিতে জীবাণুকে দুর্বলকরে বা তার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রহিত করে ভ্যাকসিনে ব্যবহার করা হয়। এই জীবাণুগুলো মাছের শরীরে বাঁচতে পারবে কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। এই ধরনের ভ্যাকসিন বর্তমানে Channel catfish মাছের *Edwardsiella ictaluri* ও *Flavobacterium columnarae* নামক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে এবং কার্প মাছের koi harpes virus নামক ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ. সাবইউনিট ভ্যাকসিন

এ ক্ষেত্রে জীবাণুর কোন ম্যাক্রোমলিকুল যেমন: নিষ্ক্রিয় টক্সিন, ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড অথবা রিকম্বিনেন্ট এন্টিজেন ভ্যাকসিন তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য যে সমস্ত প্যাথজেন খুব বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা কঠিন সেসমস্ত ক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ভ্যাকসিন তৈরি করা বেশ সুবিধাজনক।

ঘ. ডিএনএ ভ্যাকসিন

ডিএনএ ভ্যাকসিনেশান সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহৃত একটি জেনেটিক ইমিউনাইজেশান পদ্ধতি যেখানে ডিএনএ সরাসরি মাছের শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এই ডিএনএ এর মধ্যে ভ্যাকসিন এন্টিজেন এনকোডিং করা থাকে। গতানুগতিক ভ্যাকসিন অপেক্ষা ডিএনএ ভ্যাকসিনের সুবিধা হল এটি সহজেই ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা যায় এবং এটি অল্প খরচে তৈরি করা সম্ভব।

ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী কোম্পানি
(Vaccine producing companies)

বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রধানত পাঁচটি কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে মাছের ভ্যাকসিন তৈরি করছে। এর মধ্যে রয়েছে নরওয়ে ভিত্তিক Alpharma Inc. ও Invervet International, কানাডাভিত্তিক Norvatis Animal Vaccines ও Bayotek International Inc. এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক Schering Plough Aquaculture। এই কোম্পানিগুলোর তৈরিকৃত ভ্যাকসিনের প্রধান বাজার হলো স্যামন ও ট্রাউট ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়াও আছে PHARMAQ, Bayer Animal Health Inc.,এবং Schering-Plough Animal Health কোম্পানি। এশিয়ার অনেক দেশ মাছে ভ্যাকসিন ব্যবহারের দিক থেকে নানা কারণে পিছিয়ে থাকলেও সম্প্রতি PHARMAQ প্রতিষ্ঠানটি ভিয়েতনামের সাথে পাঙ্গাসের ভ্যাকসিন তৈরির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

মাছে ভ্যাকসিন প্রয়োগ পদ্ধতি
(Fish vaccination methodology)

মাছে প্রধানত নিম্নলিখিত তিনভাবে ভ্যাকসিন এর প্রয়োগ করা যায়:

ক. ইনজেকশনের মাধ্যমে

ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ সবচেয়ে প্রচলিত যাতে সহজেই ওই রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে মাছের শরীরে আন্টিবডি তৈরি হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা হল মাছের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীভাবে উদ্দীপ্ত করতে সব ধরনের আন্টিজেন পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতিতে ভ্যাকসিনের সাথে এডজুভেন্ট ব্যবহার করার সুযোগ থাকে যেটি মাছের ইমিউনো রেসপন্সকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী করে। এ ধরনের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা থাকে প্রায় ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত। সাধারণত এ ধরনের ভ্যাকসিন প্রয়োগে ইন্ট্রাপেরিটনিয়াল ইনজেকশনই বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে অসুবিধা হচ্ছে খুব ছোট মাছকে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা সবসময় সম্ভব নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে অনেক দক্ষ লোক, যন্ত্রপাতি এবং সময় প্রয়োজন হয়। মাছের জন্য পদ্ধতিটি অনেকটাই শ্রমসাধ্য। দেখা গেছে একজন দক্ষ ব্যক্তি এক ঘন্টায় সর্বোচ্চ প্রায় ১০০০ মাছকে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে পারে। তবে মাছের ওজন ২০

গ্রামের নীচে হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ সুবিধাজনক নয়।

খ. খাবারের সাথে মিশ্রিত করে

খাবারের সাথে মিশ্রিত করে ভ্যাকসিন প্রয়োগ সবচাইতে আদর্শ এবং সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সব আকারের এবং অধিক সংখ্যক মাছকে একসাথে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে লোকবল অনেক কম লাগে এবং মাছের জন্য এটি স্ট্রেসফুল নয়। তবে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণে ভ্যাকসিন প্রয়োজন হয়। এর একটি অসুবিধা হল সব মাছ ভ্যাকসিন মিশ্রিত খাবার নাও গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়াও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা তুলনামূলকভাবে একটু দুর্বল এবং অল্প সময়ের জন্য হয়। মাছের পরিপাক এনজাইম এই ভ্যাকসিনের গুণাগুণ নষ্ট করে দিতে পারে। খুব কম সংখ্যক বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভ্যাকসিনই খাবারের সাথে প্রয়োগ করা হয়।

গ. নিমজ্জনের মাধ্যমে

মাছকে ভ্যাকসিন দ্রবণে নিমজ্জনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে সাথে সাথেই ফল পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে সব আকারের মাছ বিশেষকরে অনেক ছোট মাছকে একসাথে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতিতে লোকবল কম লাগে এবং মাছের জন্যও এটি কম স্ট্রেসফুল। রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা তুলনামূলকভাবে একটু দুর্বল এবং অল্প সময়ের জন্য হয়। এ পদ্ধতিতে মাছ ল্যাটারাল লাইন, ফুলকা এবং ত্বক দিয়ে ভ্যাকসিন গ্রহণ করে। স্যামন মাছের ERM এবং Furunculosis রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত ৩.৫ থেকে ৫.০ গ্রাম ওজনের মাছকে নিমজ্জন পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। দেখা গেছে যে মাছের ওজন ২ থেকে ২০ গ্রাম হলে নয় থেকে বার মাস ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা থাকে কিন্তু ০.৫ থেকে ২.০ গ্রাম হলে সেটি হয় প্রায় চার মাস।

আদর্শ ভ্যাকসিনের গুণাগুণ (Characteristics of standard vaccine)

১। মাছের জন্য, যে ব্যক্তি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করছে তাঁর জন্য এবং মাছের ভোক্তাদের জন্য এটি নিরাপদ হতে হবে;

২। মাছকে দীর্ঘ সময় বা কমপক্ষে একটি উৎপাদন চক্রের সময়কাল পর্যন্ত সেই রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়ার কার্যকর ক্ষমতা থাকতে হবে;

৩। সহজেই যেন মাছে প্রয়োগ করা যায়;

৪। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য যেন প্রযোজ্য হয়;

৫। যেন লাভজনক হয়; এবং

৬। যথাযথ লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন এর আওতায় যেন সহজেই অন্তর্ভুক্তকরা যায়।

বাংলাদেশে অ্যাকোয়াকালচারে ভ্যাকসিন (Use of vaccine in aquaculture of Bangladesh)

বাংলাদেশে একোয়াকালচারে মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিনের ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি। দেশে বর্তমানে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, শিং, পাবদা, গুলশা, কৈ, ইন্ডিয়ান মেজরকার্প বা রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। এই সবগুলো প্রজাতির মাছই চাষের কোননা কোন পর্যায়ে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং খামারিগণ প্রতি বছর প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। রোগের প্রধান যে লক্ষণগুলো সচরাচর দেখা যায় তা হচ্ছে পাঙ্গাস মাছের নাভি লাল হয়ে বের হয়ে আসা, তেলাপিয়ার চোখের কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যাওয়া, শিং মাছের হঠাৎ ব্যাপক মড়ক এবং কার্প, গুলশা ও কৈ মাছের ক্ষত রোগ। এ রোগগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট *Aeromonas hydrophila, Aeromonas veronii, Edwardsiella tarda, Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, Pseudomonas sp., Virbio sp., Lactococcus sp., Enterococcus faecalis* এবং *Flavobactrium columnare* নামক ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করা গিয়েছে। ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে আছে ক্ষত রোগ যেটি *Aphanomyses invadans* নামক ছত্রাক দ্বারা সংঘঠিত হয়। ক্ষত রোগটি আশির দশকের শেষের দিকে শুরু হলেও এটি এখনও বাংলাদেশের একোয়া কালচারের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ ছাড়াও আছে ভাইরাস এবং পরজীবীঘটিত কিছু রোগ। মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক এবং ঔষধ কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাই বাংলাদেশেও মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

বিশ্বব্যাপী অ্যাকোয়াকালচারের ব্যাপক প্রসার এবং নতুন টেকনোলজি আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারি কোম্পানিগুলো মাছের ভ্যাকসিন উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। যার ফলে অনেক দেশে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে মাছের রোগের নিয়ন্ত্রণ যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসছে। কিছু কিছু ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠানের এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের বাজার নিয়েও আগ্রহ আছে। তাই অ্যাকোয়াকালচারের বিপুল সম্ভাবনাময় এই দেশে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন তৈরি এবং ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ এখনই প্রয়োজন।

[১]প্রফেসর, একোয়াকালচার বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (ই-মেইল: hasin96@yahoo.com)
[২]সহকারী অধ্যাপক, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কৌশল ঃ প্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর

Fish Act Implementation Strategy : Dhaka Megacity Perspective

সৈয়দ মোঃ আলমগীর

Abstract

Conservation of Fish is playing an important role to ensure sustainable fish production in the open water of Bangladesh. Some techniques and strategies have been taken to execute the Protection & Conservation of Fish Act, 1950 and revised rules in Dhaka Megacity which is very effective and successful. It is as simple as performing the workplan sincerely and methodologically. We have become able to give a message to illegal fish arotder, wholeseller and fish retailer that it will be strictly protected the selling of illegal fish i.e. Jatka, Piranha, African Magur, shrimp and prawn with pushed jelly etc. in any fish arot and markets of Dhaka city. To implement the fish act some measures like the monitoring, control and surveillance system was established. Particularly 3 (three) steps are executed gradually. Firstly, awareness and motivational activities; secondly, monitoring and finally execution of joint mobile court. Strong coordination and collaboration with related stakeholder is ruquired. By systematic application of the method, it is possible to control the selling of banned fish in all fish arot, wholesale and retail markets of Dhaka City. For the sake of the great interest of the nation, it will be continued.

মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ এখন মাছ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্বেই আজকের বাংলাদেশে 'মাছে ভাতে বাঙালি'র হারানো গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আবার পুনরুদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশে মৎস্যখাতের ক্রমবিকাশের সূচনা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। আর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব, সার্বক্ষণিক নজরদারি, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও গভীর মমত্ববোধ মৎস্যখাতকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রশিক্ষণ ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব, এ সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার মৎস্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। দেশব্যাপী মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ মৎস্য বিষয়ক আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগে সচেষ্ট রয়েছেন।

দেড় কোটির উর্ধ্বে বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ঢাকা মহানগরের বিশাল চাহিদা পূরণে মাছ সরবরাহ হয় দেশের মাছ উৎপাদন সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে। ঢাকা মহানগরীতে ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন মিলিয়ে ১২০০ (এক হাজার দুইশত) এর অধিক মৎস্য আড়ত রয়েছে। তাছাড়া এ নগরীতে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের প্রায় শতাধিক মাছের বাজার আছে। ঢাকা মহানগরীর অসংখ্য মৎস্য আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের পূর্বে প্রতি বছর মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম, জাটকা রক্ষা কর্মসূচি, মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন- পিরানহা, আফ্রিকান মাগুর, জেলি পুশযুক্ত চিংড়ি, রঙ মিশ্রিত চাষের শিং-মাগুর এবং ফরমালিনযুক্ত মাছ বিক্রয় বন্ধ রাখার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে যেসব কর্মপরিকল্পনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়, সেটিকে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

ক. প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম;

খ. মনিটরিং কার্যক্রম; এবং

গ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

ক. প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম (Publicity & awareness activities)

ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান মৎস্য আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের পূর্বে নিম্নরূপ প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১. **নোটিশ জারিকরণ:** প্রতিটি মৎস্য আড়তের সভাপতি/সম্পাদক বরাবর মৎস্য আইন সংক্রান্ত প্রচারণা ও শাস্তির বিধান উল্লেখপূর্বক নোটিশ জারি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মৎস্য আড়ত ও বাজারে এসব নোটিশের অনুলিপি প্রদানপূর্বক সতর্ক করা হয়।

২. **ব্যানার স্থাপন:** প্রতিটি মৎস্য আড়ত/বাজারে প্রচারণা ও সচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বড় মৎস্য আড়ত/বাজারে ৪-৫টি এবং প্রতিটি ছোট মৎস্য আড়ত/বাজারে ১-২টি ব্যানার স্থাপন করা হয়।

চিত্র: ঃ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বহুল প্রচারের জন্য আড়ত ও বাজারে ব্যানার স্থাপন

৩. **পোস্টার বিতরণ ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন:** মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত প্রকাশিত পোস্টার প্রতিটি মৎস্য আড়ত ও বাজারে বিতরণপূর্বক দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. **লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ:** প্রতি বছর কর্মসূচি অনুযায়ী মৎস্য আইন সংক্রান্ত লিফলেট ছাপানো হয় এবং সেগুলো সমগ্র ঢাকা মহানগরীর সবগুলো মৎস্য আড়ত ও বাজারে বিতরণ করা হয়।

৫. **মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণ:** ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল মৎস্য আড়ত ও বাজারসহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের ব্যানার ও পোস্টার সজ্জিত পিকআপে পৃথকভাবে মৎস্য আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মাইকিং করা হয়। এ সময় লিফলেটও বিতরণ করা হয়।

চিত্র: ঃ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বহুল প্রচারের জন্য মাইকিং

৬. **মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ:** প্রতিটি মৎস্য আড়তে এবং উল্লেখযোগ্য মৎস্য বাজারসমূহে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী, আড়তদার, পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয় এবং আইন মান্য করার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ককরণপূর্বক প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়।

চিত্র: ঃ নিষিদ্ধ মাছ বিক্রয় বন্ধে যাত্রাবাড়ি মৎস্য আড়তে মতবিনিময় সভা

৭. **আলোচনা সভা ও ভিডিও প্রদর্শন:** প্রতি বছর গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহায়তায় রাজধানীর নির্বাচিত স্কুল, কলেজ এবং মৎস্য আড়ত ও বাজারে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত আলোচনা সভা ও ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

খ. মৎস্য আড়ত ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম (Fish arot & market monitoring activities)

ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান মৎস্য আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কিত প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পর নিম্নরূপ মৎস্য আড়ত ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১. **অঞ্চলে বিভক্তকরণ এবং মনিটরিং টিম গঠন:** মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষে শুরু হয় মৎস্য আড়ত ও বাজার মনিটরিং। এক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মহোদয় ঢাকা মহানগরীর সমগ্র এলাকাকে ১০ (দশ)টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ১০টি মনিটরিং টিম গঠনপূর্বক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা-কে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব প্রদান করেন।

২. **কন্ট্রোলরুম স্থাপন ও রেকর্ড সংরক্ষণ:** জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোলরুমে মনিটরিং টিম লিডারগণ দৈনিক প্রতিবেদন সমন্বয়কারীর কার্যালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে প্রেরণ করেন। উক্ত কন্ট্রোল রুমে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত (compile)

করে ছকওয়ারী দৈনিক প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে প্রেরণ করা হয়।

৩. **প্রবেশপথে চেকপোস্ট স্থাপন:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জাটকাসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ মাছ ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ বন্ধের লক্ষ্যে প্রবেশপথ তথা সড়কপথ ও নৌপথে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সড়ক পথ ও নৌপথে স্থাপিত চেকপোস্টে সন্দেহজনক গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।

গ. মাছ বাজার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংপূর্বক অভিযান পরিচালনা (Fish market inspection, monitoring & operational activties)

ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান মৎস্য আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কিত প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পর মাছের বাজার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংপূর্বক অভিযান পরিচালনায় নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১. **মাছ বাজার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংপূর্বক অভিযান পরিচালনা:** গঠিত টিমসমূহ প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর ১০টি অঞ্চলের আওতাধীন মৎস্য আড়ত, বাজার, সুপারসপসহ অস্থায়ী মাছের বাজার নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিংপূর্বক অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনাকালে মনিটরিং টিম জাটকাসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ মাছ জব্দপূর্বক স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করে।

২. **যৌথভাবে বিশেষ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** মনিটরিং টিম ও সোর্স/ইনফরমার কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মৎস্য আড়ত ও

চিত্র: ঃ মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানের মাধ্যমে জব্দকৃত পিরানহা

চিত্র: মোবাইল কোর্টে মাছের ফরমালিন পরীক্ষা

বাজারে যৌথভাবে বিশেষ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে জেলা প্রশাসন, র‍্যাব, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের সহোযোগিতায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এবং ধৃত আসামীকে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করে। অপরাধ দমনের জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে জরিমানার চেয়ে কারাদণ্ড প্রদানে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা মহানগরীর মৎস্য আড়ত, বাজার ও সুপারসপে জাটকাসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ মাছ বিপণন প্রায় বন্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা মহানগরীতে পরিচালিত অভিযানে মোট ১২০.৩৬৮ মে.টন জাটকা, ১২.০৭৭ মে.টন পিরানহা, আফ্রিকান মাগুর, জেলি পুশযুক্ত চিংড়ি ও রং মিশ্রিত শিং-মাগুর মাছ জব্দ করা হয় এবং খাবার উপযোগী মাছসমূহ স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয় তবে রং মিশ্রিত শিং-মাগুর ও জেলি পুশযুক্ত চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়। এ সময়কালে মোট ৩৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, ৭৫০০.০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ১১টি মামলা দায়ের করা হয়।

৩. **প্রবেশপথে স্থাপিত চেকপোস্ট-এ তল্লাশি অভিযান পরিচালনা:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জাটকাসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ মাছ ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ বন্ধের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সড়ক পথে স্থাপিত চেকপোস্টে সন্দেহজনক গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এমনকি সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিভিন্ন লঞ্চে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে জাটকা উদ্ধারে তল্লাশি

চালানো হয়। তাছাড়া মাওয়া ঘাট থেকে স্পীডবোটের মাধ্যমে আগত জাটকা বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে সোয়ারীঘাট মৎস্য আড়ত ঘাট ও বুড়িগঙ্গা নদীতে জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জাটকা স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং জাটকা পরিবহন বন্ধের লক্ষ্যে জব্দকৃত স্পীডবোট নিষিদ্ধ সময় পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর পাগলা স্টেশনে আটক করে রাখা হয়।

চিত্র: মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দকৃত জাটকা

৪. **অবৈধ কারেন্ট জাল বিক্রয় বন্ধে বিশেষ অভিযান:** রাজধানীর পাইকারিবাজারে (চকবাজার) অবৈধ কারেন্ট জাল বিক্রয় বন্ধের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে র‍্যাব ও কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে পৃথকভাবে বিশেষ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। একই সাথে জেলা প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের মৎস্য আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত মনিটরিং এর পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: জব্দকৃত জাটকা এতিমখানায় বিতরণ

মৎস্য আইন বাস্তবায়নে অনুকরণীয় উদ্যোগ ও প্রস্তাবনা

(Fish act implementation initiatives & suggestions)

১. **জেলেদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি:** প্রতি বছর ১ নভেম্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী বছর ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ৮ মাস ১০ ইঞ্চি আকার পর্যন্ত ছোট ইলিশ (জাটকা) ধরা, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় বন্ধের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উল্লেখ্য, জাটকা রক্ষা কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সরকার প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ৪ মাস ইলিশ নির্ভর জেলেদের প্রত্যেক পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মাসে ৪০ (চল্লিশ) কেজি করে চাল প্রদান করছে। জাটকা আহরণ বিরত দরিদ্র জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত মানবিক সহায়তা ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৮ মাস করা যেতে পারে।

২. **সম্মিলিতিভাবে টিমওয়ার্ক পরিচালনা:** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরকে মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সহায়তাকারী জেলা প্রশাসন, র‍্যাব, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশ সকলে সম্মিলিতিভাবে টিমওয়ার্ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিধায় সমুদয় কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুভাবে পরিচালিত হয়।

৩. **ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে সম্পৃক্তকরণ:** গণমাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সময়ে সময়ে পরিচালিত বিশেষ মোবাইল কোর্টের ফলাফল ও তথ্যাদি প্রচারের সক্রিয় সহযোগিতা করায় ঢাকা মহানগরীতে অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়তদার ও মাছ বিক্রেতাকে নিষিদ্ধ মাছ বিক্রয় বন্ধে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার (Conclusion)

দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে প্রতি বছর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রচারণা, মনিটরিং, মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণের দায়িত্বশীল ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: ah518775@gmail.com)

নিঝুম দ্বীপ সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা (মেরিন রিজার্ভ) ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা

Nijhum Dwip Marine Reserve Declaration and Management

মোঃ আব্দুল ওহাব[১], আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক[২] ও মোঃ শাহাদ মাহবুব চৌধুরী[৩]

Abstract

Establishment of Nijhum Dwip Marine Reserve (MR) along the coast of Hatiya (Noakhali) through Rangabali (Patuakhali) in Bangladesh has been a long cherished dream of the Ministry of Livestock and Fisheries and it took about four years for its detailed socioecological, biological and site mapping studies since 2016. It is planned in line with the United Nations Sustainable Development Goal 14.5, Convention on Biological Diversity (CBD) and Aichi Declaration 1992, Blue Economy Growth and an advancement of declaring 10% of total water area as Marine Reserve in the Bay of Bengal, Bangladesh. According to survey reports of DoF/WorldFish led USAID's ECOFISH project with its technical partners IUCN and WCS have been firmly established in consideration of migratory route of economically valuable fish Hilsa, unique species assemblage, abundance and biodiversity with livelihood support program and alternative income generation activities for the coastal fishers who are reliant on these resources. Declaration of the Nijhum Dwip Marine Reserve with an area of 3,188 sq. km through gazette notification by the Ministry of Fisheries and Livestock has been made on 23 June 2019. Now, efforts are underway for development of its management guidelines and marine spatial planning in line with multiple users of the resources with priority of sustaining improved livelihoods of the coastal fishers and blue economy dream of the people of Bangladesh.

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং হুমকির সম্মুখীন প্রজাতিসমূহ এবং এদের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা হতে দুই কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নদী প্রণালি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা-এর মোহনায় অবস্থিত পুঞ্জীভূত চর ও উদীয়মান দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বীপ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা হতে প্রবাহিত প্রচুর পরিমাণ মিঠাপানি, কাদা এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ পদার্থ নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন জলজ এলাকাকে মাছ এবং সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য পৃথিবীর অন্যতম উৎপাদনশীল এবং উপযোগী বাসস্থানে পরিণত করেছে।

ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে এবং আইইউসিএন-এর কারিগরি সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর এবং ওয়ার্ল্ডফিস Enhanced Coastal Fisheries Project in Bangladesh (ECOFISH-BD) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে একটি নতুন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার সম্ভাব্য নকশা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত নিঝুম দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন জলাশয়ে একটি বাস্তুতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন কর্ম পরিচালনা করে। প্রকল্পটি জীববৈচিত্র্য ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং একটি হুমকি ও প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া বিশ্লেষণ (threat and resilience analysis) করে। একই সাথে নতুন একটি এমপিএ প্রতিষ্ঠা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ১২টি অত্যাবশ্যকীয় ধাপসম্বলিত একটি কাঠামো ও একটি রোডম্যাপেরও প্রস্তাব করে।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (WCS) এর বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে 'Establishing 10% Marine Protection in Bangladesh: A Global Hotspot for Threatened Marine Megafauna' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি পৃথক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ গবেষণায় নিঝুম দ্বীপ ও এর আশেপাশের ১,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি সামুদ্রিক এলাকায় পর্যবেক্ষণ এবং জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র ও পরিধি (Definition, Objectives, Extent and Delineation)

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MR) উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ব্যবহার বিবেচনায় বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্থানিক ও জীবতাত্ত্বিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো স্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রজাতি বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ঐ স্থান বা ঐ স্থানের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাপনায়

সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রস্তাবিত নিঝুম দ্বীপ-সোনার চর উপকূলীয় সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MR) বাংলাদেশের উপকূলীয় ও বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার আলোকে সংজ্ঞায়িত ও ৩,১৮৮ বর্গ কিমি জলায়তনে সীমায়িত।

গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা (Importance and justification)

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ হতে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলার সোনার চর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের মোহনা অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ। এ এলাকাটি নদীর স্বাদুপানি ও সাগরের লোণাপানির সংমিশ্রণস্থল। পানির লবণাক্ততা প্রায় সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য সহনীয় পর্যায়ের হওয়ায় এখানকার জীববৈচিত্র্য ও জীবঘনত্ব সর্বোচ্চ। নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর মোহনা বাংলাদেশের স্থলজ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের অন্যতম আধার। এখানে মিঠাপানি ও লোনাপানির সংমিশ্রণ হয়। ম্যানগ্রোভ বনের কারণে অত্র এলাকার পানি অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ। এখানে বেশ কয়েক প্রজাতির বিপন্ন মাছ এখনো টিকে আছে। ইকোসিস্টেম বিবেচনায় এটি একটি ইকোটোন। আইইউসিএন-এর রেডলিস্ট ২০১৫ অনুযায়ী এখানে রয়েছে ৭ প্রজাতির বিপন্ন মাছ। এখানে রয়েছে হলুদ-লেজী পাঙ্গাস, রিটা, চিতল, ফলি, মধু পাবদা, চাপিলা এবং বোয়ালের সমাহার। এছাড়াও রয়েছে নিকট সংকটাপন্ন ভেদা, গাঙ মাগুর, গুইল্যা, গুলসা টেংরা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে এদের আবাসস্থল আজ হুমকির সম্মুখীন। এখনই ব্যবস্থা গৃহীত না হলে অচিরেই এরা অতিমাত্রায় বিপন্ন হবে।

নিঝুম দ্বীপের মোহনা ইলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র এবং নদী ও সমুদ্রের মাঝে চলাচলের পথ। শুধু ইলিশই নয় এলাকাটি গলদা ও বাগদাসহ অন্যান্য চিংড়ি ও বিভিন্ন মাছের প্রজননস্থল। এসব বাণিজ্যিক মাছের ওপর নির্ভর করে সমাজের হাজারো মানুষের জীবিকা। নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকায় রয়েছে বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন ইন্দো-প্যাসিফিক হাম্পব্যাক ডলফিন, ফিনলেস পরপয়েজ ও বিভিন্ন প্রজাতির শাপলাপাতা মাছ। বিশ্বব্যাপী বিপন্ন পাইন্যা শাপলাপাতা এবং সংকটাপন্ন থাম্বা, বাঘা শাপলাপাতা এবং জলপাইরঙ্গা সামুদ্রিক কাছিম রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন করাত মাছ ও বিভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর। বিশ্বব্যাপী বিপন্ন হ্যামারহেড বা হাতুড়ি হাঙ্গরের বাস নিঝুম দ্বীপের সামুদ্রিক অঞ্চলে। নিঝুম দ্বীপের মোক্তারিয়া চ্যানেলে পাওয়া যায় সিটাসিয়ান গ্রুপের বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ইরাবতি ডলফিন ও গাঙ্গেয় শুশুক। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েছে মেছো বিড়াল ও উদ বিড়াল। এরা বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন।

নিঝুম দ্বীপের কর্দমময় জায়গা এবং ম্যানগ্রোভ বন দেশি ও পরিযায়ী পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিঝুমদ্বীপ ইস্ট-অস্ট্রেলিয়ান ফ্লাইওয়ের অংশ হওয়ার কারণে প্রতি বছর শীতকালে বিভিন্ন প্রজাতির হাজারো পরিযায়ী পাখি এখানে এসে থাকে এবং কর্দমাক্ত জায়গাগুলোতে খাবার সংগ্রহ করে। এখানকার দমার চরে প্রতি বছরই এসে থাকে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান, সংকটাপন্ন দেশি গাঙচষা এবং বিপন্ন নর্ডম্যান সবুজ-পাখি। এছাড়া প্রতি শীতে চর কবিরাতে বিপন্ন বড় নথ পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু সংকটাপন্ন পাখি যেমন- কালা মাথা কাস্তেচরা ও বড়ো গুটি ঈগল দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপের মধ্যে হলদে গুঁই ও গুঁইসাপ নিকট সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। নিঝুম দ্বীপের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বের কাদা ও বালুময় জায়াগাতে বাস করে অনেক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন- মেরিন ফ্ল্যাটওয়ার্ম, শামুক ও প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক মাড ক্রাব (কাঁকড়া) পাওয়া যায়।

নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন MR জীববৈচিত্র্যের একটি 'হটস্পট', ইলিশের গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রয়াণ পথ এবং প্রজননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত ১০টি প্রজাতি IUCN Red List (২০১৫) অনুযায়ী যেমন- রিটা, হলুদ-লেজী পাঙ্গাস, মধু পাবদা, ফলি, চাপিলা, বোয়াল, ভেদা, গাঙ মাগুর, গুইল্যা ও গুলশা হুমকির সম্মুখীন। এ অঞ্চলে অন্তত ১৫ প্রজাতির বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন বা নিকট সংকটাপন্ন জলজ বৃহৎ প্রাণিকূল যেমন- বিপন্ন ইরাবতি ডলফিন ও শুশুক, সংকটাপন্ন পাখনাহীন পরপয়েজ ও গোলাপি ডলফিন, তাম্রমাথা হাতুড়ি হাঙ্গর, খর্বনাক শাপলাপাতা, চুনি শাপলাপাতা, হরিণা শাপলাপাতা, বাঘা শাপলাপাতা, জালিখোপ শাপলাপাতা, গোলাকার শাপলাপাতা, প্যানা শাপলাপাতা ও জলপাইরঙ্গা সামুদ্রিক কচ্ছপ; ১৩৯ প্রজাতির পাখি, যার মধ্যে ৮৮টি পরিযায়ী প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন চামচঠুটো জিরিয়া, বিপন্ন দাগী সবুজ পা, বড় নট ও সংকটাপন্ন পানিকাটা অন্যতম। কমপক্ষে ১৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী যার মধ্যে বিপন্ন মেছো বিড়াল এবং সংকটাপন্ন উদবিড়াল অন্যতম। অন্তত চারটি উভচর প্রজাতি এবং ১০টি সরীসৃপ প্রজাতি যাদের মধ্যে বিভিন্ন সামুদ্রিক সাপ, বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন জলপাইরঙ্গা সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং স্থানীয়ভাবে সংকটাপন্ন বাংলা গুঁই ও হলুদ গুঁই অন্যতম। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বাস্তুতন্ত্রের মূল্যবান পরাগায়ন ঘটানো প্রজাপতি, উপকূলীয় পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য যেমন- কেঁচো এবং অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান কাঁকড়া।

নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা (Declaration of Nijhum Dwip Marine Reserve)

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সমুদ্র ও নদীতে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্নপ্রায় সামুদ্রিক প্রাণিকূলসহ জাতীয় মাছ ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্রের সুরক্ষা ও বাধাহীন চলাচল

নিশ্চিতকরণে এবং এই দ্বীপের জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত এলাকাকে নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Marine Reserve) এলাকা ঘোষণা করেছে (SRO No. 211-Law/2019—the Section 28 of Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983)। এর ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৫ অর্জনে একধাপ অগ্রগতি সাধিত হলো। নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩,১৮৮ বর্গ কিমি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা হওয়ায় বাংলাদেশে মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হলো ৫,৬২৪ বর্গ কিমি। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার সংরক্ষিত এলাকার সংরক্ষিত অংশের পরিমাণ ৪.৭৩% উন্নীত হলো। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকাটি নিম্নে (চিত্র ১) প্রদর্শিত হয়েছে।

চিত্র ১: নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MR)-৩,১৮৮ বর্গ কিমি

ভৌগোলিক সীমানা ও জিপিএস কো-অর্ডিনেট নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

কৌণিক বিন্দু	দূরত্ব (কিমি) এবং সূত্র বিন্দু হতে দিক	ভৌগোলিক অবস্থান (সীমানা) জিপিএস কো-অর্ডিনেট	মোট আয়তন
১	মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ এর উত্তর পশ্চিম: পায়রা বন্দর হতে ২৩.৫ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২১°৪৮'৪৯.০৬" উ, ৯০°২৪'১৭.২৯" পূ.	৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার
২	মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ এর উত্তর ১নং কৌণিক বিন্দু হতে ২০.০ কিমি পূর্বে; পায়রা বন্দর হতে ৩৮.৩ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২১°৪৮'৪৯.০৬" উ, ৯০°৩৫'৫৬.৭২" পূ.	
৩	২নং কৌণিক বিন্দু হতে উত্তর -পূর্বে; চরফ্যাশন সদর হতে ১৪.৭ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২২°৩'১৪.২১" উ, ৯০°৪৭'২.৪৪" পূ.	
৪	৩নং কৌণিক বিন্দু হতে ১৪.৫ কিমি পূর্বে; মনপুরা হতে ২২.৯ কিমি দক্ষিণ -পশ্চিমে	২২°৩'১৪.২১" উ, ৯০°৫৫'২৭.৫১" পূ.	
৫	৪নং কৌণিক বিন্দু হতে ৭.৪ কিমি উত্তর -পূর্বে; মনপুরা হতে ১৫.৯ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২২°৬'৪৮.৫৭" উ, ৯০°৫৭'২১.৯৮" পূ.	
৬	৫নং কৌণিক বিন্দু হতে ৪.৮ কিমি -পূর্বে মনপুরা হতে ১৬.২ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২২°৬'৪৮.৭৮" উ, ৯১°০'৭.২৩" পূ	
৭	৬নং কৌণিক বিন্দু হতে নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান এর পশ্চিম-দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা/চৌহদ্দি ঘিরে (১১.২ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে) এবং জাহাজ মারা হইতে ৬.৯ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২২°৪'২৭.৮৭" উ, ৯১°৬'৯.৯৭" পূ	
৮	মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ-এর সর্ব উত্তর-পূর্বকোণ হইল ৭নং কৌণিক বিন্দু হতে ১৮.৪ কিমি পূর্বে; জাহাজ মারার ২২.৯ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২২°৪'২৭.৮৭" উ, ৯১°১৬'৫৩.৪৮" পূ.	
৯	মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ-এর সর্ব দক্ষিণ -পূর্বকোণ হইল ৮নং কৌণিক বিন্দু হতে ৪৬.০ কিমি দক্ষিণে; জাহাজ মারার ৫৬.৪ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২১°৩৯'৩২.৫৫" উ, ৯১°১৬'৫৩.৪৮" পূ.	
১০	মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ-এর সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হলো ৯নং কৌণিক বিন্দু হতে ৯১.০ কিমি পশ্চিমে; পায়রা বন্দর হতে ৩৯.৫ কিমি দক্ষিণ -পূর্বে	২১°৩৯'৩২.৫৫" উ, ৯০°২৪'১৭.২৯" পূ.	

নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার জীবতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক প্রভাব (Biological and socio-economic impact of Marine Reserve)

নিঝুম দ্বীপ MR-এর মূল উদ্দেশ্য সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তির ঝুঁকি প্রশমন ও টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক অবদান রাখবে। MR ব্যবস্থাপনার ফলে শুধু জাতীয় মাছ ইলিশ নয়, এর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন- ব্লু ইকোনমি লক্ষ্য অর্জনও সহজ হবে।

নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা (Management of Nijhum Dwip Marine Reserve)

নিঝুম দ্বীপ MR এর ব্যবস্থাপনা সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে (MSP) পরিচালিত হতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তরের জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পের নীতিমালা, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্ক ফোর্স কমিটির অবকাঠামোয় IUCN/ WorldFish/ ECOFISH (2018) প্রস্তাবনার Road Map এবং WCS (2018) প্রস্তাবিত MSP সমন্বয়ে প্রস্তাবিত নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার (MR) ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে স্থলজ ও জলজ উৎসের দূষণ ও সামুদ্রিক জীবসম্পদের যথেচ্ছ আহরণ, সম্পদের পরিমিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও আবাস সংরক্ষণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচ্য হবে।

উপসংহার (Conclusion)

নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MR) প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে উপকূলীয় ও বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং এতে করে জেলে পরিবারগুলো আরও স্বচ্ছলতা লাভ করবে। একই সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক জলরাশির সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। এটি সামুদ্রিক জলরাশির বিশ্বব্যাপী প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকি প্রশমন ও টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখবে এবং এর ফলে পৃথিবীর বিরল প্রজাতির মহাকায় প্রাণীগুলো সংরক্ষিত হবে। এই MR ব্যবস্থাপনার ফলে অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলসহ সামগ্রিকভাবে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমির লক্ষ্য অর্জনও সহজ হবে।

[১]টিম লিডার, ইকোফিস-বিডি প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ (ই-মেইল: A.Wahab@cgiar.org)
[২]মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]আইইউসিএন, বাংলাদেশ

সুনীল অর্থনীতি ঃ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিপ্তরের উদ্যোগ

Blue Economy : Department of Fisheries' Initiative in the Management of Marine Fisheries Resources

হাসান আহম্মেদ চৌধুরী[১], নাসির উদ্দিন মোঃ হুমায়ূন[২] ও মনিষ কুমার মন্ডল[৩]

Abstract

Bangladesh established her legitimate and sovereign right over 118,813 sq. km area of the Bay of Bengal resolving dispute over maritime boundary with neighboring states settled by International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) and International Court of Arbitrations. Blue growth initiative included as a priority area by the Government of Bangladesh and different pragmatic initiatives especially strengthening the Monitoring Control Surveillance (MCS) system for reduction of Illegal Unregistered and Unregulated (IUU) fishing, stock survey and assessment for harvest at maximum sustainable yield (MSY) level, introduction of monitoring tools by supporting with modern monitoring devices like Vessel Monitoring System (VMS), Automated Identification System (AIS), etc. in industrial and artisanal fishing fleets, enhanced production and infrastructure in capture and culture fisheries improving value chain reorienting sector's performance towards 'Volume to Value' and community empowerment and livelihoods improvement of fisheries engaging them in sustainable fisheries management and transformation of livelihood have also set as project activities in sustainable coastal and marine fisheries project. Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) will be established by developing Fisheries Management Plans (FMP) through co-management paradigm. The project will establish a Joint Monitoring Centre (JMC) to strengthen coordinated surveillance by concerned law enforcing agencies to combat IUU fishing both by foreign and national vessels. The multifarious and diversified nature of activities encompassed in the project means for sustainability of resilient marine fisheries resources exploring better utilization of country's Blue Economy.

আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক জাতিসংঘের ট্রাইবুনালের রায়ের ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌম একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone -EEZ) (যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৮০%) ১১৮,৮১৩ বর্গ কিমি নির্ধারিত হওয়ায় এ বিশাল জলরাশি হতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals, SDGs) ও সুনীল অর্থনীতির (Blue economy) সম্ভাবনা, সুফল ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ ঋণ সহায়তায় ১৮৬৮.৮৬ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১৫৮৮.৩৯ এবং জিওবি- ২৮০.৪৭৫) ব্যয়ে গৃহীত 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প' গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দেশের ৪টি বিভাগের আওতাধীন উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫টি উপজেলার ৭৫০টি ইউনিয়নে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপকূলীয় ১৬টি জেলায় মৎস্যজীবী, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মৎস্য-নির্ভরশীল পরিবার এ প্রকল্পের অভীষ্ট সুফলভোগী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান ও মৎস্য মজুদ অবস্থা পনুরুদ্ধারসহ মৎস্যখাতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করে এ খাতের স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal of the project and specific objectives)

অভীষ্ট লক্ষ্য (Goal of the Project): Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project (SCMFP) এর লক্ষ্য হলো দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অধিকতর আর্থিক সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনপূর্বক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (Specific Objectives of the project)

ক. সামুদ্রিক একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) মজুদ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চিংড়ি, তলদেশীয় ও ভাসমান প্রজাতির মৎস্যের মজুদ নিরূপণ জোরদারকরণ;

খ. বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নীত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি ও বেসরকারি) সামর্থ্য বৃদ্ধি;

গ. ক্ষুদ্রায়তন ও বাণিজ্যিক (Artisanal and Industrial

Fisheries) মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চলে মৌলিক অবকাঠামোর উৎকর্ষ সাধন এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আহরিত ও উৎপাদিত মৎস্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও মানের আদর্শ সমুন্নত রাখা;

ঙ. উপকূলীয় জেলাসমূহে ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

চ. দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী কর্তৃক মৎস্য আহরণ নির্ভরশীলতা হ্রাসপূর্বক তাঁদের নেতৃত্বে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীবিকা নির্বাহে পেশা পরিবর্তনে উৎকর্ষ আনা; এবং

ছ. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় 'সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত প্রধান কার্যক্রমসমূহ (Major activities to achieve the Goal and Objectives of the Project)

SCMFP প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ সহযোগিতায় প্রথম পর্যায়ে ৪টি কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নসাধনে সরকারকে কার্যক্রম গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবে। মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্প মৎস্য সেক্টরে সুশাসন, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ভৌত-অবকাঠামো ও ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। কম্পোনেন্টসমূহের আওতায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো:

কম্পোনেন্ট ১: মৎস্যখাতে টেকসই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম করা (Enabling sustainable fisheries sector investment and growth): এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত দেশের বর্ধিত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে স্বচ্ছতা, সমন্বয় ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে অধিকতর কার্যকরকরণে সহযোগিতা প্রদান করবে। পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নসহ নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মজুদ নিরূপণ, সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (Monitoring, Control and Surveillance -MCS) পদ্ধতি বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণ, সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং কার্যকর মৎস্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা। বিশেষভাবে, নীতি ও বিধিসমূহ সংস্কার, মজুদ নিরূপণে, সহনশীল আহরণমাত্রা বিশ্লেষণে, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরিতে, প্রশিক্ষণে, MCS ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) ফিসিং হ্রাস ও বাস্তবায়নে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনে এবং মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য জাতীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি এ সেক্টরের সংশ্লিষ্ট নীতি ও বিধিসমূহে জলবায়ু ও দুর্যোগ সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসের নীতি সমন্বয় ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধিতে এবং প্রকৃতি থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ হ্রাসে ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।

কম্পোনেন্ট-১ অধীনে প্রধান প্রধান কার্যক্রম: সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপ এবং মজুদ নিরূপণে মৎস্য অধিদপ্তর এবং অংশীজন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা; আর্টিসনাল সেক্টরে নিয়োজিত মৎস্য নৌযানের ডাটা-বেইজ আপডেট করা; বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহযোগে Vessel Monitoring System (VMS) সংযোজন; রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ১০,০০০ আর্টিশনাল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে Automated Identification System (AIS) সংযোজন ও পরিচালন; ১৬টি মেরিন ফিসারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট নির্মাণের মাধ্যমে এমসিএস সিস্টেমের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করা।

কম্পোনেন্ট-২ অবকাঠামোগত সুবিধাদি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যক্রম: Marine Spatial Planning; উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যচাষ তথা চিংড়ি চাষে ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ; ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ভৌত-কাঠামোর উন্নয়ন ও অন্যান্য ভেল্যু-চেইনে উৎকর্ষ সাধনে আর্থিক বিনিয়োগ; খাল পুন:খনন/ পুনর্বাসন; উপকূলীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও সংলগ্ন মৎস্য বাজার পুনর্বাসন এবং নির্মাণ, সংযোগ রাস্তা-ঘাট ও বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন ইত্যাদি ধরনের পূর্তকাজ, মেরিকালচারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি/সুযোগ তৈরি; মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্য পোতাশ্রয়, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্যবাজার নির্মাণ এবং পুনর্বাসনসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে আহরিত/উৎপাদিত মাছের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে বাজার ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন; রোগমুক্ত চিংড়ি পিএল (SPF BTS) উৎপাদনে বাগদা/গলদা Brood Management Center (BMC) প্রতিষ্ঠা এবং ৩টি ফিস হেলথ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ১টি রেফারেন্স ল্যাবসহ ৪টি ফিস কোয়ারেন্টাইন ল্যাব এবং ৩টি পিসিআর ল্যাব পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন করা হবে।

কম্পোনেন্ট ৩: মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং জীবিকায়নে পেশার রূপান্তর: এ কম্পোনেন্ট এর আওতায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের চাহিদা অনুযায়ী বিনিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানপূর্বক সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনাসহ তাঁদের ক্ষমতায়ন এবং প্রতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা হবে। এর ফলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক মৎস্য আহরণ নির্ভশীলতা হ্রাসপূর্বক টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হবে। অধিকন্তু মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায়ন এবং জীবিকায়ন উন্নয়নে পেশার রূপান্তরপূর্বক টেকসই সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও আহরণে কৌশল প্রণয়ন। উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৪৫টি উপজেলার ৪৫০টি গ্রামে 'মৎস্যজীবী গ্রাম (Fishers Village)' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে community co-management মৎস্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে। এছাড়া ১০০টি আদর্শ মৎস্যজীবী গ্রাম (Model Fishing Village- MFV) প্রতিষ্ঠা করে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান এর মাধ্যমে মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রামে কমিউনিটি সঞ্চয় গ্রুপ এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, ৬০% অভীষ্ট সুফলভোগীদের আবর্তক তহবিল প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত, মৎস্যজীবী পরিবারের ১৪,৪০০ যুবক এবং মৎস্যজীবীকে বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান, প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি প্রডিউসার গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৯০টি যুব মেলা/উৎসব এবং ৬টি কর্ম মেলা (Job Fair) আয়োজন করা এবং মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে উপজেলা পর্যায়ে ৪৫টি মৎস্যজীবী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা এবং তা সংশ্লিষ্ট ৩টি আঞ্চলিক পর্যায়ের ফেডারেশন এর সাথে সংযুক্ত করা হবে।

কম্পোনেন্ট ৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ: প্রকল্প পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর প্রধান দপ্তরের মাধ্যমে ৩টি আঞ্চলিক (বিভাগীয়) দপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন ৬ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৭ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ৭৫ জন সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা, এবং সহায়ক অন্যান্য অফিসিয়াল-এর সংস্থান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে দেশি এবং বিদেশি পরামর্শক নিয়োজনপূর্বক কারিগরি সেবা প্রদানের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের টেকসইকরণ (Project sustainability)
প্রকল্পটির কার্যক্রম Environmental Conservation Regulation (ECR), ১৯৯৭ অনুযায়ী ক্যাটাগরি বি-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরিবেশের ওপর কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতি হ্রাস ও ক্ষতিপূরণের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং অভীষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাস/নিরসনে কন্সালটেশন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিগত ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি যথাসম্ভব পরিহার করায় সামাজিক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি প্রশমিত হবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকার জলরাশিতে কার্যকরভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। জলবায়ু সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো তৈরি/পুনর্বাসন ইত্যাদি সেবা বিস্তারের মাধ্যমে আহরিত মৎস্যের অবচয় হ্রাস ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নপূর্বক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরকে পুনর্বিন্যাস করে 'Volume to Value' -এর ওপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক টেকসই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং জীবীকায়নে পেশার ক্রম রূপান্তর, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন কার্যকর করার দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

উপসংহার (Conclusion)
প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যয়ে সর্বোচ্চ গুণগতমান বজায় রেখে সেবা বা পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করে; যা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উৎকর্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর তার প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সীমাবদ্ধ বাজেট, স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রোটিন চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত দুরূহ লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের রয়েছে সাফল্যের ইতিহাস। প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বের অভিজ্ঞতা, পেশাদারিত্ব আর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা SCMFP'র সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। সর্বোপরি প্রকল্পটি সুনীল অর্থনীতির সুফল অর্জন এবং বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরে ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের।

---

[১]প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: pdscmfp@fisheries.gov.bd)
[২]প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সী-উইড ঃ সুনীল অর্থনীতিতে সম্ভাবনার নতুন দ্বার

Seaweed : An Opportunity to Access in Blue-Economy

মোহাম্মদ রেদোয়ানুর রহমান[১], মনিষ কুমার মন্ডল[১] ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আবছার খান[২]

Abstract

Seaweed is a kind of green, red or brown pigmented marine algae with no true leaves, stem other than a holdfast to attach and serving as an excellent source of nutrition, good habitat, nutrient buffer and extraction mechanism in the marine ecosystem. There are about 221 species of seaweeds found in South-east Asia among which 145 and 110 species used as food and agar production respectively. Moreover, seaweed is used for medicine, cosmetics, emulsifier ceramic, glaze, polishing agent, fish and cattle feed production. Seaweed culture was initiated in Tokyo during 1670 and the demand for seaweed has made the culture popular by adopting methods like long line, hanging rack or others. Seaweed offers omega-3s: EPA, DHA, varying levels of protein, high iodine content, several vitamins and minerals which are essential to prevent cardiac diseases, control blood pressure, prevent goiter and also serves as anti-oxidant and anti-cancerous agent. There are 116 species of seaweed observed in Bangladesh among which red seaweed *Hypnea sp.* is cultured in three locations of Cox's Bazar coast, Saint Martin Island, Inani and Bakkhali with hanging rope method. The yield of 60-80 Kg can be produced from 4 m^2 of water. Integrated approach in seaweed culture in shrimp farm and the involvement of coastal impoverished workforce in the culture of seaweed, processing industries development, valu added products and exporting at international market will make the seaweed as an important candidate in exploration of the blue economy from the Bay of Bengal.

প্রকৃতির এক বিশাল সম্পদভাণ্ডার হলো সমুদ্র। বাংলাদেশে সমুদ্রজাত সম্পদের রয়েছে অপার সম্ভাবনা যার সিংহভাগই আমাদের অজানা। সী-উইড তেমনই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র সম্পদ। সী-উইড হলো এক প্রকার সামুদ্রিক শৈবাল যেটি সমুদ্রের অল্প গভীরতায় শক্ত বা পাথুরে অবলম্বনে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে। সী-উইড অতি আদিম প্রজাতির উদ্ভিদ যাদের সত্যিকারের শিকড়, কাণ্ড ও পাতা নেই এবং হোল্ডফাস্ট নামক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশের শক্ত পদার্থের সাথে লেগে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণিদের খাবারের উৎস ও বাসস্থান প্রদান করে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে সী-উইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া নিউট্রিয়েন্ট বায়োএক্সট্রাকশন ও বাফারিং এর মাধ্যমে সী-উইড সমুদ্রের পানির পুষ্টি এর ভারসাম্য রক্ষা করে। সমুদ্রে প্রধানত বাদামি, সবুজ ও লাল এই তিন রঙের সী-উইড পাওয়া যায়।

চিত্র: বাদামি, সবুজ ও লাল সী-উইড

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মোট ২২১টি প্রজাতির বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইড পাওয়া যায়: যার মধ্যে প্রায় ১৪৫ টি খাবার হিসেবে এবং ১১০টি প্রজাতি অ্যাগার বা ফাইকো-কলয়েড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন উপকূলে ১০২ টি গ্রুপের প্রায় ২১৫ প্রজাতির সী-উইড পাওয়া যায়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সস্টিটিউট এর গবেষকরা উপকূলীয় এলাকায় ১১৬ প্রজাতির সী-উইডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। স্বচ্ছ পানি ও পাথুরে তলদেশ এর কারণে সেন্ট মার্টিন সী-উইডের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়াও টেকনাফ, বাকখালী, ইনানী, কুয়াকাটা এবং সুন্দরবনেও সী-উইডের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সী-উইড এর প্রজাতির মধ্যে রয়েছে *Caulerpa racemosa, Enteromorpha sp, Gelidiella tenuissima, Gelidium pusillum, Halymenia discoidea, Hypnea pannosa,*

সী-উইড চাষের ইতিহাস ও বর্তমান উৎপাদন চিত্র (History of sea weed culture and current production trend)

১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে জাপানের টোকিও-তে প্রথম সী-উইড এর চাষ শুরু হয় এবং ১৯৪০ সাল নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ জনপ্রিয় হয়। জাপানের পাশাপাশি ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য এশিয়ান দেশসমূহে সী-উইড এর চাষ বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সী-উইডের বার্ষিক চাহিদা ১৬ মিলিয়ন মেট্রিকটন যার শতকরা ৯৯ ভাগই এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। চীন একাই বর্তমান চাহিদার অর্ধেক পরিমাণ সী-উইড উৎপাদন করে।

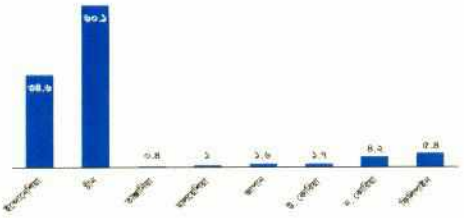

চিত্র: পৃথিবীর সী-উইড উৎপাদনকারী দেশসমূহ

বর্তমানে বিশ্বে সী-উইড উৎপাদনে আটটি শীর্ষ দেশ হলো চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও তাঞ্জানিয়া। বাংলাদেশে চাষকৃত সবচেয়ে পরিচিত সী-উইড হলো *Hypnea sp.* যা এক প্রকারের লাল শৈবাল। উচ্চ তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও তীব্র আলো সহ্য করতে পারার ক্ষমতা একে ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলে চাষের উপযোগী করে তুলেছে। তাছাড়াও বাংলাদেশে *Euchema sp.* চাষের সম্ভাবনা রয়েছে যা দ্বারা কারাগিনান উৎপাদন করা হয় এবং এই কারাগিনান প্রসাধনী ও ফুড প্রসেসিং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

চাষ পদ্ধতি (Culture system)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত লং লাইন বা রোপ, ভাসমান র‍্যাক, ভাসমান ও স্থায়ী খাঁচা এবং ঝুলন্ত নেট এসব কাঠামোতে সী-উইড চাষ করা হয়। 'অফ বটম' বা তলদেশ থেকে উপরে এবং 'অন বটম' বা তলদেশের সাথে সংযুক্ত এই দুই পদ্ধতিতেই সী-উইড চাষ করা হয়। ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সী উইড চাষ করার জন্য ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, শক্ত বা পাথুরে তলদেশ, লবণাক্ত ও আধাস্বচ্ছ পানি এবং পানির উপযুক্ত পরিচলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ফসল চাষের তুলনায় সী-উইড চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে কম। কারণ এখানে কোন সার, কীটনাশক ও দেখাশোনার খরচ এর প্রয়োজন হয়না। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত পরিবেশে ও কাঠামো নির্মাণকরে আমাদের দেশে কক্সবাজার উপকূলে প্রতি চার বর্গ মিটারে এ মাত্র ১২০০ টাকা ব্যয় করে প্রতি ১৫ দিনে ৬০ থেকে ৮০ কেজি সী-উইড উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতি বছরে অক্টোবর হতে এপ্রিল এই ছয় মাস সী-উইড চাষ করা সম্ভব এবং সী-উইডের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হওয়াতে প্রতি মাসে দুইবার সংগ্রহ করা যায়। প্রতি বর্গ মিটারে সী-উইড উৎপাদন এর গড় খরচ ২০০ টাকা এবং উৎপাদিত সী-উইড এর মূল্য গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। বলা হয়ে থাকে যে, যদি ১০০ একর এলাকাজুড়ে সী-উইড চাষ করা হয় তবে ওই পরিমাণ সী-উইড দিয়েই একটি সী-উইড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি চালানো সম্ভব। সী-উইড প্রধানত শুকনো অবস্থাতে খাদ্য হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। ২০০ কেজি সী-উইড শুকিয়ে ৪০ কেজি শুকনো সী-উইড পাওয়া যায়। প্রতি মণ (৪০ কেজি) শুকনো সী-উইড এর বাজার দর ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা, যেখানে প্রতি মণ কাঁচা সী-উইডের মূল্য ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণে অন্যান্য ফসল চাষ করা দুষ্কর তাই সেখানে সী-উইডের চাষ হতে পারে খুবই লাভজনক।

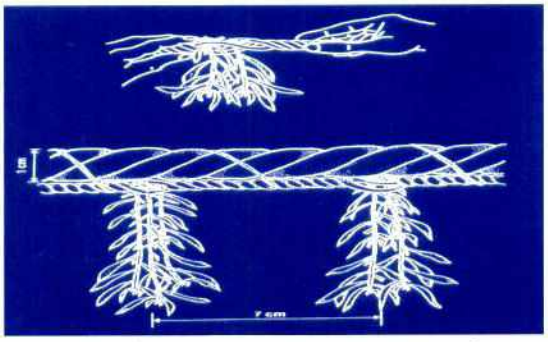

চিত্র: সী-উইড উৎপাদনের জন্য রোপ পদ্ধতি

সী-উইড এর গুরুত্ব ও ব্যবহার (Importance and uses of Seaweed)

সী-উইড এ রয়েছে উন্নত মানের পুষ্টিগুণ। প্রায় সব ধরনের ভোজ্য সী-উইডে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, কপার, আয়রনসহ প্রচুর খনিজ পদার্থ। সী-উইড খুব কম ক্যালরি ও ফ্যাট সমৃদ্ধ এবং প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন (ভিটামিন C, D, E, K এবং ফলিক এসিড) এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সী-উইড এ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ গরুর দুধের চেয়ে দশগুণ বেশি এবং একইসাথে ভিটামিন D উপস্থিত থাকার ফলে ক্যালসিয়ামের আত্তীকরণ ভালো হয়। অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড থাকার কারণে সী-উইডের প্রোটিন অত্যন্ত উন্নতমানের হয়। সী-উইড অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের ভালো উৎস যা হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সী-উইড থেকে কারাগিনান, অ্যাগার মিডিয়া, প্রয়োজনীয় ঔষধ, সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য উপকরণ, প্রসাধনী এবং খাবার ও কাপড়ের রঙ তৈরি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সী-উইড সমূহ কাগজ ও কাপড়, ইমালসিফায়ার, জেল ও ঘনীকরণ পাউডার, আঠা, প্যাকেটের আবরণ, সিরামিকের গ্লেজ, চামড়াজাত বস্তুর পলিশিং উপাদান এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যের বাইন্ডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সী-উইড জৈব সার, মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাকৃতিক উৎসজাত স্বাস্থ্যকর খাদ্য (functional food) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক উৎসের স্বাস্থ্যকর খাবার (functional food)। আমাদের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী মাছ, শুঁটকি ও অন্যান্য সবজির সাথে সী-উইড রান্না করে খায়। তাছাড়া স্যুপ, সস, পিঠা, সালাদ, চানাচুর এসব তৈরিতেও সী-উইড ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশে সী-উইডের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম (Seaweed research and expansion in bangladesh)

বাংলাদেশে সী-উইডের চাষের প্রসারের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ

কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI)' এর খামারভিত্তিক গবেষণা বিভাগ এর আওতায় নুনিয়াছড়া এলাকার কৃষকদের সী-উইড চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; যেখানে মুলত *Hypnea sp* এর চাষ করা হয়। পূর্বে সী-উইড সংগ্রহের সময় চাষিরা বীজ বের করে নিতো ফলে পরে সেগুলোর আর বৃদ্ধি হতো না। কিন্তু ট্রেনিং এর পরে তারা সেটি থেকে বিরত থাকায় সী-উইডের বৃদ্ধি ভালো হচ্ছে বলে জানা গেছে। কক্সবাজারে অবস্থিত সী-উইড ল্যাবরেটরীতে সী-উইডের টিস্যু কালচার এবং সী-উইডের বীজ উৎপাদনসহ অন্যান্য গবেষণা চলমান রয়েছে। গত বছর বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্ট এসোসিয়েশন (BAEA) এর "Potential of Blue Economy in Transforming Future Bangladesh" শীর্ষক আলোচনায় বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমি ও ব্লু-বায়োটেকনোলজির প্রসারে সী-উইডের সম্ভাব্য ভূমিকা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ব্লু-বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সী-উইডের বীজ উৎপাদন, সী-উইড হতে অতিমূল্যবান প্রাকৃতিক উৎসজাত স্বাস্থ্যকর খাদ্য (functional food), প্রসাধনী ও বিভিন্ন ঔষধ তৈরি করা যায় যা আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (FAO) এর প্রজেক্ট Technical Cooperation Programme (TCP) বাংলাদেশে সী-উইডের বর্তমান উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাত ও রপ্তানির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সী-উইডের চাষ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও একটি জাতীয় নীতিমালা ও অবকাঠামো নির্ধারণে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করছে। বাংলদেশের ৭১০ কিমি উপকূলীয় এলাকা সী-উইড চাষের জন্য উপযুক্ত স্থান। মৎস্য অধিদপ্তরের 'Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project' এর মাধ্যমে সী-উইড চাষ উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে সী-উইডের চাষ জোরদার করলে তা দেশের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। সী-উইডের চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বেকারদের কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য সী-উইডের চাষ একটি লাভজনক ক্ষেত্র তৈরি করবে। মলাস্ক, চিংড়ি, কাঁকড়া ও সামুদ্রিক মাছের সাথে সী-উইডের মিশ্র চাষ করার উত্তম সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ির সাথে সী-উইডের সমন্বিত চাষ করার মাধ্যমে চিংড়ি চাষের বর্জ্য প্রাকৃতিকভাবেই পরিশোধন সম্ভব। আমরা গবেষণাগার, খাদ্য, ঔষধ ও প্রসাধন শিল্পে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যে পরিমাণে কারাগিনান ও অ্যাগার আমদানি করে থাকি যা আমাদের দেশীয় সী-উইড থেকেই উৎপাদন সম্ভব এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। বর্তমানে শুরু করা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ওপর নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সী-উইডের চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে চিংড়ির পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় সী-উইড এর একটি বড় সম্ভাবনাময় খাতের সৃষ্টি হবে।

চিত্র: কক্সবাজার উপকূলে সী-উইড চাষ

উপসংহার (Conclusion)

সম্ভাবনাময় সী-উইড এর চাষ সম্প্রসারিত করতে হলে বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে যেমন সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সংকট, আর্থসামাজিক প্রতিকূলতা, দক্ষ জনশক্তির, অভিজ্ঞ চাষী ও উদ্যোক্তার অভাব, প্রায়োগিক গবেষণার অপর্যাপ্ততা, খাদ্য হিসেবে সী-উইডের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি। অপ্রচলিত সমুদ্রসম্পদ সী-উইডকে বহুল প্রচলিত ও লাভজনক সমুদ্রসম্পদে পরিণত করতে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক গবেষণার প্রয়োজন। সী-উইড এর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে সী-উইড চাষের জন্য উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণ, কাঠামো তৈরি ও চাষের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, এলাকাভিত্তিক সার্ভে টিম গঠন, বীজ উৎপাদন ও টিস্যু কালচার প্রসারিত করা, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, সী-উইডের অর্থনৈতিক গুরুত্ব জনসমক্ষে প্রচার করা ইত্যাদি। এছাড়াও মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা সী-উইড হতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, অতিমূল্যবান প্রাকৃতিক উৎসজাত স্বাস্থ্যকর খাদ্য (functional food), প্রসাধনী ও বিভিন্ন ঔষধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করলে সী-উইডের ব্যবহার ও রপ্তানি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যাবে যা বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

---

[১]প্রভাষক, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
[২]উপ-প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]প্রফেসর, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বন্য রাণী মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামে অভিযোজন
Adaptation of Wild Rani Fish in Aquarium

প্রফেসর ড. মোহাঃ তরিকুল আলম

Abstract

There are many lucrative small fish species in Bangladesh having cheerful ornamental potentials. These have to be only domesticated, breed in captivity, and popularized nationally and internationally. Then aquarium business will get a new momentum- the country will save huge money. It will play vital role in global ornamental fish trading and also earn a lot of foreign currency. Rani fish (*Botia dario*) is one of them. So, with a view to adapt wild Rani fish was collected and stocked in aquarium of the Laboratory of Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Sylhet Agricultural University, Sylhet. Different feeds available in the local market were tried to feed the fish on trial and error basis but failed. After two months two formulated feeds were developed i.e., katchki fish meal and market fish meal based feed, and Rani fish was successfully fed with them.

বাহারি মাছ হচ্ছে সেসব ছোট আকারের জীবিত রঙিন মাছ যাদেরকে বাসাবাড়িতে কিংবা খোলা জায়গায় অ্যাকুয়ারিয়ামে কিংবা বাগানের নালায় গণমানুষের আনন্দদানের জন্য রাখা হয়। এ কারণে এদেরকে লাইভ জুয়েলও (live jewels) বলা হয়। এদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ হলো এদের উজ্জ্বল রং, আকর্ষণীয় স্বভাব এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতা। বস্তুত বাহারি মাছ পাখির পরই সবচেয়ে বেশি

চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক জীবিত প্রাণী এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফটোগ্রাফির পরই বাহারি মাছ চাষের শখের অবস্থান। আজকাল বাহারি মাছের ব্যবসা একটি অত্যন্ত লোভনীয় ব্যবসা। বর্তমানে বাহারি মাছের বড় বাজার হলো আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান। কিন্তু বিশ্ববাজারের মোট বাহারি মাছ রপ্তানির ৬৫% এরও বেশি দখল করে আছে এশিয়া মহাদেশ। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য আরও উৎসাহব্যঞ্জক খবর হলো বিশ্ববাজারে বাহারি মাছের ব্যবসার ৬০% ভাগের বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বাহারি মাছ শুধু আমদানি করে, রপ্তানি করে না। কিছু কিছু খামারি আছে যারা বাহারি মাছের প্রজনন করে এবং পোনা সরবরাহ করে; কিন্তু সবই বিদেশি মাছ। তবে এ দেশের বাহারি মাছের স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরও বিদেশে রপ্তানি করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে ১৪০ এর বেশি প্রজাতির ছোট মাছ (SIS) আছে যার অধিকাংশই বাহারি মাছ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদের মধ্যে কিছু মাছকে বন্য (wild) অবস্থা থেকে নিয়ন্ত্রিত (captive) পরিবেশে অভিযোজন করতে হবে, প্রজনন করাতে হবে এবং কিছু মাছকে রঙিন করতে হবে। এর পরের কাজ হবে এগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনপ্রিয় করে তোলা। তবেই বাংলাদেশে বাহারি মাছের ব্যবসা নতুন মাত্রা পাবে। ফলে একদিকে যেমন দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি পাবে; অন্যদিকে তেমনি দেশ বিদেশি বাহারি মাছ আমদানির খরচ থেকে সাশ্রয় হবে এবং দেশীয় বাহারি মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাহারি মাছের বাণিজ্যে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের বাহারি রাণী মাছ (Our lucrative rani fish)

রাণী মাছ (*Botia dario*) বাংলাদেশের একটি ছোট মাছ (SIS)। একে Bengal loach-ও বলা হয়। এটি Botidae পরিবারভুক্ত একটি সুস্বাদু মাছ। এর কালো রঙের দেহের উপর হলুদ সোনালি রঙের ডোরাকাটা দাগ এ খাবার মাছটিকে চমৎকার বাহারি মাছে পরিণত করেছে। এছাড়াও পার্শ্বীয়ভাবে চাপা দেহবিশিষ্ট মাছটির চার জোড়া বার্বেল আছে। মাছটি প্রধানত নদীতে, পরিষ্কার ঝর্ণার পানিতে এবং বালুকাময় জলাভূমিতে বাস করে। রাণী মাছ ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। আইইউসিএন বাংলাদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী মাছটি আধিক্যের দিক থেকে বিপদজনক অবস্থায় (endangered) রয়েছে। যাহোক, অধিক আহরণ, আবাসস্থল ধ্বংস হওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে রাণী মাছের আধিক্য দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ মাছের ইকোলজি (ecology), বায়োমেট্রিক্স (biometrics), লেংথ ওয়েট (length-weight) এর সম্পর্ক, কন্ডিশন ফ্যাক্টর (condition factor) ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এ মাছের বিশেষ করে বাংলাদেশে বন্য অবস্থা থেকে অ্যাকুয়ারিয়ামে খাপ খাওয়ানো কিংবা কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রজননের তথ্য পাওয়া যায় না।

বাহারি মাছ হিসেবে অ্যাকুয়ারিয়ামে রাণী মাছ এর অভিযোজন (Domesticated of rani fish in aquarum)

রাণী মাছকে বাহারি মাছ হিসেবে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে অ্যাকুয়ারিয়ামে কিংবা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খাপ -খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদীয় মাৎস্যচাষ বিভাগের গবেষণাগারে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সুনামগঞ্জের মহাশিং নদী এবং উফা বিল থেকে পোনা মাছ সংগ্রহ করে অ্যাকুয়ারিয়ামে মজুদ করা হয়। অ্যাকুয়ারিয়ামের আকার ছিল ০.৪৬মি.X০.৪৬মি.X০.৭৬মি.। প্রতি অ্যাকুয়ারিয়ামে পোনা মজুদ করা হয় ৩০টি। বাজারে বিদ্যমান খাবার যেমন মেগা কোম্পানির কৈ মাছের স্টার্টার, অপ্টিমাম, নোভা, ওসাকা-২০০০, ওসাকা গ্রিন-১ ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোনো খাবারই রাণী মাছের পোনাকে খাওয়ানো সম্ভব হয়নি। এতে করে মজুদকৃত মাছের মাথা মোটা এবং দেহ পাতলা হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাজারে বিদ্যমান ফিসমিল দিয়ে তৈরি খাবার অ্যাকুয়ারিয়ামের রাণী মাছের পোনাকে খাওয়ানো সম্ভব হয়। এটা দেখে বাজার থেকে কেচকি মাছের শুঁটকি এনে ফিসমিল বানিয়ে খাবার তৈরি করা হয় এবং গবেষণার মাছকে খাওয়ানো সম্ভব হয়।

অ্যাকুয়ারিয়ামে রাণী মাছকে খাওয়ানোর জন্য নতুন দুটি খাবার সফলভাবে তৈরির পর রাণী মাছের দেহের বৃদ্ধির ওপর খাবার দুটির কর্মক্ষমতা (performance) যাচাই করার জন্য ৪ মাসের একটি গবেষণা করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত মাছের বৃদ্ধি সংক্রান্ত ফলাফলের তথ্য নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো (সারণি ১)। গবেষণা চলাকালীন অ্যাকুয়ারিয়ামের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে কার্পজাতীয় মাছ চাষের অনুকূল সীমার মধ্যে পাওয়া যায়।

সারণি ১ হতে বোঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে কেচকি মাছের নিজে তৈরি ফিসমিল দিয়ে বানানো খাবার বাজারে বিদ্যমান ফিসমিল দিয়ে তৈরি খাবারের চেয়ে বেশি ভালো। তবে কোন্ খাবারটি রাণী মাছ বেশি হজম করতে পারছে এবং পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারছে তা পরীক্ষা করেই কেবল এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

এ গবেষণাটি শেষ হয় ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে। এরপর থেকে এ গবেষণাগারে রাণী মাছের কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা করা হয়নি- শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় খাবার দিয়ে বড় করা হয়েছে। বর্তমানে এ মাছের গড় দৈর্ঘ্য ৮.৯ ± ১.২ সেমি এবং ওজন ৬.১৩২ ± ১.৯২৪ গ্রাম। বর্তমানে মাছের পেটে ডিম পাওয়া গেছে অর্থাৎ মাছটি অ্যাকুয়ারিয়ামে সফলভাবে অভিযোজিত হয়েছে।

বাহারি মাছের চাষে অন্য ধরনের মাছ চাষের চেয়ে তুলনামূলক কম জায়গা ও মূলধন হলেই চলে। বাহারি মাছ চাষের খামার চালু করার শুরুতে অত্যাধুনিক বা জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। কেবল মাছের আচরণ, অভ্যাস

সারণি ১: পৃথক দুই ধরণের ব্যবস্থায় (treatments) রাণী মাছের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ামকের (parameters) তথ্য

নিয়ামক (Parameters)	ব্যবস্থা	
	ব্যবস্থা ১ (কেচকি মাছের ফিসমিল দিয়ে তৈরি খাবার)	ব্যবস্থা ২ (বাজারে বিদ্যমান ফিসমিল দিয়ে তৈরি খাবার)
প্রাথমিক গড় ওজন (গ্রাম)	১.৩৫ ±০.২৬	১.৩৫ ±০.২১
চূড়ান্ত গড় ওজন (গ্রাম)	২.৯৩ ±০.৫৩	২.৪৫ ±০.৩৮
গড় ওজন প্রাপ্তি (গ্রাম)	১.৫৫ ±০.০৮	১.১০ ±০.০২
প্রাথমিক গড় দৈর্ঘ্য (সেমি)	৫.৪৮ ±০.২৯	৫.৪৮ ±০.৩০
চূড়ান্ত গড় দৈর্ঘ্য (সেমি)	৬.৫১ ±০.৩১	৬.২৮ ±০.৩২
গড় দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি (সেমি)	১.০৩ ±০.০৭	০.৮০ ±০.০২
শতকরা ওজন প্রাপ্তি (%)	১১৭.০৪ ±৬.২২	৮১.৪৮ ±১.৩১
শতকরা দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি (%)	১৮.৮০ ±১.২১	১৪.৬০ ±০.৫২
সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধি হার (Specific growth rate) (%, gro wth per day)	০.২২ ±০.০১	০.১৭ ±০.০০
খাদ্য পরিবর্তন হার (FCR)	৪.৮১ ±১.৭	৫.৬৪ ±১.৫
বাঁচার হার (%)	৯৩.৩৩ ±০.০	৮৪.৪৪ ±১২.৬২

ও জৈবিক বিষয় সংক্রান্ত মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলেই চলে। এ মাছের চাষ পল্লী অঞ্চলের সাথে সাথে শহরেও সম্ভব। বাসাবাড়ির পেছনের এক টুকরা ছোট জায়গার কিছু পরিবর্তন করে এমনকি ছাদেও এ মাছের চাষ করা যেতে পারে। যেহেতু এ মাছের চাষে কম লোকবল হলেও চলে, সেহেতু মহিলা কিংবা বয়স্ক পুরুষরাও বসতবাড়িতে একাজ করতে পারে। এখানে সামান্য কিছু অত্যাধুনিকতা আছে তা হল হিটার (যদি প্রয়োজন হয়), অ্যারেটর ও পাওয়ার ফিল্টার ইত্যাদির ব্যবহার। কৃত্রিম প্রজনন করলে কিছু আধুনিকতার প্রয়োজন হয়। এভাবে দেশীয় মাছকে বাহারি মাছ হিসেবে জনপ্রিয় করতে পারলে দেশে এ মাছের ব্যবসা ব্যাপক প্রসার লাভ করবে- চাকরির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে, প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাহারি মাছ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। একটি দেশীয় মাছ বাহারি মাছ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশীয় অন্য মাছকে বাহারি মাছে পরিণত করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে বাহারি মাছের খামারিদের মধ্যে। এতে করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বাহারি মাছ চাষে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার (Conclusion)

গবেষণাগারের অ্যাকুয়ারিয়ামে ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত বার্ষিক ১০% মৃত্যুহার সহকারে বেঁচে আছে এবং প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিসহ পরিপক্ব হয়েছে- এর অর্থই হলো বন্য রাণী মাছ অ্যাকুয়ারিয়ামে অভিযোজিত বা অভ্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে রাণী মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে অভ্যস্তকরণ এটাই প্রথম। এখন এর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রজনন (captive breeding) করা প্রয়োজন। সফল প্রজননের পর মাছটির দেহের রং আরও গাঢ় করার জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে মাছের আকার বড় করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রফেসর, মৎস্যচাষ বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (ই-মেইল: talam.aq@sau.ac.bd)

মৎস্যখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা এর অপরিহার্য ভূমিকা

Indispensable Role and Challenges of Fisheries Knowledge Repository System

এস. এম. মনিরুজ্জামান[১] ও এ. কে. এম. আমিনুল্লাহ ভূঞা[২]

Abstract

The challenges of the fisheries sector of Bangladesh in attaining sustainable fisheries growth are multi-faceted and complex. All these challenges can only be met effectively by coordinated activities supported by adequate knowledge. Knowledge needs not only to be generated but also to be put into proper use for the development of a sector. Right knowledge needs to be made available for the end users (educationists, researchers, extension providers, farmers, consumers, policy makers, processors, etc.) at the right time in a quick manner. The vast knowledge accumulation, processing and retrieval, in other words, process-standardization, validation and digitization, for use of the end users require support of ICT (Information and Communication Technology). The way this huge task is done calls for a knowledge repository. Department of Fisheries (DoF) has already started doing this in the form of website and/or web portal. However, DoF's on-going project NATP-2 has very recently started doing the needful for establishing a comprehensive knowledge repository, the Fisheries Knowledge Repository System (FKRS). Besides, the challenge of integration of fisheries knowledge in agricultural as well as Dof knowledge repositories, for the sake of continuation and consolidation of fisheries knowledge, even after the end of project (NATP-2) period, appears to be the greatest challenge for the FKRS to be fully capable of handling the vested task. It is expected that the article will inform the present and future end-users about the presence, usefulness, and the usability of the FKRS.

বাংলাদেশের মৎস্যখাতে বিগত এক দশকে সরকারের নানাবিধ মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি সেবা প্রদানের ফলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানাবিধ স্বীকৃতিসহ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মৎস্যখাতের উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখার পাশাপাশি দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে আসীন হওয়ার ক্ষেত্রে আরও আধুনিক ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। সহজে বাস্তবায়নযোগ্য এবং ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নবর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিকল্পিত উপায়ে মোকাবেলা করতে হবে:

- উৎপাদন এবং মুনাফার হার বৃদ্ধি করা;
- উচ্চ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা;
- উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এবং সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত Vulnerability'র সাথে খাপ খাওয়ানো;
- ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান;
- মানসম্মত পোনা এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রবর্তন;
- উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতির অনুশীলন সকল চাষির নিকট জনপ্রিয় করে তোলা;
- উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ; এবং
- দুর্বল পরিকাঠামো, প্রভৃতি।

এই চ্যালেঞ্জসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক ও স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন, ক্রমান্বয়ে কমে আসা সম্পদের (নদী-নালা, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, জলাশয় ইত্যাদি) সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৎস্যসম্পদ সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি করা। এটি সম্ভব কেবল বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, বাজারমুখী, স্থায়িত্বশীল একটি বাণিজ্যিক খাতে রূপান্তরিত করে। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, মৎস্য নিবিড়তা (fisheries intensification) ও বিচিত্রতা /বহুমুখীকরণ (diversification) বৃদ্ধি, মৎস্য যান্ত্রিকীকরণ, মূল্য সংযোজন এবং কার্যকর বাজার সংযোগের সাহায্যে সরবরাহ ব্যবস্থার (supply chain) প্রতিষ্ঠা এবং চাষির মুনাফা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ সমন্বিত উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage: অর্থ, প্রযুক্তি, চাষ উপকরণ ইত্যাদির সংযোগ) এবং সম্মুখ সংযোগ (forward linkage: উৎপাদিত মানসম্মত মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি

উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, আহরণপরবর্তী পরিচর্যায় শীতল ব্যবস্থা (cool chain) -এর প্রবর্তন, ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টি, ইত্যাদির সংযোগ) সমন্বিতভাবে কার্যকর থাকবে। এই উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থার (supply chain) প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বর্ণিত চ্যালেঞ্জ এবং প্রয়োজনীয়তাসমূহের সমন্বিত ও টেকসই সমাধান করাই এখন সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একক চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন: প্রয়োজন-নির্ভর (need based) দেশ বিদেশের হাজারো উৎস থেকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা কাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারীর (শিক্ষক, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং সর্বোপরি চাষি, বিশেষ করে অগ্রসর চাষি সম্প্রদায়, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও ভোক্তা) ব্যবহার উপযোগী করে তথ্য/জ্ঞানভাণ্ডার (repository) গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু কাজ ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। তবে 'এনএটিপি-২ প্রকল্প' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্বার্থে ব্যাপকভিত্তিক একটি মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা (Fisheries Knowledge Repository System -FKRS) গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করেছে।

কম্পিউটারভিত্তিক একটি ডিজিটাল জ্ঞানভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a present-day computer-based digital knowledge repository)

ক. **কেন্দ্রিকতা** (Centralization): বিভিন্ন মাধ্যমের (মুদ্রিত/অমুদ্রিত, ডিজিটাল/নন-ডিজিটাল, সনাতনি/তথ্যপ্রযুক্তি সমর্থিত ইত্যাদি) হাজারো তথ্যের কেন্দ্রিয় সমাবেশ এই জ্ঞানভাণ্ডার। তথ্যাদি অতি দ্রুত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাত করা যায়। অভীষ্ট ব্যবহারকারীরাও দ্রুত এবং সহজে এর থেকে উপকৃত হতে পারেন;

খ. **খরচ বাঁচায়:** ডিজিটাল পদ্ধতিতে জ্ঞানভাণ্ডার সুলভ মূল্যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে পারে। আনুষ্ঠানিক শ্রেণিকক্ষ ছাড়াই ভাণ্ডারের সুবিধাদি ব্যবহৃত হতে পারে;

গ. **সীমিত প্রবেশাধিকার:** বিভিন্নভাবে নিঃখরচায় বা অল্প সেবামূল্য ধার্য করে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের ভাণ্ডারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করে ভাণ্ডারসমূহের কর্তৃপক্ষ কিছু আয় করতে পারেন। এসবই তাদের আংশিক পরিচালনা ব্যয় সংস্থান করায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়;

ঘ. **বিচক্ষণ ট্যাগিং** (Responsible tagging): সকল জ্ঞানভাণ্ডার অনলাইনে (Online) অনুসন্ধানযোগ্য হতে হবে যেন যে কেউ তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য বা উপাত্ত সহজে খুঁজে পায়। এর জন্য বিষয়ভিত্তিক বা তথ্যভিত্তিক নির্দেশিকা ট্যাগিং -এর প্রয়োজন আছে এবং ভান্ডারসমূহে তা থাকে;

ঙ. জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণ ও হালনাগাদ হতে হবে। একটি উন্নতমানের জ্ঞানভাণ্ডার পুরোপুরি কার্যকর করতে বিষয়ভিত্তিক প্রায় সকল তথ্য/উপাত্তের সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং সর্বশেষ তথ্য/উপাত্তের সংযোজন ঘটাতে হবে। তথ্য/উপাত্তের হালনাগাদকরণ একটি চলমান এবং জরুরি প্রক্রিয়া;

চ. তথ্যভাণ্ডার পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে একটি বিশেষায়িত দল। উল্লেখিত FKRS এর বহুমুখী এবং অপরিহার্য ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের স্বার্থে প্রয়োজন এই কাজে নিবেদিত একটি বিশেষ দলের, যারা এর সৃষ্টি, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্বশীলতার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

জ্ঞানভাণ্ডার এবং তথ্য-প্রযুক্তির সম্পর্ক (Inter-relationship between a knowledge repository and communication technology)

জ্ঞানভাণ্ডারে তথ্য/উপাত্ত সংগৃহীত থাকবে। তথ্য/উপাত্ত প্রেরিত বা সংগৃহীত হবে মূলত তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত অভীষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছাবে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমেই। ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ফলাফল পুনরায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমেই ভাণ্ডারে যুক্ত হয়ে ভাণ্ডারকে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে চলবে। এদের আন্তঃসম্পর্ক নিম্নরূপ:

মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of FKRS)

- মৎস্যখাতের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এবং এর স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য যেসব বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন সর্বব্যাপী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ যেন তার ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ সকল কাজের জন্য যুগোপযোগী মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার-উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার সহায়তাপুষ্ট একটি ব্যবস্থা। এই প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যই মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা Fisheries Knowledge Repository System-FKRS এর অবতারণা;
- সংশ্লিষ্ট সকলের (stakeholders) সাথে পেশাগত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি ডিজিটাল গ্রন্থাগার (library) এবং শোকেস (showcase) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মৎস্য জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা গড়ে তোলায় এনএটিপি-২ প্রকল্পের উদ্যোগ (Initiative taken by the NATP-2 Project in developing FKRS)

এনএটিপি-২ প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা; এবং

(২) চাষিদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের পণ্য বিপণনের স্বার্থে বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

এই উভয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পটি বহুবিধ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন- চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে চলেছে। প্রধানত প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাত করে তা অভীষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট দ্রুত কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই প্রকল্প কর্তৃক FKRS স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ব্যবস্থাটি (system) এমনভাবে করা হবে যেন তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে (বিশেষ করে প্রকল্প মেয়াদ শেষে) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে একটি পরামর্শক ফার্ম পর্যায়ক্রমে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পন্ন করছে:

১. প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অঙ্গে এবং সার্বিকভাবে মৎস্য অধিদপ্তরে বর্তমানে চলমান জ্ঞানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহের পর্যালোচনা;

২. FKRS যাদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজন সমীক্ষা (Need Assessment);

৩. FKRS এর রূপরেখা প্রণয়ন। এর প্রধান বিষয়সমূহ:

- তথ্যভাণ্ডারের সামগ্রী (contents) মূলত PIU-DoF, PMU-NATP-2 এবং DoF-এর কার্যক্রম কেন্দ্রিক হবে। এছাড়া মৎস্যখাতের শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ প্রাধান্য পাবে;
- তথ্যভাণ্ডারের সামগ্রী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করতে হবে এবং সহযোগী ওয়েবসাইট/ওয়েব পোর্টাল-এ যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে;
- সামগ্রী বিভিন্নরূপে রক্ষিত হতে পারে, যেমন- Word Documents, Excel Formats, Video Clips, Photographs, Statistical Graphs ইত্যাদি;
- FAQ (Frequently Asked Questions) এবং 'Key Words' যোগে তথ্য/উপাত্ত খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে;
- FKRS এর রূপরেখা প্রণয়ন এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ (user friendly) সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করতে হবে;
- দেশি-বিদেশি সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/উপাত্তের জন্য FKRS এ সুযোগ থাকতে হবে;
- তথ্য-প্রযুক্তি এবং আইনী বিষয়ে নিরাপত্তা এবং Compliance বিষয় দুটি যথাযোগ্য গুরুত্ব পাবে;
- বিনিময় (share) ও বিশ্লেষণ (analyze) করায় এবং জ্ঞান অন্যত্র প্রেরণে সমর্থ হতে হবে;
- বিভিন্ন সিস্টেম ব্যবহার করে একটি সামগ্রিক রূপ দেয়ার (integration) এবং বিভিন্ন প্লাটফর্মের সাথে যুক্ত করার উপযোগী করতে হবে;
- মৎস্য অধিদপ্তরের একই ধরনের অপরাপর Repository/website এর সাথে যুক্ত হওয়ার বা করার মতো হতে হবে, ইত্যাদি।

৪. FKRS এর নির্মাণ, স্থাপনা ও কার্যক্ষমতা প্রকল্প তথা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই করা হবে;

৫. FKRS পরিচিতি এক বা একাধিক কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে;

৬. ভবিষ্যতে FKRS ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি 'FKRS ব্যবহার নির্দেশিকা' প্রণয়ন করতে হবে; এবং

৭. ব্যবহার নির্দেশিকার পাশাপাশি FKRS পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাও প্রণয়ন করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রাপ্তির জন্য এই ধরনের নির্দেশিকার প্রয়োজন অপরিহার্য।

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্যখাতের মতো বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খাতের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনিময়ের ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। জাতির বৃহত্তর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যখাতের কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত ও কার্যকর করায় তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। উন্নত দেশ গঠনে তথা পুষ্টির চাহিদা পূরণে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সমর্থিত FKRS এর প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals - SDGs) -এর চাহিদার আলোকে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য FKRS একটি অপরিহার্য সহায়ক উপকরণ। এক্ষেত্রে এনএটিপি-২ প্রকল্পের উদ্যোগী ভূমিকা দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক ও কার্যকর মৎস্য জ্ঞানভান্ডার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা পূরণ করবে বলে আশা করা যায়।

[১]পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: monidof@yahoo.com)
[২]পরামর্শক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

অপুষ্টি প্রতিরোধে বসতবাড়িতে মাছ ও শাক-সবজি চাষ

Homestead Gardening and Fish Farming Addressing Malnutrition

অশোক কুমার সরকার[১], ড. মোঃ মাহবুবুল আলম মিঞা[২] ও ডা. শেখ শাহেদ রহমান[৩]

Abstract

Fish plays a vital role by contributing animal source protein along with micronutrient in the diet of the people of Bangladesh. Among all the divisions Sylhet (North Eastern Region) is very potential for its plain, low lands as well hilly areas where homestead pond, river, beel (static lake), canal and haor (bowl or saucer shape shallow depression) etc. are abundant with diversified freshwater fisheries resources. Despite the local availability of nutritious food, it is not affordable to the poor and very poor households, and there is a little homestead fish and vegetable production. Evidence suggests that children present lower dietary diversity among poor quintile of population which eventually has longer impact on child nutritional status in Bangladesh. Addressing the fact, WorldFish under Suchana project has been promoting nutrition-sensitive pro-poor fish and vegetable production for poor and very poor cohort of population in the north east part of Bangladesh. Suchana has been adopting an integrated approach through delivering both nutrition specific and nutrition sensitive interventions to prevent chronic malnutrition within the critical first 1,000 days of a child's life. The goal of the 6-years program is to reduce stunting among children under two years of age by an additional 6% among 250,000 poor and very poor households. The study reveals that this initiative has increased homestead fish production 94% and among the harvested fish 72% has been used for home consumption. Due to World Fish initiatives behavioral change has been accomplished and dietary diversity has been increased from 26% to 62% and 38% to 56% respectively for women of reproductive age and children of 6 to 23 months of age. It will also contribute to realize Suchana's end goal of reducing stunting in children under two years of age in 250,000 poor households in Sylhet region.

মৎস্যচাষ বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান খাদ্য উৎপাদন সেক্টর যা খাদ্য, পুষ্টি, আয়, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছ প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। প্রাণিজ আমিষের ৬০% আসে মাছ থেকে যা পুষ্টি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ করে থাকে। শুধু তাই নয়, এটি ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার। যদিও জাতীয় খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণে এখনও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা যা দীর্ঘ সময়ের নিম্নমানের খাদ্যের ব্যবহার থেকে আসে। বাংলাদেশে প্রধানত নারী ও শিশুরা বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি, মেধার উন্নয়ন, রোগব্যাধি ও শিক্ষাগত অর্জনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এ কারণে শিশুদের পুষ্টির অবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেশের দুর্বলতার সবচেয়ে সংবেদনশীল সূচক হিসেবে দেখা হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগে প্রায় ১.২০ কোটি মানুষের বাস, যেখানে শুধু বাংলাদেশই নয় সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অপুষ্টির হার সবচেয়ে বেশি। পাঁচ বছরের কমবয়সী প্রায় ৪৯.৫% শিশু খর্বকায়; যা তীব্র অপুষ্টির পরিচয় বহন করে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জনে ৬৭ জন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মা ও শিশুদের অপুষ্টি

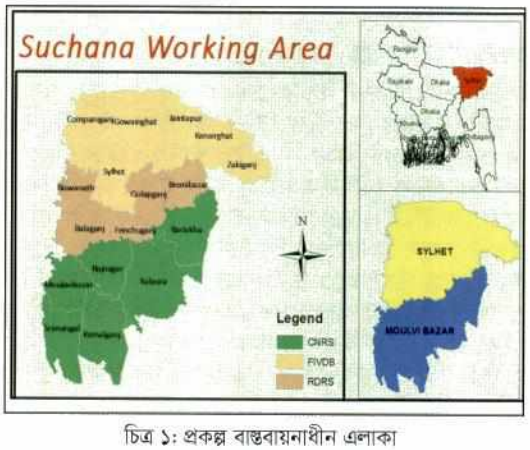

চিত্র ১: প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা

এবং খর্বতার হার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় তারা দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টিচক্রে আক্রান্ত। দু'বছরের কম বয়সী

শিশুদের এই খর্বাকৃতির হার অতিরিক্ত ৬ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইউকে এইড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত সূচনা প্রকল্পটি ২০১৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে; যা ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জন্মের প্রথম ১০০০ দিনের মধ্যে যে সকল শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয় তাদের আক্রান্তের কারণসমূহ চিহ্নিত করে দীর্ঘ অপুষ্টিচক্রের হাত থেকে বের করে আনা। মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় 'সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল'-এর নেতৃত্বে উদ্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সূচনা প্রোগ্রামের টেকনিক্যাল পার্টনার ওয়ার্ল্ডফিস অ্যাকোয়াকালচার ও ফিসারিজ বিষয়ে টেকনিক্যাল লিড হিসেবে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও সূচনা প্রোগ্রাম হর্টিকালচার কার্যক্রমে এইচকেআই এর সাথে কারিগরি সহায়তা প্রদানেও এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and objective of the project)

সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় অতিদরিদ্র পরিবারে মা ও শিশুদের পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির হার অতিরিক্ত ৬ শতাংশ কমিয়ে আনা।

সূচনা প্রোগ্রামের আওতায় ওয়ার্ল্ডফিসের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো:

ক. সুফলভোগীদের দ্বারা মাছ ও শাক-সবজির বর্ধিত উৎপাদন;

খ. মাছ ও শাক-সবজি বর্ধিত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ. সুফলভোগীদের জন্য বর্ধিত ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing agency)

সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর নেতৃত্বে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল (এইচকেআই), আন্তর্জাতিক ব্যবসা উন্নয়ন সংস্থা (আইডিই); বাস্তবায়নকারী পার্টনার হিসেবে- সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্সেস স্টাডিজ (সিএনআরএস), ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি) ও আরডিআরএস বাংলাদেশ সকলে মিলে কনসোর্টিয়াম গঠন করে এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) গবেষণা পার্টনার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন এলাকা (Project area)

সূচনা প্রকল্পটি সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ২০টি উপজেলা তথা ১৫৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অর্জিত ফলাফল ও প্রভাব (Results achieved and impacts)

এ পর্যন্ত ১ লাখ ৭৩ হাজার ১৪ জন দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র পরিবার সূচনা প্রকল্পের আওতায় সুবিধা ভোগ করছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের শাক-সবজির বীজ, মাছের পোনা ও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা অতিদরিদ্র, তাদেরকে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া মাছ চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের বিষয়টিও সূচনা প্রকল্পে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশেষ করে মা ও গর্ভাবস্থা থেকে শিশুর বয়স দু'বছর হওয়া পর্যন্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সূচনা প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার গরিব পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে মাছ ও আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ বাড়ানোর জন্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পারিবারিক আয় বাড়িয়ে অপুষ্টি প্রতিরোধে সহায়তা করছে। প্রকল্পের এসকল কর্মকাণ্ড নিচে উপস্থাপন করা হলো:

পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বর্ধনে পুষ্টি সংবেদনশীল মাছ ও শাক-সবজির চাষ (Nutrition rich fish and vegetable culture to raise income and nutrition)

সূচনার অন্যতম লক্ষ্য হলো সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ এবং শাক-সবজির উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ডফিস দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও পুষ্টি সুরক্ষিত নয় এমন পরিবারের নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যাদের মধ্যে বাচ্চা জন্মদানে সক্ষম নারী, দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী মহিলা এবং কিশোরী মেয়েরা রয়েছে। প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর থেকে ৩৭০০০ জন নারী পুষ্টি সংবেদনশীল মাছচাষের প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং এদের সবাই উপকরণ হিসেবে চুন, মাছের পোনা, মাছের খাবার পেয়েছে এবং ১৭৩০১৪ জন সুফলভোগী বসতবাড়ির আঙ্গিনায় শাক- সবজির চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন জাতের শাক- সবজির বীজ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, পুষ্টির কথা বিবেচনা করে পুকুর প্রস্তুতির সময় কোনো ধরনের বিষ অথবা ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়নি; যাতে পুকুরে অবস্থিত মলাসহ অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছ নষ্ট না হয়। শুধুমাত্র রাক্ষুসে মাছগুলো অপসারণ করা হয়। যে সকল পুকুরে মলা মাছ নেই সেখানে মলা মজুদ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে যে পরিবারগুলোর আগে নিয়মিত খাবার সংগ্রহ নিয়ে সংগ্রাম করতে হতো খাবারের পুষ্টির দিকবিবেচনা করার কোনো সুযোগই ছিল না; তারা আজ মাছ ও শাক-সবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত অংশ বিক্রয় করে বাড়তি আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

চিত্র ২: প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া

পুষ্টি সংবেদনশীল ও জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রম (Nutrition and gender sensitive activities)

পরিবারগুলোকে তাদের বাড়ির আশেপাশে মাছ এবং শাক-সবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করে খাবারে বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করছে। মাছের একক চাষের পরিবর্তে রুইজাতীয় ও তেলাপিয়া মাছের সাথে মলা মাছ চাষ করা হচ্ছে। তেলাপিয়া মাছ দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় তেলাপিয়াসহ দেশীয় ছোট মাছ নিয়মিত আহরণ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানো হচ্ছে। ব্যাপকভাবে মলা মাছের

চিত্র ৩: জাল দিয়ে মলা মাছ আহরণের পর মা ও শিশুর হাসি মুখ

পুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করায় মলা মাছ সম্পর্কে এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। ছোট ছোট পুকুরগুলোতে প্রান্তিক অঞ্চলের জনগণ রুইজাতীয় ও তেলাপিয়া মাছের সাথে মলা মাছ চাষ করা শুরু করেছে। মহিলারা যখন প্রয়োজন পানিতে না নেমেই পুকুর অথবা ডোবার পাড় থেকেই প্রয়োজনীয় মলামাছ জাল দিয়ে আহরণ করতে পারে। এছাড়া পূর্বে মলা মাছের মাথা না খেলেও সূচনা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর থেকে তারা মাথাসহ মলা মাছ খাচ্ছে এবং দুই বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে মাথাসহ মলা মাছ ভেজে পাটায় পিষে ভর্তা করে স্বাভাবিক খাবারের সাথে খাওয়ানো হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন (Cooperation and coordination with government and non-government organization)

সূচনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শনের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দিবসগুলো উদযাপনে সহায়তা করা হচ্ছে যেমন- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, কৃষি মেলা ইত্যাদি। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন- মৎস্য হ্যাচারি, পোনা উৎপাদনকারী, পোনা সরবরাহকারী, মাছের খাদ্য ব্যবসায়ী, সবজি বীজ ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে যাতে তারা সূচনা উপকারভোগী পরিবারগুলোকে গুণগতমানের উপকরণ সরবরাহসহ কারিগরি পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

সমীক্ষার ফলাফল (Study findings)

ওয়ার্ল্ডফিস ২০১৮ সালে প্রথম বছরের ৪০টি ইউনিয়নের সুফলভোগীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। যেখানে দেখা যায় যে, পরিবার প্রতি মাছের উৎপাদন ৯৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। আহরিত মাছের ৭২% মা ও শিশুদের খাদ্য তালিকায় যোগ হয়েছে। বাকি ২৮% মাছ বিক্রি করে পরিবারের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করেছে।

চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Challenges and hurdles)

পুষ্টি অসচেতনতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও সামাজিক রক্ষণশীলতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির কারণে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় বসতবাড়ির নিকটস্থ অনেক পুকর ও জমি অরক্ষিত ও অনাবাদী পড়ে আছে; যা এ অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে মা ও শিশুদের অপুষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রবাসমুখী প্রবণতাও অনাবাদ ও অপুষ্টিকে ত্বরান্বিত করছে।

উপসংহার (Conclusion)

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অপুষ্টি চক্র থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। জন্মের প্রথম ১০০০ দিন শিশুদের সুস্থতা, বিকাশ এবং বৃদ্ধির অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য পুষ্টিগত অবস্থা একটি পরিমাপক হিসেবে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র ও অপুষ্টিতে ভোগা মা, শিশু ও কিশোরীদের নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ডফিস কাজ করে যাচ্ছে। এতে সূচনা প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির হার অতিরিক্ত ৬% কমিয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

[১]প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সূচনা-ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[২]স্পেশালিস্ট, সূচনা-ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[৩]চীফ অব পার্টি, সূচনা-সেইভ দ্যা চিলড্রেন, বাংলাদেশ

আধা-নিবিড় বাগদা ও গলদা প্রদর্শনী ঘেরের ফলাফল পর্যালোচনা: SAFETI প্রকল্প

Impact Study of Semi Intensive Bagda and Golda Culture in Gher: SAFETI Project

ড. মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন

Abstract

Winrock international has been implementing the USDA- Bangladesh SAFETI Project in collaboration with national and international partners. One of the objectives of the project is to increase farm productivity of smallholder extensive shrimp and prawn farmers. The SAFETI technical team has developed and is promoting three improved farming methodologies for smallholder farmers suitable to the varying agro-ecology, especially salinity of the coastal region. The project has been implementing a set of activities to disseminate appropriate farming methodologies directly to 25,000 farmers and expects to reach thousands indirectly over the project period in 10 Upazilas of Satkhira, Khulna, Jashore and Bagerhat district. In 2017-18 production season, SAFETI implemented dissemination activities including training, coaching, demonstration, farmer field days, regular follow-up, linking with SPF/PCR tested PL, quality feed and other inputs with 378 farming groups of 9,450 farmers. After the end of the production season, the demonstration results of 378 Bagda and Golda ghers appeared promising and raised confidence in promoting semi-intensive (non-aerated) farming methodologies. A large number of demonstrations have demonstrated production 750->1000 kg and gross profit tk. 225,000-440,000 per hectare. First year results motivated neighboring farmers to adopt the methodologies, so the 2018-19 production season should generate more evidence and motivation for many smallholders that will reduce impediments to the growth of the Bangladesh shrimp sector.

বাংলাদেশের চিংড়ি খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (USDA) আর্থিক সহায়তায় উইনরক ইন্টারন্যাশনাল (Winrock) ২০১৭ সাল হতে সেফ এ্যাকুয়া ফার্মিং ফর ইকোনমিক এ্যান্ড ট্রেড ইমপ্রুভমেন্ট (SAFETI) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে SAFETI প্রকল্প এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, চাষি পর্যায়ে কম উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনে ব্যর্থতাই বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্প বিকাশের অন্যতম অন্তরায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষে কম উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন ব্যর্থতার অন্যতম কারণসমূহ হলো: বাগদা চিংড়ি ঘেরে প্রতিনিয়ত রোগ সংক্রমণ, জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি, চাষাবাদের অনুপযুক্ত অপরিকল্পিত ঘের নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিত পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চাষি পর্যায়ে লাগসই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব, কাংক্ষিত মূল্যে ভালমানের উপকরণ বিশেষ করে রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পিএল ও খাদ্যের অপ্রতুল সরবরাহ এবং চাষবান্ধব আর্থিক সহায়তার অভাব। সমস্যাসমূহের ব্যাপকতা ও সমাধান সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করে, SAFETI প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি সহযোগী সংস্থার সাথে বিভিন্ন মেয়াদী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি চাষিদের ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাগদা ও গলদা চাষের লাগসই আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের অধীন কর্ম এলাকার পরিবেশ, বিশেষ করে পানির লবণাক্ততার বিস্তৃতির ভিত্তিতে প্রতি হেক্টরে ১,০০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদনক্ষম তিনটি আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতির (অ্যারেটর ছাড়া) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

- আধা-নিবিড় বাগদা চিংড়ির একক চাষ ঃ মধ্যম ও উচ্চ লবণাক্ততাযুক্ত (১০-২০ পিপিটি) এলাকার চিংড়ি খামার বা ঘেরে প্রতি শতাংশে ১২০-১৪০টি রোগমুক্ত সুস্থ-সবল বাগদার পিএল মজুদ করে ১২০-১৪০ দিন লালন-পালন করে শতাংশে ৩-৪ কেজি উৎপাদন প্রত্যাশা নির্ধারণ।
- আধা-নিবিড় বাগদা ও গলদা চিংড়ির পর্যায়ক্রমিক চাষ ঃ মধ্যম ও নিম্ন লবণাক্ততাযুক্ত (৫-১২ পিপিটি) এলাকার চিংড়ি খামার বা ঘেরে ফেব্রুয়ারি/মার্চ - জুন/জুলাই মাস পর্যন্ত বাগদা চিংড়ির একক চাষের পর জুলাই মাস থেকে (যখন লবণাক্ততা প্রায় শূন্যে পৌঁছে) গলদা ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করে শতাংশে ২.০-২.৫ কেজি বাগদা ও ২.০-২.৫ কেজি গলদা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- আধা-নিবিড় গলদা-কার্প মিশ্রচাষ ঃ সাধারণত মৃদু লবণাক্ত থেকে স্বাদু পানির এলাকার ঘেরে স্বাদু পানির চিংড়ি গলদা ও নির্বাচিত কার্পজাতীয় মিশ্রচাষ করে শতাংশে ৩-৪ কেজি গলদা উৎপাদন প্রত্যাশা নির্ধারণ।

SAFETI প্রকল্প সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও যশোর জেলার

দশটি উপজেলাতে প্রত্যক্ষভাবে ২৫,০০০ প্রান্তিক ও ছোট চিংড়ি চাষির মাঝে উক্ত আধা-নিবিড় চাষ প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। এছাড়াও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলে পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক চিংড়ি চাষি উপকৃত হবেন। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে নির্বাচিত পাড়া/গ্রামে প্রায় ২৫ জন উৎসাহী চাষিদের নিয়ে দল গঠন ও একজন লিড চাষি নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি দলে চাষিদের জন্য ২/৩ বছর সময়কালে ৩টি দিন-ব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্স, অংশগ্রহণমূলক প্রদর্শনী, ২টি দিন-ব্যাপি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রতি মাসে কোচিং এবং প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পিএল/পোনার জন্য সুখ্যাত হ্যাচারি/নার্সারি/এজেন্টের সংগে এবং চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য সেফটির সহযোগী এনজিও টিএমএসএস ও কোডেকের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সক্রিয় কয়েকটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারি সংস্থার সাথে চাষিদের সংযোগ করা হচ্ছে।

SAFETI প্রকল্প চিংড়ি চাষে কাংক্ষিত ফলাফলের জন্য ২টি পদ্ধতিতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চাষিদের মধ্যে সম্প্রসারণ করছে:

আধা-নিবিড় বাগদা চাষের ছয়টি ধাপঃ

১. পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট, ঘেরের পাড় উঁচু ও শক্ত এবং তলদেশ কাদামুক্ত করা;
২. ঘেরের পানি পরিশোধন ও জীবাণুমুক্ত করা এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি করা;
৩. জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণি ও রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা;
৪. এসপিএফ অথবা পিসিআর পরীক্ষিত সুস্থ-সবল পোনা সঠিক ঘনত্বে মজুদ করা;
৫. ভালো মানের খাদ্য (৩৫-৪০% প্রোটিন যুক্ত পানিতে অন্তত ২ ঘণ্টা স্থায়ী) নিয়মিত ও পরিমিত প্রয়োগ করা; এবং
৬. চিংড়ির সুস্বাস্থ্য এবং পানির গুণগতমান নিশ্চিত করা।

আধা-নিবিড় গলদা চাষের ছয়টি ধাপঃ

১. ঘেরের পাড় উঁচু, তলা কাদামুক্ত, পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট এবং চিংড়ির আশ্রয়স্থান তৈরি;
২. ঘেরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি করা;
৩. হ্যাচারিতে উৎপাদিত সুস্থ-সবল গলদার পোনা ও মিশ্রচাষে উপরিস্তরের কার্প জাতীয় মাছের প্রজাতি নির্বাচন;
৪. ভাল মানের খাদ্য (২৮-৩০% প্রোটিন যুক্ত, পানিতে ১-২ ঘন্টা স্থায়ী) নিয়মিত ব্যবহার করা;
৫. নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পানির মাননিয়ন্ত্রণ ও রাক্ষুসে প্রাণী প্রতিরোধ করা; এবং
৬. ১০০-১২০ দিন পরে বড় আকারের স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি আহরণ করে ছোটদের বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া।

SAFETI প্রস্তাবিত আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে পরিমিত পিএল মজুদ ও খাদ্য প্রয়োগে পানির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে ক্ষেত্রে অ্যারেটর ব্যবহার না করেও কাংক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব। তবে সীমিত পরিসরে অ্যারেটর ব্যবহার অধিক ফলনে সহায়ক। ২০১৭-১৮ উৎপাদন মৌসুমে SAFETI ১০টি উপজেলাতে প্রায় ৯,৪৫০জন নির্বাচিত চাষিদের ৩৭৮টি প্রযুক্তি ভিত্তিক দল গঠন ও ৩৭৮টি প্রদর্শনী ঘেরসহ অন্যান্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত প্রদর্শনীগুলোর বেশির ভাগেই সেফটি প্রস্তাবিত ছয়টি কাজ অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে চাষির গাফিলতি ও অন্যান্য কারিগরি ও আর্থসামাজিক কারণে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রদর্শনীর ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাগদা একক চাষে ২৪% এবং বাগদা-গলদা পর্যায়ক্রমিক চাষে ২১%

প্রদর্শনীতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে গলদা-কার্প মিশ্র চাষের প্রত্যেকটি প্রদর্শনীই লাভজনক হয়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১: প্রদর্শনী পুকুরের সামগ্রিক ফলাফল

প্রযুক্তি	মোট প্রদর্শনী পুকুর	আর্থিকভাবে লাভজনক খামার		আর্থিক ক্ষতি হওয়া খামার	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বাগদার একক চাষ	১৭২	১৩০	৭৬	৪২	২৪
বাগদা-গলদা পর্যায়ক্রমিক চাষ	৫৩	৪২	৭৯	১১	২১
গলদা-কার্প মিশ্রচাষ	১৫৩	১৫৩	১০০	০	০
মোট	৩৭৮	৩২৫	৮৬	৫৩	১৪

সফল ও লাভজনক প্রদর্শনীর মধ্যে ৭২% আধা-নিবিড় বাগদা একক চাষের ঘেরে হেক্টর প্রতি ৫০০-৭৪৯ কেজি, ৬০% বাগদা-গলদা পর্যায়ক্রমিক চাষের ঘেরে ৭৫০-≥ ১,০০০ কেজি এবং ৮৬% গলদা-কার্প মিশ্র চাষের ঘেরে ৭৫০-১,০০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে (সারণি ২)।

সারণি ২: প্রদর্শনী ঘেরের উৎপাদনশীলতা অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস

প্রযুক্তি	মোট প্রদর্শনী পুকুরে	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর) সংখ্যা (%)		
		৭৫০-≥১,০০০	৫০০-৭৪৯	<৫০০
বাগদার একক চাষ	১৩০	১০	৯৩ (৭২%)	২৭
বাগদা-গলদা পর্যায়ক্রমিক চাষ	৪২	২৫ ৬০%	১৪	৩
গলদা-কার্প মিশ্রচাষ	১৫৩	১৩১ (৮৬%)	২১	১
মোট	৩২৫	১৬৬	১২৮	৩১

সফলতার কারণ হিসেবে উন্নত প্রযুক্তির প্রতি চাষির আগ্রহ ও আস্থা, ঘেরের অবস্থান (তুলনামূলক কম রোগের প্রাদুর্ভাবযুক্ত এলাকাতে অবস্থিত) এবং পানির মধ্যম ও নিম্ন লবণাক্ততা ছাড়াও কারিগরি দিক থেকে ঘেরের গভীরতা গুণগতমান ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। উক্ত ফলাফলে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রান্তিক চিংড়ি চাষিদের ঘেরে আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষাবাদের মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে বর্তমান উৎপাদনের ২-৩ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

প্রত্যেকটি চাষ প্রদ্ধতির ক্ষেত্রেই ৭৫০-≥১,০০০ কেজি/হেক্টর চিংড়ি উৎপাদনকারী ঘেরগুলো সর্বোচ্চ লাভ (২২৬,৮৫২ - ৪৪৩,৪৭২ টাকা/হেক্টর) করেছে। প্রস্তাবিত আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ১,০০০ কেজি/হেক্টর পর্যন্ত উৎপাদন করতে যে হারে ব্যয় বৃদ্ধি হয় তাতে মোট লাভ ঊর্ধ্বমুখীই থাকে। উক্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে, প্রান্তিক ও ছোট চাষিগণ সীমিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ঘেরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই আধা-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন ও লাভ উভয়ই বৃদ্ধি করতে পারে।

উৎপাদনের তারতম্যের জন্য যেমন চাষকৃত প্রজাতি, ভৌগৌলিক অবস্থান ও পরিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে জৈব নিরাপত্তা, রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পোনা, গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের প্রাপ্যতা, চাষির কারিগরি জ্ঞান গ্রহণের আগ্রহ ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে যে সমস্ত উচ্চ ও মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত এলাকাতে অসংখ্য সরু পাড়যুক্ত ঘেরে দীর্ঘ দিন যাবত বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে ঐ সমস্ত এলাকার ঘেরে রোগ আক্রান্তের ঝুঁকি বেশি।

উপসংহার (Conclusion)

SAFETI প্রকল্পের প্রথম বছরে চাষিদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রদর্শনী ঘেরসমূহের ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় যে, চিংড়ি সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন মেয়াদি পদক্ষেপ

সারণি ৩: বিভিন্ন আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে আয়-ব্যয় পর্যালোচনা

বাগদা একক চাষ					বাগদা-গলদা পর্যায়ক্রমিক চাষ				গলদা-কার্প মিশ্রচাষ			
উৎপাদন কেজি/হে:	এফসিআর	আয় (টাকা/হে.)	ব্যয় (টাকা/হে.)	মোট লাভ (টাকা/হে.)	এফসিআর	আয় (টাকা/হে.)	ব্যয় (টাকা/হে.)	মোট লাভ (টাকা/হে.)	এফসিআর	আয় (টাকা/হে.)	ব্যয় (টাকা/হে.)	মোট লাভ (টাকা/হে.)
৭৫০-≥১০০০	১.৩	৬১৩,৬৭৯	৩৮৬,৮২৭	২২৬,৮৫২	১.০১	৮৭৯,৭৪১	৪৭১,৯৭১	৪০৭,৭৭০	১.৯৬	৮২৭,৭১৫	৩৮৪,২৪৩	৪৪৩,৪৭২
৫০০-৭৪৯	১.১	৪৬৪,৫৪৭	৩২৩,৫৫৪	১৪০,৯৯৩	১.৫৪	৫২৪,৮৮৪	৩৭১,৬৭২	১৫৩,২১২	২.২৪	৫৯৩,১০৬	৩৩৬,৯৩৮	২৫৬,১৬৮
<৫০০	২.০	৪১৩,০৭৭	৩১৫,১৮৮	৯৭,৮৮৯	১.৫৩	৪৯২,৮৫৪	৩২৩,৪৭২	১৬৯,৩৮২	২.৮৬	৫০৭,৭৬১	২৯৪,০৩৫	২১৩,৭২৬
লোকসান	৩.৩	১৪৬,৯১১	৩০৪,৫২৬	-১৫৭,৬১৫	২.৫৩	৩৫৪,১৫৯	৪৭০,১২৭	-১১৫,৯৬৮	-	-	-	-

৩ ফুট বা উর্ধ্ব, শক্ত ও উঁচু পাড়, সঠিক পদ্ধতিতে ঘের প্রস্তুত ও সঠিক জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পোনা (এসপিএফ এবং পিসিআর পরীক্ষিত বাগদা পিএল) মজুদ, পরিমিত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা, সঠিক নার্সারি ব্যবস্থাপনা, কম ঘনত্বে কার্প জাতীয় পোনা মজুদ ও পিলেট খাদ্য ব্যবহার এবং পানির গ্রহণ করতে হবে। তবে প্রান্তিক ও ছোট চাষিদের মধ্যে যথাযথ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘেরের অবকাঠামো উন্নয়ন, ন্যূনতম ৩ ফুটের বেশি গভীরতা, মজবুত ও উঁচু পাড়, সঠিক ঘের প্রস্তুত ও জৈব নিরাপত্তা, রোগমুক্ত সুস্থ-সবল পোনা, মানসম্পন্ন খাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা গেলে বর্তমান উৎপাদনকে অন্তত দ্বিগুণ করা সম্ভব।

ডেপুটি চীফ অব পার্টি, সেফ এ্যাকুয়া ফার্মিং ফর ইকোনমিক এ্যান্ড ট্রেড ইমপ্রুভমেন্ট- (SAFETI) প্রকল্প, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল (ই-মেইলঃ mokarrom.hossain@winrock.org)

রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড ঃ বিনোদন ও শিক্ষায় এক অনন্য উদ্যোগ

Radiant Fish World : A Remarkable Initatiative for Peoples' Amusement and Education

মোঃ সফিকুর রহমান চৌধুরী[১] ও ড. মুহঃ নিয়াজউদ্দিন[২]

Abstract

Aquarium is not only used for recreation but also widen the scope of education, conservation, research and social benefits. Aquarium is an ideal place for research on husbandry, life cycles, reproduction, behavior, autecology and fish pathology. Aquarium can increase the research potential in scientific disciplines through collaboration with Universities and research institutions. Radiant Fish World, the first ever marine aquarium in Bangladesh, established in 2017 at Jhoutola, Cox'sbazar can address all possible beneficial effects of aquarium. It is about 0.40 hectare with the capacity of ten thousand gallon of water containing 190 species of marine, brackish and fresh water fishes. It facilitates a natural commercial theme park where one can see the marine creatures in their native habitat providing with current information pertaining to marine resources of the Bay of Bengal. Radiant Fish World is playing a vital role to exhibit mysterious diversity of ocean as well as entertain and aware common people.

পাহাড়, সমতল, নদ-নদী ও সমুদ্রের বিচিত্র বাস্তুসংস্থানের দেশ, বাংলাদেশ। খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, নদী ও সমুদ্র বাংলাদেশ নামক দেশের শিরা-উপশিরা আর পানি হলো তার রক্তপ্রবাহ। বঙ্গোপসাগর এ দেশের হৃৎপিণ্ড। বঙ্গোপসাগরের সম্পদ, শক্তি ও বাস্তুসংস্থানের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি সমুদ্র অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে দেশ। বঙ্গোপসাগরের অবারিত মৎস্যসম্পদ যেমন দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করছে, তেমনি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় সুনীল অর্থনীতির সুফল অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর 'আরভি মীন সন্ধানী' নামক গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে মৎস্য সম্পর্কিত গবেষণা, জরিপ ও তথ্য সংগ্রহে কাজ করে যাচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক অ্যাকুয়ারিয়ামের অবদান প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। অ্যাকুয়ারিয়াম শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য ব্যবহার হয় না; এটি শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অ্যাকুয়ারিয়াম মাছের জীবনচক্র, প্রজনন, আচরণ, অটিকোলজি এবং মৎস্যরোগবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আদর্শ স্থান হতে পারে। জলজ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রকাশনা ও সামুদ্রিক প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে সামুদ্রিক অ্যাকুয়ারিয়াম হতে পারে সুনীল অর্থনীতির সুফল অর্জনের অন্যতম উপকরণ।

রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়ারিয়াম
(Radiant fish world aquarium)

সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও বেসরকারি খাতে এই ধরনের উদ্যোগ অপ্রতুল। রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড (Radiant Fish World) এ ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড সমুদ্রের রহস্যময় জীববৈচিত্র্য সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে একদিকে যেমন ইকোট্যুরিজমবান্ধব নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা করেছে তেমনি সমুদ্র শিক্ষার প্রসারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়ারিয়াম T4T Ltd., মালয়েশিয়া-এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অ্যাকুয়ারিয়ামটি ০.৪ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ১০ হাজার গ্যালন পানিধারণ ক্ষমতা এবং এখানে রয়েছে মোট ১৯০ প্রজাতির (সামুদ্রিক প্রজাতি ১৩০টি, আধা-লবণাক্ত পানির প্রজাতি ৩০টি এবং মিঠা পানির ৩০টি) মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী। বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত ও দেশের প্রধান পর্যটন নগরী কক্সবাজারের প্রাণকেন্দ্রে এই অ্যাকুয়ারিয়ামে প্রতিদিন আসছে ভ্রমণপিয়াসী হাজারো পর্যটক, যাদের বেশির ভাগেরই আগে গন্তব্য ছিল কক্সবাজারস্থ সমুদ্রসৈকত, হিমছড়ি, ইনানী অথবা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ সমুদ্রোপকূল ও সমুদ্র অদূরবর্তী অঞ্চলের নয়নাভিরাম পরিবেশ ও দৃশ্যাবলোকন। আগে পর্যটকরা শুধুমাত্র সমুদ্রের উপরিভাগের দৃশ্য দেখেই মুগ্ধ হলেও বর্তমানে রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকুরিয়াম চালু হবার পর পর্যটকরা সমুদ্রের গভীরের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কেও জানতে পারছে। দেশের প্রথম সামুদ্রিক ফিস অ্যাকুয়ারিয়ামে রয়েছে হরেক রকমের শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, অক্টোপাস, জেলিফিসসহ সমুদ্রের অজানা অনেক বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন প্রাণী। মাছের মধ্যে রয়েছে পীতাম্বরি, হাউসপাতা, পানপাতা, স্টার ফিস, সামুদ্রিক বাইন, স্টোন ফিস, স্কুইরেল ফিস, সার্জন ফিস, হাঙ্গর, কোরাল, বিদ্যুৎ মাছ, বিশতারা, দাতিনা, রূপচাঁদা, টেকচাঁদা, পইচাঁদার মতো বিচিত্র

ও বাহারি সামুদ্রিক মাছ। স্বাদুপানির মাছের মধ্যে মহাশোল, থাই পাঙ্গাস, থাই সরপুঁটি, চোষক মাছসহ নানা প্রজাতির মাছ। এছাড়াও রয়েছে সোনালি মাছ, প্যারট ফিস, চিকলিড, গোরামি, আর্চার ফিসসহ অনেক দৃষ্টিনন্দন ও বাহারী মাছ, রয়েছে লাল কাঁকড়া, শীলা কাঁকড়া, মাইট্টা কাঁকড়া, লজ্জাবতী কাঁকড়া, রাজ কাঁকড়া, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, কচ্ছপ, সামুদ্রিক বিষধর সাপ প্রভৃতি। প্রতিদিন যোগ হচ্ছে স্বাদু ও লোনা পানির নতুন নতুন বিচিত্র প্রজাতির মাছ ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের ছোঁয়া। সামাজিক ও নাগরিক দায়বদ্ধতা থেকে রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধায়নে একটি সমুদ্র গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে যা Radiant Ocean Research & Education Center (ROREC) নামে পরিচিত। দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে নানা পেশা ও সর্বসাধারণের মাঝে সমুদ্রসচেতনতা সৃষ্টি করাই এর অন্যতম লক্ষ্য।

রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়ারিয়ামের পরিকল্পনা, প্যাকেজ ও সুবিধাসমূহ

(Packages and facilities provided and future planning of Radiant fish world aquarium)

- শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য রহস্যাবৃত বঙ্গোপসাগরের দ্বার উন্মোচনে, সমুদ্রের নীল জলের জীববৈচিত্র্য এক ছাদের নিচে নিয়ে এসে বিনোদন সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের গবেষণা অনেকটা সহজ করে তোলা।
- সামুদ্রিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখানে এসে বিনোদনের পাশাপাশি স্বচক্ষে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে যেমন ধারণা নিতে পারবে; তেমনি হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে পারবে, যা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো বেশি আনন্দময় ও বাস্তবসম্মত করবে।
- থ্রী ডি মুভির বিশেষ আয়োজন যেখানে সমুদ্রতল ও পরিবেশ বিষয়ক ডকুমেন্ট্রি দেখানোর ব্যবস্থা যা আরো আধুনিকায়ন ও আকর্ষণীয় করে আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় তথ্য ও চিত্র তুলে ধরা হয়।
- শিশু কিশোর ও সকল নাগরিকের জন্য রয়েছে ওশান গ্যালারি, ওশান গেম, ডলফিন প্লেয়িং গ্রাউন্ড এবং ওশান লাইব্রেরির সমারোহ।
- কমপ্লিট ট্রেনিং প্যাকেজের আওতায় সমুদ্রবিজ্ঞানী ও মাৎস্যবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে মৎস্যপোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে এর লালন-পালন, পোস্ট হার্ভেস্টিং ও কিচেন মেকআপ প্রসেসিং প্রক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল থাকবে, যাতে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থী সহজে বিষয়টি অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পারবেন।
- ROREC-এর ডকুমেন্টেশন এন্ড পাবলিকেশন্স সেকশন মাছের জীবনচক্র ও পরিবেশ, মৎস্যচাষ পদ্ধতি, অক্ষর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মাছের নাম, সমুদ্র বিষয়ক বই, কিশোর সমুদ্রবিজ্ঞান, রকমারী মৎস্য ও পরিবেশের ছবি ও তথ্য সম্বলিত ক্যালেন্ডার, ফেস্টুন, ব্যানার এবং রেডিয়েন্ট ওশান ম্যাগাজিনসহ পাবলিকেশনের কাজ করে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ROREC, মিডিয়া পার্টনার ও আগ্রহী যে কোনো অর্গানাইজেশনের যৌথ আয়োজনে আমাদের সমুদ্র - আমাদের ভবিষ্যৎ, বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, সামুদ্রিক অর্থনীতি ও সামুদ্রিক শিক্ষা, সমুদ্র ও জলবায়ু পরিবর্তন, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য, সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির মৎস্যচাষের সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রতিকার, অর্গানিক মৎস্যচাষ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে মেম্বারশিপ স্কিমের আওতায় বিশেষ সুবিধা বা ছাড় দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

সামুদ্রিক সম্পদ এবং এর দায়িত্বশীল ব্যবহার বিষয়ে জনগণের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়ারিয়াম ইতোমধ্যে ভূমিকা রেখে চলেছে। এটি শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, ভবিষ্যতে সমুদ্রসম্পদ শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও গবেষণা অবদান রাখতে পারবে মর্মে প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করে, পাশাপাশি অ্যাকুয়ারিয়ামটি মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য গবেষণা সংস্থার সহযোগিতায় সামুদ্রিক মাছের জীবনচক্র, প্রজনন, আচরণ, অটিকোলজি এবং মৎস্যরোগবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আদর্শ স্থান হতে পারে।

[১]ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রেডিয়েন্ট ফিস ওয়ার্ল্ড, কক্সবাজার (ই-মেইল: www.radiantfishworld.com)
[২]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পুষ্টি-সংবেদনশীল মৎস্যচাষ ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ার্ল্ডফিসের উদ্যোগ

Nutrition-Sensitive Aquaculture : WorldFish Initiatives in Southwest Bangladesh

মোহাম্মদ জাকির হোসেন[১], মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া[২] ও ডা. শামিয়া খানম চৌধুরী[৩]

Abstract

Bangladesh, blessed with open and closed waterbodies, is the 5th largest inland closed waters fish producer In the World. Malnutrition in Southwest region is due to a lack of knowledge on nutrition rather other factors related. Demographic and Health Survey (BDHS) 2014 reveals some nutrient deficiency specially vitamin-A, iron and some other micro nutrients in children and women. As a counter measure, nutrition-sensitive aquaculture, emphasizing on safe fish production, distribution and consupmtion is crucial. Nutrition-sensitive aquaculture implies the integration of nutrient-rich small indegenious fish into existing carp polyculture which is convenient for women and household consumption. Finally, it combines the development of nutrition knowledge through promotion and behaviour change communication in order to effectively mitigate this public health issue. USAID funded Aquaculture for Income and Nutrition (AIN) project in Southwest Bangladesh worked with a total of 69,484 farmers have been involved in producing 657,430 kg of micronutrient-rich "mola" fish. Each farmer produced 10 kg mola per year; 50% were consumed by the household members and the rest 50% were used for distribution or sales. Pond polyculture of carp (large fish) and mola (small fish) is non-detrimental to either species' performance. The project also found that fish production (2185 kg/ha) from polyculture is significantly higher than single carp cultivation. Households with ponds can produce 3.93 g of mola from carp-mola polyculture. This small amount can contribute to 40% and 30% of the total recommmended intake of vitamin-A and calcium respectively. Moreover, 6-7 mola fish (17 g) is sufficient to meeting the daily vitamin-A requirements for children under five. Therefore, there is an excellent opportunity to meet the nutrition demand as well as increase the houshold income of 27.4 million people by promotiong nutrition-sensitive aquaculture in 0.756 million ponds prevailing in Southwest Bangladesh.

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের যোগান নিয়ে পৃথিবী জুড়ে জ্ঞানী-গুণীজন ও নীতি-নির্ধারকদের ভাবনার অন্ত নেই। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় অতিপুষ্টি এবং পুষ্টিহীনতার প্রকোপ বিষয়টিতে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে, যার মূলে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কার্যকর পুষ্টি জ্ঞানের অভাব। দেশের এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে কৃষির পাশাপাশি মৎস্য সেক্টরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পাশে, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও সংশিষ্ট কোম্পানিগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হতে পারে- পুকুরসহ সকল জলাভূমিকে ছোট মাছ চাষের আওতায় এনে তাতে প্রক্রিয়াগত কিছু আধুনিকায়ন করা, কার্পের সাথে অনুপুষ্টি-সমৃদ্ধ দেশীয় ছোট জাতের মাছকে গুরুত্ব দিয়ে চাষ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা; ছোট মাছ ধরার সহজতর প্রযুক্তি (মলা গিলনেট) চাষি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সরবরাহ এবং সহজলভ্য করা; পুকুর বা জলাধারের পাড় ও বাড়ীর আঙ্গিনায় উন্নত জাতের সবজিচাষে উৎসাহিতকরণ; প্যাকেটজাতকৃত তৈরি খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ বা মাছ দিয়ে তৈরি খাবার বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করা; ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের পুষ্টি-জ্ঞানের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি আচরণের পরিবর্তন সাধনে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন, যা এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি উত্তম ও কার্যকর উপায় হতে পারে।

গুরুত্ব (Importance)

মানব শিশুর জন্মের ১,০০০ দিনের মধ্যেই তার মস্তিষ্কের গঠন সুসম্পন্ন হয়ে থাকে, যে সময়টাতে প্রক্রিয়াগত কারণেই যথেষ্ট পুষ্টির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এর কোনো ব্যত্যয় হলে এই শিশুটি সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক বড় দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হবে। তাছাড়া সব বয়সের মানুষেরই জীবনধারণে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। বয়স, শ্রেণি, পেশাভেদে কার জন্য কী খাবার প্রয়োজন, কত মাত্রায় প্রয়োজন, তাছাড়া কোন্ ধরনের খাবারে কী ধরনের খাদ্যমান আছে, কত মাত্রায় আছে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা অনেক শিক্ষিত মানুষেরও নেই। এটি আমাদেরকে তথা পরবর্তী প্রজন্মকে বিপদজনক একটি পরিস্থিতির দিকেই ধাবিত করছে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে ছোট-বড় অনেক পুকুর রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ পুকুরেই পরিকল্পিতভাবে মাছের চাষ হচ্ছে না, পুকুর পাড়ে সবজির চাষ হচ্ছে না। কেউ কেউ চাষ করলেও তাদের অনেকেই অবহেলায় পুকুরের মলা মাছগুলোকে মেরে ফেলেন। কিন্তু পুষ্টির বিচারে বড় আকারের বিভিন্ন জাতের মাছের তুলনায় ক্ষুদ্রকায় মলা মাছের মধ্যেই রয়েছে অতীব জরুরি উপাদানসমূহ যেমন- ভিটামিন-এ, আয়রন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ফসফরাস ইত্যাদিসহ প্রাণিজ আমিষের ভাণ্ডার যা পরিবারের সদস্যদের

রাতকানা, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, রক্তস্বল্পতা, হাড়ক্ষয় থেকে রক্ষাসহ শরীরের ক্ষয়পূরণেও ভূমিকা রাখে। মলা মাছ থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান শিশুর বুদ্ধি বিকাশ ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকেই একেকটি মলা মাছকে একটি ভিটামিন-এ ক্যাপসুলের সাথে তুলনা করে থাকেন। বাজার দরের দিক থেকেও ছোট মাছ অনেকাংশে এগিয়ে। সুতরাং বাড়তি মুনাফা এবং পারিবারিক পুষ্টির বিবেচনায় মলা চাষ অপরিহার্য।

মলার দেহের বিভিন্ন অংশে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ

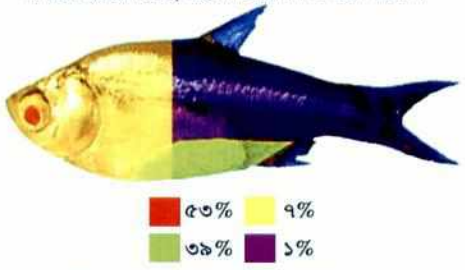

ওয়ার্ল্ডফিস ফটো আর্কাইভ থেকে ছবিটি সংগৃহীত

ইউএসএআইডি-এআইএন প্রকল্পের কার্যক্রম
(Interventions of USAID-AIN project)

ক. চাষির পুকুরে পরিপক্ব মলা মাছ বিতরণ: প্রকল্প শুরুর দিকে একটি সার্ভের মাধ্যমে মলা মাছের বড় মজুদের উৎসগুলো এবং মলাহীন পুকুরগুলো চিহ্নিত করা হয়। তারপর জেলে দিয়ে মাছ ধরে তা পলিব্যাগ ও অক্সিজেন সহযোগে বিভিন্ন চাষিদের পুকুরে সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে ৬৫,৭৪৩ জন চাষির পুকুরে গড়ে ১০০ গ্রাম/শতক হারে ৪,৭২৮ কেজি জীবিত ও পরিপক্ব মলা মাছ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণ প্রক্রিয়াটি প্রকল্প থেকে সরাসরি নির্বাচিত কিছু সদস্যদের পুকুরে এবং চাষি থেকে চাষি পর্যায়ে এই দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় পূর্বে থাকা মলা পুরোপুরি আহরণ না করেও কিছু মলা মজুদ রাখার মাধ্যমেও পুকুরে মলা চাষ নিশ্চিত করা হয়। এতে করে চাষিদের পুকুর কার্পের সাথে মলার মিশ্র চাষের কারণে পরিবারের মোট মাছ উৎপাদন বেড়েছে।

চিত্র: চাষি পর্যায়ে জীবিত ও পরিপক্ব মলা মাছ বিতরণ

খ. কমলা মিষ্টি আলুর লতা বিতরণ: ভিটামিন-এ এবং আয়রন প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ কমলা মিষ্টি আলুর ২.৮ মিলিয়ন লতা বীজ হিসেবে ২৬,৮৯০ জন চাষিকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যা থেকে প্রতি পরিবার বছর শেষে গড়ে ১৫৫ কেজি আলু পেয়েছে। কৃষকরা এ আলু নিজে খাওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত আলু বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তাছাড়া চাষিদের পুকুর পাড়ে উন্নতজাতের সবজিচাষের কারণে পরিবারে সবজির উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. মলা মাছ চাষ, মাছ কাটা-বাছা এবং রন্ধন প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান: ৬৯,৪৮৪টি চাষি পরিবারকে ৪৮০০০টি সেশনের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যেখানে উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় ছিল মলা চাষের গুরুত্ব, কার্পের সাথে মলা মাছের মিশ্রচাষ পদ্ধতি, মলা মাছ কাটাকুটি ও রান্নার কৌশল, গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুদের জন্য মলার রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়া ও খাদ্য বৈচিত্র্যের গুরুত্ব ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণ না পাওয়া চাষিদের চেয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাষিদের মলা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: কমলা মিষ্টি আলুর উৎপাদন

ঘ. প্রচুর পরিমানে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী প্রদান: ৬৯,৪৮৪টি চাষি পরিবারের সবাইকে প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে কার্প ও মলা মাছের মিশ্রচাষ পদ্ধতির ম্যানুয়াল ও লিফলেট, পুষ্টিকার্ড, পুষ্টি পেট, পুকুর পাড়ে সবজি চাষের ম্যানুয়াল ও লিফলেট, পুষ্টি বিষয়ক পোস্টার, পুষ্টি বিবেচনায় তৈরি মলা চাষের ওপর নির্মিত ভিডিও ইত্যাদি।

চিত্র: চাষিদের পুষ্টি ও মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

ঙ. মহিলা কর্তৃক পুকুর থেকে সহজে মলা মাছ আহরণ উপযোগী জাল সরবরাহ: ১৫৫ জন চাষিকে এ নতুন উদ্ভাবিত জালটি তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে ২৩৭টি জাল বিশেষ মূল্যে অন্য চাষিদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন। বাজার থেকে মেশিনে বুনানো ০.৬ ইঞ্চি এবং ০.৭ ইঞ্চি ফাঁসের জাল পার্ট-পার্ট করে কেটে এবং জোড়া লাগিয়েই ৫০ ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে ৪ ফুট প্রস্থের মলা মাছ আহরণ উপযোগী জালটি তৈরি করা হয়। পরে তার ওপরে এবং নিচে দুটো মোটা সুতলী লাগিয়ে দেয়া হয়; যার উপরের টার সাথে ৪-৫টি খালি প্লাস্টিক বোতল ফ্লোট হিসেবে বেধে দেয়া হয়। আর নিচের টার সাথে ভাঙ্গা ইটের টুকরা ঝুলিয়ে দেয়া হয় সিংকার হিসেবে। পুকুরের উভয় প্রান্তে বরাবর দুটো খুঁটি বসিয়ে তাতে কপিকল এবং সুতলী লাগিয়ে নিতে হয়। আর তারপরই ঐ সুতলীর সাথে জালটিকে আটকিয়ে দিয়ে সুতলীর অন্যপ্রান্ত ধরে টানলেই জালটি পানিতে চলে যায়। কৌশলটা অনেকটা বাঁশের খুঁটিতে পতাকা উঠানোর মতোই। মোট ২০০ টাকা মজুরিসহ জালটির তৈরি খরচ প্রায় ৪৫০ টাকা।

চিত্র: মহিলা কর্তৃক মলা আহরণ উপযোগী জাল দিয়ে মাছ আহরণ

চ. পরিবারে মলা মাছ খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কিত গবেষণা: গবেষণার তথ্যে দেখা যায়, মলা মাছ আহরণ উপযোগী জাল ব্যবহারকারী, যাদের এই জালটি নেই তাদের তুলনায় ৭ গুণ বেশি মলা আহরণ করেন এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রকল্প এলাকায় খাদ্য বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, খাদ্য হিসেবে মোট গ্রহণকৃত মাছের মধ্যে দেশীয় ছোট মাছের অবদান ছিল ১২%, আর বড় মাছ খাওয়ার প্রবণতা প্রায় ৮৮% যা মলা মাছ আহরণের সহজতর প্রযুক্তি (নারীর ব্যবহার উপযোগী জাল) ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ঐসব পরিবারের মোট গ্রহণকৃত মাছের মধ্যে ছোট মাছের অবদান ৫% বেড়ে ১৭% হয়েছে অর্থাৎ ছোট মাছ আহরণের সহজতর প্রযুক্তি পারিবারিক খাদ্য বৈচিত্র্য আনয়নে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষণীয় বিষয় (Learnings)

- জীবনঘনিষ্ট হওয়ায় চাষির মাঝে পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে শেখার খুব আগ্রহ দেখা যায়। পরবর্তীতে তা চর্চা করতেও দেখা যায়।
- সাশ্রয়ী ঐ অবহেলিত মলা মাছের চাষে আগ্রহ তৈরি, নিয়ম মেনে কাটাকুটি ও খাওয়ার ব্যাপারেও তাদের প্রশিক্ষণোত্তর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

পরামর্শ (Recommendations)

- কার্প মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুরসহ সকল চাষযোগ্য জলাভূমিগুলোতে কার্প ও অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ (micro-nutrient) মলার মিশ্রচাষ বাড়ানো প্রয়োজন;
- স্থানীয় খাল, বিল ও নিচু জলাভূমিগুলোকে মলা মাছ চাষের আওতায় আনা প্রয়োজন;
- ছোট মাছ ধরার সহজতর প্রযুক্তি চাষি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সরবরাহ এবং সহজলভ্য করার মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে নিয়মিত পুষ্টিকর মাছ খাওয়াকে উৎসাহিত করা দরকার;
- প্যাকেটজাত তৈরি খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে প্রক্রিয়াজাত ছোট দেশীয় মাছ দিয়ে তৈরি খাবার বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করা দরকার;
- পুকুর বা জলাধারের পাড় ও বাড়ীর আঙ্গিনায় উন্নতজাতের সবজি চাষে উৎসাহিতকরণ করা জরুরি;
- গর্ভবতী মা, দুগ্ধদানকারী মা এবং শিশুর জন্মের প্রথম ১০০০ দিনের পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে মাছ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কিত প্রচারণা চালানো জরুরি;
- ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের পুষ্টি-জ্ঞানের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি আচরণের পরিবর্তন সাধনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তির একক বা যৌথ উদ্যোগগুলোর সমন্বয় এবং পরবর্তী করণীয়গুলো নির্ধারণ করা দরকার।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ দেশে প্রায় ৪০ লাখেরও অধিক সংখ্যক পুকুরে মাছ চাষ হয়। মাছ চাষ বলতে সাধারণত বাণিজ্যিক মাছ চাষ, বাড়ির আঙ্গিনার পুকুরে মাছ চাষ, ঘেরে মাছ চাষ, রুই-কাতল-মৃগেল চাষ, তেলাপিয়া-পাঙ্গাসের চাষ, কৈ-শিং-মাগুরের চাষ ইত্যাদি চাষের কথাই তুলনামূলক বেশি আলোচিত হয়। পুষ্টি সংবেদনশীল মাছ চাষের ধারণাটি তেমন পুরনো না হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ আলোচিত। স্বল্প পরিসরে, সাশ্রয়ী ও সহজ প্রযুক্তির ব্যবহারে পুষ্টি সংবেদনশীল প্রজাতির মাছ (যেমন মলা, ঢেলা, দাড়কিনা ইত্যাদি) চাষই এ সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

[১] প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইউএসএআইডি-এআইএন প্রজেক্ট, ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ
[২]নিউট্রিশন এন্ড অ্যাকোয়াকালচার স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি-এআইএন প্রজেক্ট, ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ
[৩]নিউট্রিশন স্পেশালিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৯ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা	ছবি
ক. স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান				
০১	**মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন** (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, বাটা, সিলভার কার্প, কমন কার্প, ঘনিয়া, সরপুঁটি, পাঙ্গাস, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া)	**স্বর্ণপদক**	**মেসার্স ভাই ভাই ফিস সীড প্ল্যান্ট (হ্যাচারি)** প্রো: জনাব মোঃ লুৎফর রহমান পিতা: মৃত হাজী মোঃ তৈয়ব আলী, মাতা: মৃত রাবিয়া আক্তার গ্রাম: রাঘবপুর, গাংপাড়া, ডাকঘর: রাঘবপুর মাদ্রাসা উপজেলা: ময়মনসিংহ সদর, জেলা: ময়মনসিংহ বিভাগ: ময়মনসিংহ	
০২	**মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন** (পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর ও দেশি টেংরা)	**স্বর্ণপদক**	**জনাব মোঃ মাহাফুজ শাহ্** পিতা: মৃত মঈন উদ্দিন শাহ, মাতা: মৃত ফজিলা বেগম গ্রাম: ঠাকুরাদহ (ভাংনীপাড়া), ডাকঘর: উত্তর পানাপুকুর উপজেলা: গংগাচড়া, জেলা: রংপুর, বিভাগ: রংপুর	
০৩	**মৎস্য উৎপাদন** (শিং, মাগুর, গুলশা, পাবদা ও কার্প জাতীয় মাছ)	**স্বর্ণপদক**	**জনাব মো: ছলিম উদ্দীন তরফদার, এমপি** পিতা: মৃত মোঃ ফজর উদ্দীন, মাতা: মোসা: সফুরা গ্রাম: আজিপুর, ডাকঘর: সরস্বতীপুর, উপজেলা: মহাদেবপুর জেলা: নওগাঁ, বিভাগ: রাজশাহী	
০৪	**বাগদা চিংড়ি উৎপাদন**	**স্বর্ণপদক**	**গাজী ফিস কালচার লি.** দাকোপ, খুলনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক: জনাব কাজি শায়রুল হাসান পিতা: কাজী আ, ফ, বু আব্দুর রকীব, মাতা: সায়েরা রকীব বাড়ী নং: ৫৯ এ, সড়ক নং: ২৫-এ, বনানী গুলশান, ঢাকা	
০৫	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের অবদান**	**স্বর্ণপদক**	**বাংলাদেশ নৌবাহিনী** সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা ১২১৩	
০৬	**মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদান**	**স্বর্ণপদক**	**ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, শরীয়তপুর** জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শরীয়তপুর ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর	
০৭	**মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার অবদান**	**স্বর্ণপদক**	**জনাব মোঃ আসাদুল বাকী** জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর পিতা: মোঃ আজমেত আলী, মাতা: শামসুন নাহার গ্রাম: গোপালবাড়ী, ডাকঘর: শিমুলিয়া, উপজেলা: সাভার জেলা: ঢাকা, বিভাগ: ঢাকা	
০৮	**মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার অবদান**	**স্বর্ণপদক**	**সৈয়দ মোঃ আলমগীর** জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা পিতা: মৃত সৈয়দ ফজলুর রহমান, মাতা: মৃত জাহানারা বেগম চৌধুরী, গ্রাম: শাক্তা পশ্চিমপাড়া, ডাকঘর: শাক্তা উপজেলা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা, বিভাগ: ঢাকা	

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৯ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পদক	নাম ও ঠিকানা	ছবি
খ. রৌপ্যপদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান				
০১	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন (শিং, মাগুর, পাবদা ও গুলশা)	রৌপ্যপদক	বন্ধন মৎস্য হ্যাচারি ও ফিসারিজ প্রো: জনাব এ. কে. এম আমিনুল হক পিতা: আব্দুল আজিজ, মাতা: মৃত: মুলুক জান গ্রাম: নন্দীগ্রাম, ডাকঘর: ডৌহাখলা, উপজেলা: গৌরীপুর জেলা: ময়মনসিংহ, বিভাগ: ময়মনসিংহ	
০২	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, কমন কার্প, মিরর কার্প, বাটা ও সরপুঁটি)	রৌপ্যপদক	জনাব মোঃ হামিদুল ইসলাম লেবু পিতা: মৃত আহাম্মদ আলী মন্ডল, মাতা: মোছাঃ হামিদা বেওয়া, গ্রাম: নাফাডাঙ্গা, ডাকঘর: রাজারহাট, উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম, বিভাগ: রংপুর	
০৩	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও কার্পিও)	রৌপ্যপদক	স্বপ্নযাত্রা মৎস্য খামার প্রো: জনাব লাভলী ইয়াসমিন স্বামী: মোঃ আব্দুল মান্নান মিঞা, মাতা: শাহারা ভানু গ্রাম: উত্তর কাষ্টসাগরা, ডাকঘর: পোড়াহাটী উপজেলা: ঝিনাইদহ সদর, জেলা: ঝিনাইদহ, বিভাগ: খুলনা	
০৪	মৎস্য উৎপাদন (কার্প মিশ্র চাষ)	রৌপ্যপদক	জনাব মাহবুবুর রহমান পিতা: মৃত রফিক উল্লাহ, মাতা: মুর্শিদা খাতুন গ্রাম: রূপসী পাড়া, ডাকঘর: লামা, উপজেলা: লামা জেলা: বান্দরবান, পার্বত্য জেলা, বিভাগ: চট্টগ্রাম	
০৫	মৎস্য উৎপাদন (পাবদা মাছের একক চাষ)	রৌপ্যপদক	মায়ের দোয়া ফিসারিজ প্রো: জনাব মোঃ ইমদাদুল হক পিতা: মোঃ নাজিম উদ্দীন, মাতা: মোছাঃ মহিমা খাতুন গ্রাম: ডামোশ, ফরিদপুর, ডাকঘর: বেলগাছি উপজেলা: আলমডাঙ্গা, জেলা: চুয়াডাঙ্গা, বিভাগ: খুলনা	
০৬	বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পিএল উৎপাদন	রৌপ্যপদক	কোয়ালিটি শ্রীম্প প্রজেক্ট প্রো: জনাব হারুন রশিদ ভূঁইয়া পিতা: নাসির আহমেদ ভূঁইয়া, মাতা: বেগম লুৎফুন নাহার মেরিন ড্রাইভ রোড, উপজেলা: কক্সবাজার সদর, জেলা: কক্সবাজার, বিভাগ: চট্টগ্রাম	
০৭	গলদা চিংড়ি উৎপাদন	রৌপ্যপদক	জনাব অঞ্জন সমাদ্দার পিতা: মৃত অশোক সমাদ্দার, মাতা: স্মৃতিকনা সমাদ্দার গ্রাম ও ডাকঘর: বাহির-গ্রাম, উপজেলা: নড়াইল সদর, জেলা: নড়াইল, বিভাগ: খুলনা	
০৮	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান	রৌপ্যপদক	তালুক বানীনগর সিবিজি মৎস্যচাষি সমবায় সমিতি লি. সভাপতি: জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন পিতা: মৃত নিজাম উদ্দিন, মাতা: মৃত শাহেরোন নেছা গ্রাম: তালুক বানীনগর, ডাকঘর: মেহেরনগর উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট, বিভাগ: রংপুর	
০৯	মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কাজে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার অবদান	রৌপ্যপদক	জনাব মোস্তফা-আল-রাজীব উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী, বরগুনা পিতা: মো: গোলাম মোস্তফা, মাতা: মোসা: ফিরোজা বেগম গ্রাম: কাশীপুর, ডাকঘর: গুলবাগপুর, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, বিভাগ: খুলনা	

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০১৭-১৮)

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর		জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ (%)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়					
(১) মুক্ত জলাশয়					
১.	নদী ও মোহনা	৮৫৩৮৬৩	৩২০৫৯৮	৭.৫০	৩৭৬
২.	সুন্দরবন	১৭৭৭০০	১৮২২৫	০.৪৩	১০৩
৩.	বিল	১১৪১৬১	৯৯১৯৭	২.৩২	৮৬৯
৪.	কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	১০১৫২	০.২৪	১৪৮
৫.	প্লাবনভূমি	২৭১২৬১৮	৭৬৮৩৬৭	১৭.৯৭	২৮৩
উপমোট		**৩৯,২৭,১৪২**	**১২,১৬,৫৩৯**	**২৮.৪৫**	---
(২) বদ্ধ জলাশয়					
৬.	পুকুর	৩৯১৭৫৩	১৯০০২৯৮	৪৪.৪৩	৪৮৫১
৭.	মৌসুমি চাষ জলাশয়	১৩৬৬২২	২১৬৩৫৩	৫.০৬	১৫৮৪
৮.	বাঁওড়	৫৪৮৮	৮০৭২	০.১৯	১৪৭১
৯.	চিংড়ি খামার	২৫৮৬৮১	২৫৪৩৬৭	৫.৯৫	৯৮৩
১০.	কাঁকড়া*	৯৮৫৪	১১৭৮৭	০.২৮	১১৯৬
১১.	পেন কালচার	৫২৯৪	১১০১৫	০.২৪	২০৮১
১২.	খাঁচায় মাছ চাষ **	১.২৯ লক্ষ কিউবিক মিটার	৩৫২৩	০.১০	২৭ কেজি/কিউবিক মিটার
উপমোট		**৭,৯৭,৮৫১**	**২৪,০৫,৪১৫**	**৫৬.২৪**	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)		**৪৭,২৪,৯৯৩**	**৩৬,২১,৯৫৪**	**৮৪.৬৯**	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়					
১৩.	ট্রলার		১২০০৮৭	২.৮১	
১৪.	আর্টিস্যানাল		৫৩৪৬০০	১২.৫০	
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)			**৬,৫৪,৬৮৭**	**১৫.৩১**	
সর্বমোট ঃ			**৪২,৭৬,৬৪১**	**১০০.০০**	

* কাঁকড়া চাষের জলায়তন চিংড়ি খামারের জলায়তনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

** খাঁচায় মাছ চাষের জলায়তন নদী ও বিলের জলাতয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বছরভিত্তিক চিংড়ি উৎপাদন

বছর	চিংড়ির উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিস্যানাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৮৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	২৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	২৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৪৮	১৮২৫৭০	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩৭১৭৫	১৯৪৮৬৩	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৫২৫২৩	৫৪.৩২
২০১২-১৩	৪৫০১৩	১৪০২৬১	১৮৫২৭৪	৩০৮৩	৪৩৪৮৫	৪৬৫৬৮	২৩১৮৪২	৬০.৫০
২০১৩-১৪	৪৭৮০৭	১২৮৩১৩	১৭৬১২০	৩৭৯৯	৪৩৮৬৯	৪৭৬৬৮	২২৩৭৮৮	৫৭.৩৪
২০১৪-১৫	৫১৭১৭	১৩২৭৯৪	১৮৪৫১১	৩৪৪৩	৪২২৯০	৪৫৭৩৩	২৩০২৪৪	৫৭.৬৮
২০১৫-১৬	৫৩৮৭৫	১৩২৭৩০	১৮৬৬০৫	২৫৮৩	৪৫০০০	৪৭৫৮৩	২৩৪১৮৮	৫৬.৬৭
২০১৬-১৭	৫৮০০২	১৩৭৪৯৬	১৯৫৪৯৮	৩২১৯	৪৬৪০০	৪৯৬১৯	২৪৫১১৭	৫৬.০৯
২০১৭-১৮	৬৭৪৪৫	১৩০৯২১	১৯৮৩৬৬	৩৬৮২	৪৫১৬৫	৪৮৮৪৭	২৪৭২১৩	৫২.৯৬

* উন্মুক্ত জলাশয়: নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমি
* চাষকৃত জলাশয়: পুকুর, মৌসুমি জলাশয়, বাঁওড়, চিংড়ি খামার ও পেন কালচার

বছরভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বছর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)			বৃদ্ধির হার (%)
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট	
১৯৮৭-৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১	৩.৭৩
১৯৮৮-৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২	৪.৬১
১৯৮৯-৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১	১৭.৯২
১৯৯০-৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭	-১৯.৫২
১৯৯১-৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২	৩.৪৬
১৯৯২-৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০	৪.৯৭
১৯৯৩-৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১	-২.৬৮
১৯৯৪-৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫	১০.৯১
১৯৯৫-৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫	-২.৯৩
১৯৯৬-৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪	৩.৪৫
১৯৯৭-৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯	-৪.০৫
১৯৯৮-৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯	৪.২৭
১৯৯৯-০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২	২.৩৪
২০০০-০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪	৪.৬৪
২০০১-০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩	-৩.৯৭
২০০২-০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২	-৯.৭৭
২০০৩-০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯	২৮.৫৪
২০০৪-০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২	৭.৮৩
২০০৫-০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯	০.৭৫
২০০৭-০৮	৮৯৯০০	২০০১০০	২৯০০০০	৩.৮৭
২০০৮-০৯	৯৫৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১	৩.০৮
২০০৯-১০	১১৪৭৬৮	১৯৮৫৭৪	৩১৩৩৪২	৪.৮২
২০১০-১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫	৮.৪৬
২০১১-১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২	১.৯৬
২০১২-১৩	৯৮৬৪৮	২৫২৫৭৫	৩৫১২২৩	১.৩৬
২০১৩-১৪	১২৭৫১৪	২৫৭৬২৬	৩৮৫১৪০	৯.৬৬
২০১৪-১৫	১৩৫৩৯৬	২৫১৮১৫	৩৮৭২১১	০.৫৪
২০১৫-১৬	১৪০৭৫৬	২৫৪১৯৫	৩৯৪৯৫১	২.০১
২০১৬-১৭	২১৭৪৬৯	২৭৮৯৪৮	৪৯৬৪১৭	২৫.৬৯
২০১৭-১৮	২৩২৬৯৮	২৮৪৫০০	৫১৭১৯৮	৪.১৯

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণ: মে.টন মূল্য: কোটি টাকা

বছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুঁটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানি শূন্য মাছ		কাঁকড়া/ইল		হাঙ্গরের পাখনা এবং মাছের পটকা		অন্যান্য		সর্বমোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
১৯৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩	-	-	২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	২৮০০	২১.৬০	২৩৮.৩৯	১৪.২৫	-	-	২৬৬০৭	৭০০.২৯	৭.৫৭
১৯৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩	-	-	৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৫	২.৭৯	-	-	৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৯.১২
১৯৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	-	-	৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৬০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০	-	-	৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯	-	-	৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১	-	-	৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১	-	-	৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫	-	-	৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৭.৭৫
১৯৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮	-	-	৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯	-	-	৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	৫.৮৩
১৯৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১	-	-	৬৩৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০	-	-	২৮৫৩১	১৩৭৯.৩৭	৫.৪১
১৯৯৯-০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫	-	-	৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭	-	-	৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫	-	-	৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩	-	-	৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
২০০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬	-	-	৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭	-	-	৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
২০০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮	-	-	৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫	-	-	৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
২০০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭	-	-	১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩	-	-	৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
২০০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯	-	-	১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯	-	-	৬৩৩৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
২০০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
২০০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
২০০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
২০০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৩	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
২০০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	১৭৮৩	১৩.২২	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৫২৮	৩.৮৫	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭২
২০১০-১১	৫৪৮৯১	৩৫৬৮.২	০.৬	০.০৪৫	৩৩১১২	১২১১.০৫	৬২৩	৫.৫৭	৫৭৬.৮	৩০.৮৬	৪৪৮৫	৫৪.১১	০০	০০	১৯১৪৯*	৪৫৫.০৫	৯৬৪৬৯	৪৬০৩.৮৩	২.৭৩
২০১১-১২	৪৮০০৭	৩৬৪০.২	০.৪৬	০.০৪	৩৪৫৩৯	৯১৬.৯২	৯৯৬	৯.৪৩	৪১১	২৭.৪৬	৫৭৬৭	৯৫.৭৭	০০	০০	২১৭৮৪*	৫৩৪.৮৮	৯২৪৭৯	৪৭০৩.৯৫	২.৪৬
২০১২-১৩	৫০৩৩৩	৩৩৭৬.২	০	০	১১৪৩৫	৩১৬.৩৬	১২৭৮	৩৬.০৩	০	০	৭৪২৮	১৬৯.৪৯	১	০.০৯	১৪৪৩০*	২৬০.৭৯	৮৪৯০৫	৪১৫৮.৯৭	২.০১
২০১৩-১৪	৪৭৬৩৫	৪১১৮.৮	০	০	১১৬৭৭	৩৩৭.১১	২৬৩৪	২৯.৬৭	২৬১	২১.৬৫	৭৭০৭	১৬৪.৭৫	০	০	৭৪১৪*	১০৪.৯৬	৭৭৩২৮	৪৭৭৬.৯২	২.০৯
২০১৪-১৫	৪৪২৭৮	৩৯৩৭.৬	০	০	১০৬৫৬	২৭৭.৬৩	২৮৪৫	৩৬.৭৪	২৬১	২৫.৩৭	১২৫৫৮	১৯৯.৩৮	০	০	১২৯২৬*	১৮৩.৮৯	৮৩৫২৪	৪৬৬০.৬০	১.৯২
২০১৫-১৬	৪০৭২৬	৩৫৯৮.৬৭	১২৪৫৪	১৮৪.২৮	১১১৩৩	২৭৩.৭৬	২২২৯	৩০.১২	২৪৯	২১.০৩	১০৬	৭.০৯	০	০	৮৪৪১*	১৬৭.৮৭	৭৫৩৩৮	৪২৮২.৮২	১.৯৭
২০১৬-১৭	৩৯৭০৬	৩৬৮২.২৬	০.০০	০.০০	৮২৮১	২৩৬.৬৫	২২৯৭	৩০.১৯	২০৭	১৮.৫৭	১২৮৮২	২২০.২৬	০.১৬	০.০৮	৪৯৩২*	৯৯.৬৪	৬৮৩০৬	৪২৮৭.৬৪	১.৫১
২০১৭-১৮	৩৬১৬৮	৩৫২৭.০৭	০.০০	০.০০	৮২৬৫	২৭৬.২৯	৩১৪৪	৪২.৫৯	২১৪	২৬.৬০	১১৪৩৫	২১৭.৫৩	০.৫০	০.১২	৯৭০৯*	২১৯.৭৬	৬৮৯৩৬	৪৩০৯.৯৪	১.৫০

*চিল্ড ফিস সংযুক্ত

বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (২০০২-০৩ হতে ২০১৭-১৮)

(একক: মে.টন)

মৎস্য সেক্টর	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১৫৬৬২৮৯	১৬৪৬৮১৯	১৭৪১৩৬০	১৮৪৮৭৩৫	১৯৫২৫৭৩	২০৬৫৭২৩	২১৮৬৭২৬	২৩৮১৯১৬	২৫১৫৩৫৪	২৬৮৩১৬২	২৮২১২৬৬	২৯৫২৭৩০	৩০৮৪৩৯৯	৩২৫১৭৯৬	৩৪৯৬৯৫৮	৩৬২১৯৫৪
(১) মুক্ত জলাশয়	৭০৯৩৩৩	৭৩২০৬৭	৮৫৯২৬৯	৯৫৬৬৮৬	১০০৬৭৬১	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫	১০২৯৯৩৭	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৯৫	৯৬১৪৫৮	৯৯৫৮০৫	১০২৩৯৯১	১০৪৮২৪২	১১৬৩৬০৬	১২১৬৫৩৯
১. নদী ও মোহনা	১৩৭৮৪৮	১৩৭৩৩৭	১৩৯৭৯৮	১৩৭৮৫৯	১৩৬৯৫৮	১৩৬৮১২	১৩৮১৬০	১৪১১৪৮	১৪৪৫৬৬	১৪৫৬১৩	১৪৭২৬৪	১৬৭৩৭৩	১৭৪৮৭৮	১৭৮৪৫৪	২৭১৬৩৯	৩২০৫৯৮
২. সুন্দরবন	১৩৮৮৪	১৫২৪২	১৫৭২৪	১৬৪২৩	১৭৭৫১	১৮১৫১	১৮৪৬২	২০৪৩৭	২২৪৫১	২১৬১০	১৫৯৪৫	১৮৩৬৬	১৭৫৮০	১৬৮৭০	১৮০৮৬	১৮২২৫
৩. বিল	৭৫৪৬০	৭৪৩২৮	৭৪৯২৫	৭৬৩৬৫	৭৫১৩৭	৭৭৫২৪	৭৯২০০	৭৯২০৯	৮১৫৬৪	৮৫২০৮	৮৭৯০২	৮৮৯১১	৯২৬৭৮	৯৫৪৫৩	৯৮১১৭	৯৯১৯৭
৪. কাপ্তাইলেক	৭০২৫	৭২৩৮	৭৩৭৯	৭৫৪৮	৮০৮৫	৮২৪৮	৮৫৯০	৭৩৩৬	৮৯৮০	৮৫৩৭	৯০১৭	৮১৭৯	৮৬৪৫	৯৫৮৯	৯৯৮২	১০১৫২
৫. প্লাবনভূমি	৪৭৫১১৬	৪৯৭৯২২	৬২১৪৪৩	৭১৮৪৯১	৭৬৮৮৩০	৮১৯৪৪৬	৮৭৯৫১৩	৭৮১৮০৭	৭৯৭০৪	৬৯৬১২৭	৭০১৩৩০	৭১২৯৭৬	৭৩০২১০	৭৪৭৮৭২	৭৬৫৭৮২	৭৬৮৩৬৭
(২) বদ্ধ জলাশয়	৮৫৬৯৫৬	৯১৪৭৫২	৮৮২০৯১	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১	১৩৫১৯৭৯	১৪৬০৭৬৯	১৭২৬০৬৭	১৮৫৯৮০৮	১৯৫৬৯২৫	২০৬০৪০৮	২২০৩৫৫৪	২৩৩৩৩৫২	২৪০৫৪১৫
১. পুকুর	৭৫২০৫৪	৭৯৫৮১০	৭৫৬৯৯৩	৭৫৯৬২৮	৮১১৯৫৪	৮৬৬০৪৯	৯১২১৭৮	১১৪০৪৮৪	১২১৯৭৩৬	১৩৪২২৮২	১৪৪৬৫৯৪	১৫২৬১৬০	১৬১৩২৪০	১৭১৯৭৮৩	১৮৩৩১১৮	১৯০০২৯৮
২. মৌসুমি চাষ জলাশয় (প্লাবনভূমি)	–	–	–	–	–	–	–	৪৬৯০২	৫১২৩০	১৮২২৯৩	২০০৮৩৩	১৯৩৩০৩	২০১২৮০	২০৭৬৫৮	২১৫৫৪৭	২১৬৩৫৩
৩. বাঁওড়	৪০৯৮	৪২৮২	৪৩৮৮	৪৪৯৮	৪৬৯৮	৪৭৭৮	৫০৩৮	৮৭২৭	৪৮৬৪	৫১৮৬	৬১৪৬	৬৫১৪	৭২৬৭	৭৭২৯	৮০০২	৮০৭২
৪. চিংড়ি খামার	১০০৮০৪	১১৪৬৬০	১২০৭১০	১২৭৯২৩	১২৯১৬০	১৩৪৭১৫	১৪৫৫৮৫	১৫৫৮৬৬	১৮৪৯৩৯	১৯৬৩০৬	২০৬২৩৫	২১৬৪৪৭	২২৩৫৮২	২৩৯৭৯৮	২৪৬৪০৬	২৫৪৩৬৭
৫. পেন কালচার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩০৫৪	১৩০৭০	১৩৩৬৪	১৩৩৬৮	১১০১৫
৬.খাঁচায় মাছচাষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪৪৭	১৯৬৯	২০৬২	২৪৯০	৩৫২৩
৭. কাঁকড়া	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩১৬০	১৪৪২১	১১৮৭৮
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৪৩১৯০৮	৪৫৫২০৭	৪৭৪৫৯৭	৪৭৯৮১০	৪৮৭৪৩৮	৪৯৭৫৭৩	৫১৪৬৪৪	৫১৭২৮২	৫৪৬৩৩৩	৫৭৮৬২০	৫৮৮৯৮৮	৫৯৫৩৮৫	৫৯৯৮৪৬	৬২৬৫২৮	৬৩৭৪৭৬	৬৫৪৬৮৭
১. ট্রলার	২৭৯৫৪	৩২৬০৬	৩৪০১৪	৩৪০১৪	৩৫৩৯১	৩৪১৫৯	৩৫৪২৯	৩৪১৮২	৪১৬৬৫	৭৩৩৮৬	৭৩০৩০	৭৬৮৮৫	৮৪৮৪৬	১০৫৩৪৮	১০৮৪৭৯	১২০০৮৭
২. আর্টিসেনাল	৪০৩৯৫৪	৪২২৬০১	৪৪০৪৮৩	৪৪৫৭২৬	৪৫২০৪৭	৪৬৩৪১৪	৪৭৯২১৫	৪৮৩১০০	৫০৪৬৬৮	৫০৫২৩৪	৫১৫৯৫৮	৫১৮৫০০	৫১৫০০০	৫২১১৮০	৫২৮৯৯৭	৫৩৪৬০০
সর্বমোট:	**১৯৯৮১৯৭**	**২১০২০২৬**	**২২১৫৯৫৭**	**২৩২৮৫৪৫**	**২৪৪০০১১**	**২৫৬৩২৯৬**	**২৭০১৩৭০**	**২৮৯৯১৯৮**	**৩০৬১৬৮৭**	**৩২৬১৭৮২**	**৩৪১০২৫৪**	**৩৫৪৮১১৫**	**৩৬৮৪২৪৫**	**৩৮৭৮৩২৪**	**৪১৩৪৪৩৪**	**৪২৭৬৬৪১**
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪	৪.৫৫	৪.০৪	৩.৮৪	৫.২৭	৬.৬০	৩.৪৪

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০১৭-১৮)

১.	**অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ**	ঃ	**৪৭২৪৯৯৩ হে.**
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	**৭৯৭৮৫১ হে.**
	• পুকুর	ঃ	৩৯১৭৫৩ হে.
	• অক্সবো-লেক (বাঁওড়)	ঃ	৫৪৮৮ হে.
	• চিংড়ি খামার	ঃ	২৫৮৬৮১ হে.
	• কাঁকড়া	ঃ	৯৮৫৪ হে.
	• পেন কালচার	ঃ	৫২৯৪ হে.
	• খাঁচায় মাছচাষ	ঃ	১৩ হে. (১.২৯ লক্ষ কিউবিক মিটার)
	• মৌসুমি জলাশয়	ঃ	১৩৬৬২২ হে.
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	**৩৯২৭১৪২ হে.**
	• নদী ও মোহনা	ঃ	৮৫৩৮৬৩ হে.
	• সুন্দরবন	ঃ	১৭৭৭০০ হে.
	• বিল	ঃ	১১৪১৬১ হে.
	• কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮৮০০ হে.
	• প্লাবনভূমি	ঃ	২৭১২৬১৮ হে.
২.	**সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ**		
	• সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	ঃ	১১৮৮১৩ বর্গ কিলোমিটার
	• সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	৯০৬০ বর্গ কিলোমিটার
	• একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	১৪০৮৬০ বর্গ কিলোমিটার
	• মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	ঃ	২৪৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	• উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	ঃ	৭১০ কিলোমিটার
৩.	• জেলের সংখ্যা	ঃ	১৩.১৬ লক্ষ
	• অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	ঃ	৮.০০ লক্ষ
	• সামুদ্রিক জেলে	ঃ	৫.১৬ লক্ষ
৪.	**মৎস্য উৎপাদন**	ঃ	**৪২৭৬৬৪১ মে.টন**
	• অভ্যন্তরীণ মৎস্য	ঃ	৩৬২১৯৫৪ মে.টন
	- উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	ঃ	১২১৬৫৩৯ মে.টন
	- বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	ঃ	২৪০৫৪১৫ মে.টন
	• সামুদ্রিক মৎস্য	ঃ	৬৫৪৬৮৭ মে.টন
	- ট্রলার দ্বারা আহরণ	ঃ	১২০০৮৭ মে.টন
	- ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	ঃ	৫৩৪৬০০ মে.টন
৫.	**মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি**		
	• পরিমাণ	ঃ	৬৮৯৩৫.৭২ মে.টন
	• মূল্য	ঃ	৪৩০৯.৯৪ কোটি টাকা
	• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট	ঃ	মোট ১০০ টি (ই ইউ অনুমোদিত-৭৬)
	• জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	ঃ	১.৫০%
৬.	**জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান**		
	• GDP-তে অবদান - ২০১৮-১৯	ঃ	৩.৫০%
	• কৃষিখাতে অবদান - ২০১৮-১৯	ঃ	২৫.৭১%

৭.	**মাছ গ্রহণ ও চাহিদা**	
	• জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	ঃ ২২.৮৪ কেজি
	• মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ ৪২.৩৮ লক্ষ মে.টন
	• জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	ঃ ২১.৯০ কেজি
	• জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	ঃ ৬০ গ্রাম
	• প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান	ঃ ৬০%
৮.	**মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি**	
	• মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	ঃ ৯২৬টি
	• সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (৮৪টি হ্যাচারি সুবিধাসহ)	ঃ ১০২ টি
	• বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	ঃ ৮২৪ টি
	• হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	ঃ ৬৮৬৭৫৪ কেজি
	• সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৮)	ঃ ১২০৫৯ কেজি
	• বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৮)	ঃ ৬৭৪৬৯৫ কেজি
	• গলদা হ্যাচারি (সরকারি ২৭টি সহ)	ঃ ৪৬ টি
	• বাগদা হ্যাচারি	ঃ ৪৯ টি
	• গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	ঃ ৫.২১ কোটি
	• বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	ঃ ১৪১২.০৪ কোটি
	• প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	ঃ ৯২৭৪ কেজি
৯.	**সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)**	
	• বাণিজ্যিক ট্রলার	ঃ ২৫৫ টি
	• মোট নৌযানের সংখ্যা	ঃ ৬৭৬৬৯ টি
	• ইঞ্জিন চালিত নৌকা	ঃ ৩২৮৫৯ টি
	• ইঞ্জিনবিহীন নৌকা	ঃ ৩৪৮১০ টি
	• জাল ও অন্যান্য	ঃ ১৮৮৭০৭ টি
১০.	**মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)**	
	• মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	ঃ ২৬০ টি
	• বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	ঃ ১২ টি
	• মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	ঃ ২৪ টি
	• সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	ঃ ৪৭৫ টি
	• সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	ঃ ৩৬ টি
১১.	**মানবসম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো**	
	• মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি	ঃ ০১ টি
	• মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট	ঃ ০৪ টি
	• মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঃ ০৬ টি
	• চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	ঃ ০২ টি
	• চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	ঃ ২০ টি
১২.	**মৎস্য সেক্টরের জনবল**	
	• মৎস্য অধিদপ্তর	ঃ ১ম শ্রেণি- ১৬৩৪ জন
		ঃ ২য় শ্রেণি- ৬৬৩ জন
		ঃ ৩য় শ্রেণি- ২১০৭ জন
		ঃ ৪র্থ শ্রেণি- ১৫৩১ জন
		ঃ সর্বমোট- ৫৯৩৫ জন

সংকলিত: মৎস্যসম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪০০৭৫ (অ) ৯৫৪০২৫০ (ফ্যা) ০১৭১১৮৬৫১৪২ aalikhanbd@gmail.com
জনাব বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫৪০৯৩০ (অ) ০১৭১১৯৬৪৯১১ bijoy.kdebnath@yahoo.com
জনাব ঝন সাহা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫৪০০৮১ (অ) ০১৭১৪৭১৬৯০৫ jhon.saha@hotmail.com
জনাব মোঃ শাহ আলম সিনিয়র তথ্য অফিসার	৯৫৪০২৫০ (অ) ০১৫১১৬৭৭৬৭৮ pro@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল সচিব	৯৫৪৫৭০০ (অ) ০১৭১৩০৬৩৭১১ secretary@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ০১৭১৬২৪৬৯৬৯ ps_secretary@mofl.gov.bd
কাজী ওয়াছি উদ্দিন অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)	৯৫১৪৬৪৫ (অ) ০১৭১৫০৪৯০৫১ addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব সুবোল বোস মনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	৯৫৪৫৫৬৩ (অ) ০১৭১২৭৪৯৯২০ addlsec_admin@mofl.gov.bd
ড. এ কে এম মুনিরুল হক যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-১)	৯৫৭৪৪৯৫ (অ) ০১৭১১৪৩০২০১ js_livestock@mofl.gov.bd
জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)	৯৫১৫৬৪৪ ০১৭১৭৯২২৩৬৭ livestock-4@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ যুগ্ম সচিব (বু ইকোনমি)	৯৫১৫৫২৭ (অ) ০১৭১১৬৪৩৮১৩ towfiqularif@yahoo.com
জনাব অসীম কুমার বালা যুগ্ম সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) ০১৭১৫৮৯৫৮৭৭ js_fisheries@mofl.gov.bd
বেগম কে এফ এম জেসমীন আখতার যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)	৯৫৬১১১৭ (অ) ০১৭১৩০৪০৮৬২ livestock-3@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ লিয়াকত আলী যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৪৫৯৬৯ (অ) ০১৭১৮৪১৯৪৩১ jc_planning@mofl.gov.bd
বেগম মাহবুবা পান্না যুগ্ম সচিব (মৎস্য-৫)	৯৫৪৯১৪১ (অ) ০১৫৫৬৩২৯১৯৩ fisheries-5@mofl.gov.bd
বেগম শাহীন মাহবুবা যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)	৯৫৬১১১৭ (অ) ০১৭১৩০৩৮০১৯ livestock-3@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৪০৪০৭ (অ) ০১৭১৬১৫৫৮৪০ administration-3@mofl.gov.bd
জনাব শোয়াইব আহমাদ খান যুগ্ম সচিব (মৎস্য-২)	৯৫৪৫৮১৯ (অ) ০১৭১১৯৬৭০২২ fisheries-2@mofl.gov.bd
হাফছা বেগম উপসচিব (মৎস্য-১)	৯৫৭৭২৬২ (অ) ০১৭১১৩১০০৭৭ fisheries-1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপসচিব (আইন)	৯৫৭৬৩৫৭ (অ) ০১৭১২১১৫২১৮ ds_law@mofl.gov.bd
জনাব আ ন ম নাজিম উদ্দীন উপসচিব (মৎস্য-৩)	৯৫৭৬৩৫৬ (অ) ০১৭১৮২০৭০৬৫ fisheries-3@mofl.gov.bd
জনাব এস এম তারিক উপসচিব (মৎস্য-৪)	৯৫৪০০৮০ (অ) ০১৭১১৭৩৭৮৩৮ fisheries-4@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা উপসচিব (প্রশাসন-২)	৯৫৭৬৬৯৬ (অ) ০১৭১৭০০৫০৩৪ administration-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৪০৪৩৮ (অ) ০১৭১২৫৮২৩২৩ administration-1@mofl.gov.bd
শাহীন আরা বেগম, পিএএ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)	৯৫৪৬১১১ (অ) ০১৮১৬৩৬৪৩৮০ livestock-1@mofl.gov.bd
বেগম নিগার সুলতানা উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)	৯৫৭৬৬৯৮ (অ) ০১৫৫২৪৫৯৬৫১ livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক উপসচিব (বাজেট)	৯৫৪৫৭৭১ (অ) ০১৭১৮৬৪৭৫৮০ ds_budget@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল মতিন উপপ্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৭৪৮১৪ (অ) ০১৭৩২৬৪৭৩৭২ dc_planning@mofl.gov.bd
ডা. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)	৯৫৭৪৮১২ (অ) ০১৭১২২০৬৬৪৪ amitavodvm@gmail.com

জনাব পুলকেশ মন্ডল সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-১)	৯৫৪৬২০৯ (অ) ০১৭১১০৪৭০৬৮ pulak76@gmail.com
জনাব এইচ এম মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) ০১৯১২৮৩৭৩০০ livestockplanning-2@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আল-মারুফ সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিকল্পনা-২)	৯৫৭৪৮১৭ (অ) ০১৭১২৭৩৩৮৮৯ fisheriesplanning-2@mofl.gov.bd
বেগম মাহমুদা মাসুম সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিকল্পনা-৩)	৯৫৫০৩৭১ (অ) ০১৭১৬৮২৭৭৭৫ fisheriesplanning-3@mofl.gov.bd
জনাব মনজুরুল আলম সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৭৭৩৩৯ (অ) ০১৯১২৯০১৭৯২ monitoring-2@mofl.gov.bd
জনাব হরেকৃষ্ণ অধিকারী সহকারী প্রধান (মনিটরিং-১ এবং মৎস্য পরিকল্পনা-১)	৯৫৪৬২০৯ (অ) ০১৭৪৮২৫৫৯৯৮ sumonadhikari@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪ ও অডিট)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) ০১৫৫২৩৮৭৩৪৭ administration-4@mofl.gov.bd
বেগম হাসিনা বানু প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মপ্রাম	৫৮৩১৬২৭৪ (অ) ০১৭১৮৪৩৭৪৬৮ fisheriescao@cga.gov.bd
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ) ০১৭১১৫৮৪৭৫৫ accountsofficer@mofl.gov.bd

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক মহাপরিচালক	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা) dg@fisheries.gov.bd
জনাব তন্ময় কুমার দাশ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (স্টাফ অফিসার)	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) ০১৭৭৭৯৫৮৪৪০ tanmay_m07@yahoo.com
কাজী শামস আফরোজ পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ) ০১৭১১৯৬৮৬২৭ qsafroz@gmail.com
জনাব মোঃ রমজান আলী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব) মাননিয়ন্ত্রণ	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) ০১৭১৫১১৮৮২৮ psofiqcdof@gmail.com
কাজি ইকবাল আজম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব) জরিপ ও পরিকল্পনা	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ০১৭২০৬২৬৬২০ psofrss@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রমজান আলী উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ০১৭১৫১১৮৮২৮ ramjandof@gmail.com
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস)	০১৭১৫৩৮৮১৫৩ mrbe47@gmail.com
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ০১৭১২২৩৭৪১২ ddaqua@fisheries.gov.bd
কাজি ইকবাল আজম উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) ০১৭২০৬২৬৬২০ ddfinance@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শামীম হায়দার উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫১৩৮৫৭ (অ) ০১৭১২০৬৬১১৮ shaider61@gmail.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান উপপ্রধান	০১৭১২৭৫৪৩০৪ yousufdof@gmail.com
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১০০৩০৫২ rafiq1101@gmail.com
জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৯৩২০ (অ) ০১৭১১৫৭৯৮০৬ atiardof@yahoo.com
বেগম শামীম আরা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৭২১৯(অ) ০১৭১২১৭১৭০৮ sumirahman1991@gmail.com
ড. মুহাঃ নিয়াজউদ্দীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১৫১১৪৯৮৪ neaz04dof@gmail.com
জনাব মাসুদা খানম উপপ্রধান (বাস্তবায়ন)	০১৭১১৪৫২১৮৪ masuda1966@yahoo.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ০১৭২০০৩৯৯৯৫ zakir_zul@yahoo.com
বেগম শিল্পী দে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), সমন্বয় শাখা	৯৫৬৯০৪১ (অ) ০১৭১১১৫৬৫২১ shilpiplus@yahoo.com
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ০১৯১৯৮৫৯৮৮১ houmyoun@yahoo.com
জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১০৭১৮৮৮ mukhlesdof@gmail.com
বেগম মাসুদ আরা মমি সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৯৫১৩৮৫৮ (অ) ০১৭১১১৩৬৮৪৫ masudara_momi@yahoo.co.uk
জনাব সুজিত কুমার চাটার্জী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) মাননিয়ন্ত্রণ শাখা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ) ০১৭১১১৯৯০১৪ sujit_11ac24@yahoo.com
জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১১২০৩৯৬ serajban@gmail.com
জনাব বি.এম. মোস্তফা কামাল সহকারী পরিচালক	৯৫৬৭২১৮(অ) ০১৮১৬০২০৬৪১ kamalbmmostafa@gmail.com

বেগম উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) জলমহাল শাখা	৯৫৬০৬৫৩ (অ) ০১৭৩৬২৭০২০৮ ferdousi@fisheries.gov.bd
বেগম এলিজ ফারজানা সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭১৫৩০২৯৩৮ alizefarzana@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূইয়া সহকারী পরিচালক, মাননিয়ন্ত্রণ শাখা	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ০১৭১৮২৬২৪৯১ makqueshudul_bau@yahoo.com
জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	০১৯২০০০৪৭৭৪ migan1976@gmail.com
বেগম শায়লা আকতার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৭১১৪৫৮০০১ shayla@ yahoo.com
বেগম শবনম মোস্তারী সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ) ০১৭১২২৪৬৬৬৪ smjdof@yahoo.com
জনাব মোঃ মাহবুব উল হক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৬৭২১৮,০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ mahmub_dof@yahoo.com
ড. রাজু আহমেদ সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৭, ০১৭৯৫৯৭৯৫২০ rajuahmeddof@gmail.com
জনাব শওকত কবীর চৌধুরী সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৮১৫৮৪২৬৫০ shoukot2014@gmail.com
জনাব সাধন চন্দ্র সরকার সহকারী পরিচালক	০১৭১৮০০৫১৭৫ sarkersc04@gmail.com
জনাব মোঃ মাগফুর রহমান সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৯২৪০৯১৩০৬ magfur7@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (কল্যাণ)	০১৭৮০১৬৮৮৬৫ kollanofficer@fisheries.gov.bd
মোসাঃ শামীমা ইয়াসমিন সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৭১২১১৮ shamimadof2008@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ) ০১৮১৬৯৪১৫০৪ admin-2@fisheries.gov.bd
মনিকা দাস সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭১৬৬০৩৫২৫ monika_afdu@yahoo.com
বেগম নাসরিন জাহান সহকারী পরিচালক	০১৭৫৩০৮৫২৯৫ nasrinj12@yahoo.com
জনাব মুহাঃ নওশের আলী সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭১৬৩৩৫০১০ mnali28bcs@yahoo.com mdnowsherali1980@gmail.com
বেগম সুবর্ণা ফেরদৌস উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১৮১২৪০১০ ferdous3176@gmail.com
জনাব জুয়েল শেখ প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) ০১৭১৩৪০৫১৩৫ Jewel_shaik@yahoo.com

বেগম ফারহানা জাহান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৩৮২১১৩১১ evafi77@gmail.com
বেগম ইসফাত আরা মিশু সহকারী পরিচালক	০১৭১৮০৮০৯৩৪ isfataramishu@yahoo.com
বেগম আকলিমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৬৮৫৭৫৬০২৮ lima.bau2007@gmail.com
বেগম মারজিয়া সুলতানা সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৩৫৫৩২৭ marziasultanadof@gmail.com
মোছাঃ ছালমা আক্তার গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১১১৪২০১০ salmafish@gmail.com
জনাব সমীর কুমার সরকার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১৭৩৪০৪৫০ samir.21bau@gmail.com
বেগম হাফিজা উম্মে হানি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (প্রশাসন-২)	০১৭১২২২০৯৬৫ haniufo@gmail.com
বেগম সালমা নূর-ই-ইসলামী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) জলমহল শাখা	০১৭১৯৩৭৯০২৬ salamanoorbau@gmail.com
শিলা রায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) ডোসিয়ার শাখা	০১৯৫৯৭৯৩০৯৬ shilaroy735@yahoo.com
জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১৯২৪২২৪৩৪৩ tushar_bau08@ymail.com
বেগম আইরিন আসাদ গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১১০৮৪১১৮ ireenasad.bd@gmail.com
জনাব বদিউল আলম সুফল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) আইটি শাখা	০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com
বেগম জিনাত জাহান বর্ণালী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৬৪৭৪০৪৩৩ bornali.dof@gmail.com
বেগম আইরিন সিদ্দীকা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) বাজেট শাখা	০১৭৬৪৯৪৫৮৬৪ siddikairin@gmail.com
বেগম ফাতেমা আক্তার পান্না উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) সাধারণ শাখা	০১৭৯২৯৭০৩১১ i.m.fatema35@gmail.com
ড. জি এম শামসুল কবীর সহকারী প্রধান	৯৫১৪১৩৫ (অ) ০১৭১১৯৭৯২৩০ gmskabir@yahoo.com
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৮৮১১২ (অ) ০১৭১১১৭১৯৯৯ alimuzzamanc@gmail.com
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫১৪১৩৫ (অ) ০১৭২৬৮৮১২৯৭ firozahmedsikder@yahoo.com

জনাব মাহবুবুল আলম গবেষণা কর্মকর্তা	৯৫৬৭২১৬(অ) ০১৯৫৪৫৭৫৩০৭ mahbubsust49@yahoo.com
জনাব হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ সহকারী প্রকৌশলী	৯৫৬৫০২৩ (অ) ০১৭২৬৮৮১২৯৭ helalahmed@yahoo.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল বাজেট অফিসার	৯৫৫৫৩৫১ (অ) ০১৭৫৬১৫৭৯৬৪ sarkerferoz@yahoo.com
কাজী মফিজুল হক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ০১৮১৯২২০৬১৪ mofiz.sodof@gmail.com
আইসিটি শাখা	৯৫৮১৪৭৯(অ)
তথ্য সেবা কেন্দ্র	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
সাধারণ শাখা	৯৫৫৪৮৭৫ (অ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ))

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫১৩৫০৭ (অ) ০১৭১২২৯৫৩৩৯ habib.ict04@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক ডিপিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৯৪ (অ) ০১৯১৭৯৯১৮৯৯ faruk.dof@gmail.com
জনাব অজিত কুমার পাল ডিপিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেব সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	৯৫৮৮৫৯৩ (অ) ০১৭১২২৫৭২০৬ akp589@hotmail.com
জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকার সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৬৭২১৯ (অ) ০১৭১২৮৬৪৬৬১ mkhsarker@yahoo.com
জনাব মোঃ সাফায়েত আলম উপ সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৯২ (অ) ০১৭১৮৬৮৭০৬৩ shafaet.alam@gmail.com
জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, বাঁওড় প্রকল্প (রাজস্ব)	০৪২১-৬৩১০৮ (অ) ০১৭১৫৬১৪০৪৪ monzurfisheries@gmail.com
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী পিডি, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৯৫৮৮৭০৮ (অ) ০১৭১১১৭১৯৯৯ alimuzzaman@gmail.com
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৯৫৬৯৯৪৫ ০১৭১৫৮৪৫৩২৮ zalom08@ yahoo.com
জনাব এস এম আবুল বাসার সহকারী পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	০১৭১৭৭১৫৮২৪ smabulbashar@ gmail.com
জনাব এস. এম মনিরুজ্জামান পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	৯৫৬১৬৮৫ ০১৭১৫৩৮৪৮৬১ monidof@ yahoo.com
জনাব মোঃ মহসিন এসএডি, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১২২৩০৪০৭ mdmahashin@ yahoo.com
শেখ মনিরুল ইসলাম এসএডি, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭১৮৪২১১২৯ sheikh_monir2000f@ yahoo.com
বেগম ফারহানা আহমেদ সহকারী পরিচালক ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭৮৮৭৪১৯৯৩ farhan218@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ আজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭২৭৫৭০২৬০ azibur77@yahoo.com
জনাব মোঃ মকছেদুর রহমান সহকারী পরিচালক ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭৪৮৩৮৫৬৪৭ anik871980@yahoo.com
জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট	০১৭২২৬৭৭১১৮ natpdof@gmail.com
জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান পিডি, ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯৫৮৮৫৪৬ (অ) ০১৭১২৬৬৭৯৯০ serajurrahman62@gmail.com
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০১৭১৭৬৬৯১৫৭ masuda1966@yahoo.com
বেগম আক্তামুন লিন্নাছ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৭১৭৫৮৪৮৬৯ linnasufo@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার পিডি, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৮১-৭৩৯৪৯ (অ) ০১৭২৭১৫৫৯৬১ pdcomillaproject@gmail.com
জনাব মোঃ শামীম উদ্দিন সহকারী পরিচালক, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭৯৭৯২৯১৭০ shamimuddin744@gmail.com
জনাব মোহাঃ আতাউর রহমান খান পিডি, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৫ (অ) ০১৭১২৮৪১০৯১

জনাব মোঃ খালিদুজ্জামান এপিডি, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৬ (অ) ০১৭১৮৬২৬৯৫৯
জনাব মোঃ হাসান আহম্মেদ প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১২৫৮১৫৯৯ hasanahmmed2013@gmail.com
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী উপ প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h1998@yahoo.com
জনাব মনিষ কুমার মন্ডল উপ প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১৫৩৪৬৮২৯ monishmndl@yahoo.co.uk
জনাব বিপ্লব দাস উপ প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১১২৭৯৬৪৭ biplab022000@yahoo.com
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১১২৪১২০৩ azam_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৯১৩৪৪৪০০২ maahasan2021@gmail.com
মোসাম্মত রাশিদা আক্তার সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭১৬৩২৭৮২৭ pollyrashida7@gmail.com
জনাব মোঃ বদরুল আলম শাহীন সহকারী প্রকল্প পরিচালক, SCMF প্রকল্প	০১৭৪৪২৭৬৪১১ shaheen_bau@yahoo.com
জনাব কামরুল হাসান প্রকল্প পরিচালক রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৫৫৮৩০৮৫৪৮ khmanju_70@yahoo.com
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭১১১৯২৪৩৫ harendof@yahoo.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপ প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প	০১৭১২১৯৫৭৮০ maisunbin2008@gmail.com

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

ড. মুহাম্মদ আবুল হাছানাত পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) ০১৭১১৯০৭৫১০ hasanatabul@yahoo.com
উপপরিচালক	০৩১-২৫৯৮০০ (অ)
জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১(অ) ০১৭১৬৫৬৬৭৫২ nazim.ict94@yahoo.com
জনাব সুমন বড়ুয়া সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ) ০১৭১২১৬১১০১ sbarua123bd@gmail.com
ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	০৩১-২৫২৯৮০০(অ) ০১৭১১৯৮৫০৭২. bmfcbp@yahoo.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) এফটিএ, সাভার	০২-৭৭৪৭৫১৮ (অ) ০১৫৫২৩১৮৬২৬ amindofbd@gmail.com
জনাব মোঃ সফিকুর রহমান অধ্যক্ষ (অতি. দায়িত্ব) এফটিআই, চাঁদপুর	০২-৭৭৪৭৫১৮ (অ) ০১৮১৮৫৮২৪২৪ shafiqrahmandfo@gmail.com
জনাব মোঃ তালেবুল ইসলাম অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ) ০১৭৩৩১৫০৯৩৫ talebuldof@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান মজুমদার এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০১৬১৪০০২৩২৫ wahid1981bd@gmail.com
আংগুরি বেগম প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফবিটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ) ০১৭২১৭১৪৭৫৮ aunguri07@yahoo.com
জনাব আব্দুস সালাম প্রাং খামার ব্যবস্থাপক, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ) ০১৫৫৮৩৩২২৯১ asalampkdof@gmail.com

মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট

জনাব শংকর রঞ্জন দাশ অধ্যক্ষ (অতি. দায়িত্ব) মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, কিশোরগঞ্জ	০৯-৪১৬১০৭০ (অ) ০১৭১৬৪৮৩৬৭৪ sankarranjan62@gmail.com
জনাব মোঃ সফিকুর রহমান অধ্যক্ষ, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৬১০২ (অ) ০১৮১৮৫৮২৪২৪ principalfdichandpur@fisheries.gov.bd
শেখ মোহাম্মদ মেজবাহুল হক অধ্যক্ষ, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, সিরাজগঞ্জ	০১৭১২৫১৪৪৬৮, smmhaqebd@gmail.com
জনাব নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল অধ্যক্ষ (অতি. দায়িত্ব), মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট, গোপালগঞ্জ	০১৭১৮৭০৩৭৩৭ dfogopalgonj@fisheries.gov.bd

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ

জনাব মোঃ ইউসুফ খান উপপরিচালক, ঢাকা	৯৫৮২০১২ (অ) ০১৭১২৭৫৪৩০৪ yousufdof@gmail.com
জনাব আ ক ম শফিক উজ জামান উপপরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৬০৩ (অ) ০১৭১১৪৮২১৪২
জনাব প্রীতিষ কুমার মল্লিক উপপরিচালক, খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ) ০১৭১৭০০৮৬৪৭ pkomamallick@yahoo.com

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ

জনাব মোঃ মানিক মিয়া কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, ঢাকা	০১৭১৫২৪৫৩২১ manikfiqc.gov.@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার , চট্টগ্রাম	০৩১-২৫৮০৮২৩ (অ) ০১৭১২৯২৫৩৯২ arazzaque1962@live.com
জনাব ড. মোঃ নাজমুল হাসান কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, খুলনা	০৪১-৭৬২৩২৭ (অ) ০১৭১১৩৯৪২৩৯ nazmul_hassan786@yahoo.com

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ) ০১৭১৫০৫৭৫০৬
ড. মোঃ খালেদ কামাল প্রধান তথ্য অফিসার	৫৫০২৪৩৭২ (অ) ০১৫৫২৩৭২৬৩১
ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ মীর নুরুল আলম মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫৭ (অ)
কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৯১৩৪৫৮৭ (অ)
কৃষিবিদ এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ)
কৃষিবিদ মোঃ শাহ আলম পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৯১১১৭৩৮ (অ)
কৃষিবিদ ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৩৯ (অ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

ডাঃ হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক মহাপরিচালক	৯১০১৯৩২ (অ) dg@dls.gov.bd
ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ) ০১৭১৫৫০৮১৬৫ directorextensiondls@gmail.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৫৮ (অ) ০১৭১১০১৮৬০১ rahmanmahbub1@yahoo.com
ডাঃ মোঃ আইনুল হক পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	৯৮৯৮৮৯৬ (অ) ০১৭৯৬২৬২৭২৩ ahaquedls@yahoo.com

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা

ড. নাথু রাম সরকার মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ)	৯১৮০৭৯৯ (অ)
জনাব মোহাম্মদ নাছিম আহম্মেদ একান্ত সচিব	৯১৮০৬৪৮ (অ)
জনাব প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী বিভাগ প্রধান (কৃষি)	৯১১১৭২৫ (অ)
ড. শাহজাহান আলী খন্দকার যুগ্ম-প্রধান (বমপাণি সম্পদ উইং)	৯১৮০৭৫৮ (অ)
জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ উপ-প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯৬৬১৩৬৩ (বা)
জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দীন সিনিয়র সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭০৩৯ (অ)
বেগম ইফফাত তানজিয়া সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১৮০৯৭২ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়জুল্লাহ সচিব	৯১৮০৭৬১ (অ) secretary@imed.gov.bd
জনাব মোঃ আলী নূর মহাপরিচালক, সিপিটিইউ	৯১৪৪২৫২ (অ) cptudg@cptu.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪)	৯১৮০৬৭৮ (অ) dgagri@imed.gov.bd

ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব মনোয়ার আহমেদ সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ) secretary@erd.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

ড. মোঃ কবীর ইকরামুল হক নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ) ec-barc@barc.gov.bd
ড. এ এস এম আনোয়ারুল হক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১১৪৬৩ (অ) md-af@barc.gov.bd

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া ভারপ্রাপ্ত সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরানবাজার, ঢাকা

জনাব দিলদার আহমদ চেয়ারম্যান	৯১৪০৮০১ (অ)
জনাব আব্দুর রশিদ পরিচালক (অর্থ)	৯১৪৪৪০৫ (অ)

জনাব রণজিৎ কুমার পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯১৪০৮০৬ (অ)
জনাব হারুনুর রশিদ সচিব	৯১৪৩৪৯৪ (অ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর মহাপরিচালক	৯২৬৩৮১৫ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

ড. আবুল কালাম আযাদ মহাপরিচালক	৯২৬৩৫৪০ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন

জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা

জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	৯৫৮২১৬২ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৯৫৮২১৬২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মহাপরিচালক	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ০৯১-৬৬৫৫৯ (ফ্যা) yahiamahmud@yahoo.com
ড. মোঃ খলিলুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন) (অতিঃ দায়িত্ব)	০৯১-৬৬২৭১০ (অ) krahman2863@yahoo.com
ড. মোঃ নূরুল্লাহ পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) (অতিঃ দায়িত্ব)	০৯১-৫২২৩০ (অ) nurullahbfri@yahoo.com
ড. মোঃ খলিলুর রহমান সিএসও, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১-৫১২২১ (অ) krahman2863@yahoo.com
ড. খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সিএসও, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০৪৬৮-৬২২৯১ Kkuabd1@yahoo.com
ড. মাসুদ হোসেন খান সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭(অ) masudkhanbfri@gmail.com
ড. মোঃ জুলফিকার আলী মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) Zulfikar_bfri@yahoo.com
ড. সৈয়দ লুৎফর রহমান সিএসও (অ.দা.), লোনাপানি কেন্দ্র পাইকগাছা, খুলনা	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) rahman397@yahoo.com
জনাব আজহার আলী এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ) azhar1983bfri@yahoo.com
বেগম মালিহা হোসেন মৌ এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৮৯৮২ (অ) mh_mou33@yahoo.com
ড. ডেভিড রিন্টু দাস এসএসও, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া	০৭৪১-৫৫৩১২ drd4272@yahoo.com
ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৪ rashidulbfri@yahoo.com
জনাব আহমেদ ফজলে রাব্বি এসও, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী	০৪৪২৫-৫৬০০২ ahmed.bfri@yahoo.com

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১০৬ ফ্যাক্স: ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২৪২৬০ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্স: ৯৬৬৭২২২
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০২৪৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭৯১০৪৫-৫১
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	০৪২১-৬২০২০

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

এ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১২৯২৫ (ফ্যা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২৫১১৮৮৭ (ফ্যা)

বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফ্যা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা

বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ডফিস	৮৮১১১৫১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৮৫২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
জিআইজেড	৯৬৬৭০১০০০

ঢাকা বিভাগ

খ. মাহবুবুল হক উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফ্যা) ০১৭১২৫৬৮৯৫৯ dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব কৃষ্ণেন্দু সাহা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৯৫১১১৫০(অ) ০১৭১১১৯২৪৩১ Sakrisna05@yahoo.com

ঢাকা জেলা

সৈয়দ মোঃ আলমগীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩ (অ) ০১৭৩২৫০৮৮৫৮ dfodhaka@fisheries.gov.bd
সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৫৬২৩২১ sarkerripon@gmail.com

মানিকগঞ্জ জেলা

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৭১০৩৯১(অ) ০১৭১৮৪৮৯৬৬৯ dfomanikgonja@fisheries.gov.bd
প্রীতি কণা পাল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৯৯৮৫৮৭৫ preetom93@yahoo.com

মুন্সিগঞ্জ জেলা

জনাব নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৯১ (অ) ০১৭১২২৭৮৭৩৮ dfomunshigonja@fisheries.gov.bd
জনাব সুনীল মন্ডল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২২০৪৭১৯ Sunilmandal37@yahoo.com

গাজীপুর জেলা

জনাব মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯২৬১২৮৩ (অ) ০১৭১১৪৬৬১৫২ dfo.gazipur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৫৬৬০৩৬৯

নরসিংদী জেলা

সরকার আনোয়ারুল কবীর আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৪৬২৪১০ (অ) ০১৭১২৫০২২১৩ dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd
জনাব রিপন কুমার পাল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২২১৭৯৮৪ riponpaul171@gmail.com

নারায়ণগঞ্জ জেলা

জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬৩০৬২৫ (অ) ০১৭২০৩২৬৮৭১ dfonarangonj@fisheries.gov.bd
বেগম তানমী শাহরীন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৩১৪৫৭৮৮৫ tanmi_s1998@yahoo.com

ফরিদপুর জেলা

জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) ০১৭১২৫৮৩৬১৪ dfofaridpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১১২০৩৯৬ serajban@gmail.com

রাজবাড়ী জেলা

জনাব মোহাঃ মজিনুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) ০১৭০৬৪৪১৮৯৯ dforajbari@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১০৭১৮৮৮ mukhlesdof@gmail.com

মাদারীপুর জেলা

জনাব রিপন কান্তি ঘোষ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ) ০১৭১৭৪৮৮৩৭৮ dfomadaripur@fisheries.gov.bd

গোপালগঞ্জ জেলা

জনাব নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ) ০১৭১৮৭০৩৭৩৭ dfogopalgonj@fisheries.gov.bd

শরীয়তপুর জেলা

জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১-৬১৬৫৬ (অ) ০১৭১১০৬৮০৬৯ dfoshariatpur@fisheries.gov.bd

কিশোরগঞ্জ জেলা

জনাব মোঃ তোফাজ উদ্দীন আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ) ০১৭৫১৯৩৯৯৩২ dfokishorgonj@fisheries.gov.bd

টাঙ্গাইল জেলা

জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ) ০১৭১০৮৩৪৮১৪ dfotangail@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৫৬১৫৩৯৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

জনাব তপন কুমার পাল উপপরিচালক	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) ০১৭১২৭৮২১৬০ ddmymensingh@fisheries.gov.bd

ময়মনসিংহ জেলা

জনাব আব্দুর রউফ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) ০১৭১১১১৮৮৫১ dfomymensingh@fisheries.gov.bd
আনোয়ারা বেগম	০১৭১২৩০৬১৭৭ begulfisheries@gmail.com

নেত্রকোনা জেলা

জনাব দিলীপ কুমার সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ) ০১৭১২২৪৩১৯১ dfonetrokona@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ফজলুল কাবীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৩০৬৮৭৯

জামালপুর জেলা

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ) ০১৭১১০৭০৯৪৯ dfojamalpur@fisheries.gov.bd
বেগম মাসুদ আরা মমি সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১১৩৬৮৪৫ masudara_momi@yahoo.co.uk

শেরপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) dfosherpur@fisheries.gov.bd

খুলনা বিভাগ

জনাব রণজিৎ কুমার পাল উপপরিচালক	০৪১-৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১-৭৬৩৩৪৫ (ফ্যা) ০১৭২৭৪০১২৯১ ddkhulnaa@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শাহজাহান আলী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৪১-২৮৫১৫১৯(অ)

খুলনা জেলা

জনাব মোঃ আবু ছাইদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ) ০৪১-৭৬১৬৭৬ (ফ্যা) ০১৯৭২৬৬১৬১৬ dfokhulna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাজদার রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৫৩৫১২৬৯

সাতক্ষীরা জেলা

জনাব মোঃ মশিউর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) ০১৭১২৭৩৯০২৩ dfosatkhira@fisheries.gov.bd

বাগেরহাট জেলা

ড. মোঃ খালেদ কনক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) ০৪৬৮-৬২১৬১(ফ্যা) ০১৭৬৩৫০৭৬৪০ dfobagerhat@fisheries.gov.bd
জনাব অমল কান্তি রায় সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১৩৮৯০৫৪৫ Omalkantiroy6@gmail.com

যশোর জেলা

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) ০৪২১-৬০৭৫১(ফ্যা) ০১৭১৬১১৩৬৭৩ dfojessore@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আক্তার উদ্দিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৪৬৬৯৭৯

ঝিনাইদহ জেলা

জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১-৬২৮৫৭ (অ) ০৪৫১-৬২৯৫৭(ফ্যা) ০১৭৯৫১২৬০৫১ dfojhinaidah@fisheries.gov.bd

নড়াইল জেলা

ড. শেখ শফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) ০১৭১১৮৪১২২৬ dfonarail@fisheries.gov.bd

মাগুরা জেলা

জনাব নারায়ণ চন্দ্র দাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) ০১৭১৫১৬০৯৬২ dfomagura@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৭৮৭৪১১ Iqbalsufo2014@gmail.com

কুষ্টিয়া জেলা

জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) ০১৯১৩৩৮৫৭২৮ dfokushtia@fisheries.gov.bd

মেহেরপুর জেলা

জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২৫৪৩ (অ) ০১৭১২২০৪৮০৮ dfomeherpur@fisheries.gov.bd

চুয়াডাঙ্গা জেলা

ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান তালুকদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২৩৮৮ (অ) ০১৭১২২০২৪৩৩ dfochuadangaa@fisheries.gov.bd

রাজশাহী বিভাগ

জনাব মোঃ হাসান ফেরদৌস সরকার উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) ০১৭১১৩৯৪২৩৯ ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মুক্তাদির খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৪৭৮৬০২০২ (অ) ০১৭৪১৭২৩২৩৩ muktadirkhan233@gmail.com

রাজশাহী জেলা

জনাব অলক কুমার সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) ০১৭১১৯৫৪৭৩৮ dforajshahi@fisheries.gov.bd

নাটোর জেলা

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৯০ (অ) ০১৭১২৮৭৯০০০ dfonatore@fisheries.gov.bd

নওগাঁ জেলা

জনাব ফিরোজ আহাম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) ০১৭১১৪১৮৫১৫ dfonaogaon@fisheries.gov.bd

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

ড. মোঃ আমিমুল এহসান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫২৪৮২ (অ) ০১৭১২২৫০১২২ dfonawabganj@fisheries.gov.bd

পাবনা জেলা

জনাব মোঃ আব্দুর রউফ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা) ০১৭১২২০৪৭৬৪ dfo.pabna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আয়নাল হক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩০৩১৭৭২৪৫ aynaldof@gmail.com

সিরাজগঞ্জ জেলা

জনাব মোঃ সাহেদ আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) ০৭৫১-৬২০০৫ (ফ্যা) ০১৭১২৮০৩০১২ dfosirajgonj@fisheries.gov.bd

জয়পুরহাট জেলা

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) ০১৭১৫৫৭৭৩৯৭ dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
জনাব সরদার মহীউদ্দিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৭৯৪১৭৩ sardar.dof@gmail.com

বগুড়া জেলা

বেগম রওশন আরা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ) ০১৭১২৯৩৪৭৬৪ dfobogra@fisheries.gov.bd

রংপুর বিভাগ

জনাব মোঃ লতিফুর রহমান উপপরিচালক	০৫২১-৬৪৭৭০ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা) ০১৭১৫৫৭৭৪১২ ddrangpur@fisheries.gov.bd

রংপুর জেলা

জনাব বরুণ চন্দ্র বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) ০১৭১৫৫৭৬৮৯১ dforangpur@fisheries.gov.bd
জনাব কালিপদ রায় সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৮৪৯৭০৯ Kproy76@yahoo.com

কুড়িগ্রাম জেলা

জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১-৬১৫০১ (অ) ০৫৮১-৬১০২৪ (ফ্যা) ০১৭১২৫৭০৬৬২ dfo.kurigram@fisheries.gov.bd

নীলফামারী জেলা

জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) ০১৭১২৬৯১৩০৪ dfonilphamari@fisheries.gov.bd

ঠাকুরগাঁও জেলা

ড. মোহাঃ সাইনার আলম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ) ০১৭১৬৭৩০৬৬৬ dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৩২৯৪১৮

দিনাজপুর জেলা

জনাব এস এম রেজাউল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) ০১৭১১০০৬৯৫০ dfodinajpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৫৩৫২৭৪ latif.dfo@gmail.com

লালমনিরহাট জেলা

জনাব মোঃ ফারুকুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ) ০১৭১২২০৯৪৮২ ০৫৯১-৬১১৩৭ (বা) dfo.lalmonirhat@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৮২৮৬৫৬ wahedmondal@yahoo.com

গাইবান্ধা জেলা

জনাব মোঃ আব্দুদ দাইয়ান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৫১৬৪৩ (অ) ০১৭১২২০১৬০১ dfogaibandha@fisheries.gov.bd

পঞ্চগড় জেলা

ড. মোঃ আফতাব হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮-৬১৩৬৯ (অ) ০১৭০৬৫৮৪৭৮৯ dfopanchagarh@fisheries.gov.bd

চট্টগ্রাম বিভাগ

জনাব মোহাঃ বজলুর রশিদ উপপরিচালক	০৮১-৭৬১২৭ (অ) ০১৭১৭৭২৪৭৭৪ ddchitagong@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৮১৯১৪১৬৫২

চট্টগ্রাম জেলা

জনাব মোঃ মমিনুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) ০১৭১৬২৩৭৪৫৪ dfochitagong@fisheries.gov.bd

কক্সবাজার জেলা

জনাব এস. এম. খালেকুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৬৮ (অ) ০৩৪১-৫১১৭৬ (ফ্যা) ০১৭৭৯৫৭২৮৮৭ dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd

ফেনী জেলা

জনাব শরীফ উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা) ০১৭১৬৪৮২১৪৮ dfo.feni@fisheries.gov.bd
জনাব শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২০৪২৫৭০ srcc71@yahoo.com

চাঁদপুর জেলা

জনাব মোঃ আসাদুল বাকী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) ০১৭১৬৫৪৩৪০২ dfochadpur@fisheries.gov.bd

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১-৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১-৫৯৭৮৫ (বা) ০১৭১১৪৮৭২৯১ dfo.brahmanbaria@fisheries.gov.bd

কুমিল্লা জেলা

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) ০১৭১২৫৯১৫৫৭ dfocomilla@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১৯৮৫৯৮৮১ houmyoun@yahoo.com

রাঙ্গামাটি জেলা

জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১-৬২৩২৭(অ) ০৩৫১-৬১৩৩৪ (ফ্যা) ০১৭১২৫৮০৮১৯ dforangamati@fisheries.gov.bd
জনাব ছরওয়ার জাহাঙ্গীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৫৫৪৩৬৪৬৬৬ sarwar.sufo14gram@gmail.com

বান্দরবান জেলা

জনাব অনিল কুমার সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ) ০১৭১১২৬২১৪১ dfobandarban@fisheries.gov.bd

খাগড়াছড়ি জেলা

জনাব আবুল খায়ের মোঃ মোখলেছুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ) ০১৭১৫১৩২১৩৪ dfokhagrachari@fisheries.gov.bd

ড. মঈন উদ্দিন আহামদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৮১৮৬৪৯৩৭৫ moinc@gmail.com

লক্ষ্মীপুর জেলা

জনাব এস. এম. মহিবউল্লাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১-৬১৪৬৫ (অ) ০১৭১২১৯৬৭৪৮ dfolaksmipur@fisheries.gov.bd

নোয়াখালী জেলা

ড. মোঃ মোতালেব হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩২১-৬১৬৮১ (অ) ০৩২১-৬১৪৭৩ (ফ্যা) ০১৭১৬৯৯১২১৬ dfonoakhali@fisheries.gov.bd

সিলেট বিভাগ

জনাব সুলতান আহমেদ উপপরিচালক	০৮২১-৭২৬১৩০ (অ) ০১৭১৬৩০৫৭৭৪ ddsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আহসান হাসিব খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭২৩২৫৭ ০১৫৫০৬০০৫৫০ ahsanbkhan@gm,ail.com

সিলেট জেলা

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০১৭১২৫৭৮৬৪৪ dfosylhet@fisheries.gov.bd

সুনামগঞ্জ জেলা

জনাব মোঃ আমিনুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) ০১৭১২৮২৮৬৫০ dfosunamgonj@fisheries.gov.bd

হবিগঞ্জ জেলা

জনাব মোঃ শাহজাদা খসরু জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৩৫০ (অ) ০১৭১৮১৭৪১৮০ dfohabigonj@fisheries.gov.bd

মৌলভীবাজার জেলা

জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১-৭৬১৫১ (অ) ০১৭১৬২৫৫১৪৮ dfomoulavibazar@fisheries.gov.bd

বরিশাল বিভাগ

জনাব মো: অলিউর রহমান উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা) ০১৭১১৪৬৭৮৩৭ ddbarishal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আজিজুল হক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১২৫৮০৮২৫

বরিশাল জেলা

জনাব মোঃ আবু সাইদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) ০১৯৪৩৫৮১৭৮৬ dfobarisal@fisheries.gov.bd

ভোলা জেলা

জনাব এস এম আজহারুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ) ০১৭১৬৯৩৭৬৯২ dfobhola@fisheries.gov.bd

ঝালকাঠী জেলা

জনাব বাবুল কৃষ্ণ ওঝা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ) ০১৭১২৬৩৩৩৭৫ dfojahlai@fisheries.gov.bd

বরগুনা জেলা

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ) ০১৭১৮০১৭৪৭২ dfoborguna@fisheries.gov.bd

পটুয়াখালী জেলা

জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ) ০১৯১৩৭৯৩৭১২ dfokpatuakhali@fisheries.gov.bd

পিরোজপুর জেলা

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ) ০১৭১৬৬৭৮৩৫৪ dfopirojpuri@fisheries.gov.bd

সংকলনে | শিলা রায়,
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

USAID Disclaimer: "This publication is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under the Feed the Future initiative. The contents are the responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government."

FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

Feed the Future Bangladesh Aquaculture and Nutrition Activity

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

WorldFish

www.fisheries.gov.bd